আকাশে মেঘ করেছে।

ঘন কালো মেঘ। ক্রমেই ফুলে ফেঁপে উঠছে।

ওসমান সাহেব আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর কেন জানি মনে হল এই মেঘে বৃষ্টি হবে না। প্রিকগনিশন নাকি? ভবিষ্যতের কথা আগে ভাগে বলে ফেলা। তিনি হাঁটছেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। উদ্দেশ্যহীন মানুষের হাঁটা। গন্তব্যহীন যাত্রা। অথচ তাঁর একটি গন্তব্য আছে। বি ডি আর–এর তিন নম্বর গেট পার হয়ে তিনি ঢুকে যাবেন নিউ পল্টন লাইনের গলিতে। গোরস্তানের দেয়াল ঘেঁষে এগুতে থাকবেন।

: স্লামালিকুম।

ওসমান সাহেব চমকে তাকালেন। সালামটা কি তাঁকেই দেয়া হয়েছে? দু–একজন কি চিনতে শুরু করেছে? চেনার কথা নয়। তিনি মাসে দু'বারের বেশী আসেন না এদিকে। সালাম দেয়া ছেলেটির বয়স অল্প। চোখে চশমা। সে তাকাচ্ছে কৌতূহলী হয়ে। ওসমান সাহেব প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। এবং মৃদু স্বরে বললেন–ভাল তো?

: আপনি কি এই পাড়াতে থাকেন?

: না। তবে মাঝে মাঝে আসি।

: আমি আগেও একবার দেখেছি। তখন চিনতে পারি নি।

তিনি মৃদু হেসে হাঁটতে শুরু করলেন। পেছন না ফিরেও বুঝতে পারছেন ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। তার হয়তো আরও কিছু কথা বলবার ছিল।

ওসমান সাহেব ঘড়ি দেখলেন–পাঁচটা দশ। তিনি সব সময় চারটার মধ্যে এসে পড়েন। আজ অনেকখানি দেরী করলেন। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে এটা খাপ খায় না। রানুকে পাওয়া যাবে কি? দেরী দেখে কোথাও চলে যায় নি তো?

রানুরা থাকে তিন তলার শেষ মাথায়। ছোট্ট এক চিলতে বারান্দা আছে তাদের। সে সেখানে দু'টি টবে মরিচ গাছ লাগিয়েছে। গোলাপ–টোলাপ না লাগিয়ে মরিচ গাছ লাগানোটা উদ্দেশ্যমূলক। উদ্দেশ্যটা কি?

তিনি বারান্দায় কাউকে দেখলেন না। সাধারণত টগর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা কি নেই আজ? টগরের জন্যে এক প্যাকেট মিমি এনেছেন। তিনি মিমির প্যাকেট হাতে নিয়ে নিলেন। আজ যেন গতবারের মত না হয়। গতবার

কারণ কিছু নিশ্চয়ই আছে। এই যে রানু খিলখিল করে হাসছে তার পেছনে যেমন কারণ আছে, বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন পড়ার পেছনেও কারণ আছে। চার রুম। গ্রীল দেয়া বারান্দা। সার্ভেন্টস রুম ও গ্যারাজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। ডয়িং কাম ডাইনিং দুই বেডরুম, দুই বাথরুম। ভাড়া বাইশশো টাকা অগ্রিম আবশ্যক।

: দুলাভাই আপনার চা।

ওসমান সাহেব চায়ের পেয়ালার দিকে তাকালেন। দুধ চা। তিনি দুধ চা খান না। দুধ ছাড়া হালকা চা খান। রানু তা জানে। ওসমান সাহেব হাসি মুখে বললেন–চিনি ছিল না বলেছিলে।

: টগরের চিনি থেকে বানানো হয়েছে।

: টগরের জন্য আলাদা চিনি কেনা হয়?

: হ্যাঁ।

অবাক হতে গিয়েও তিনি অবাক হলেন না। সব কিছু আলাদা আলাদা করার একটা প্রবণতা রানুর আছে। বিয়ের কিছুদিন পরই রানু বলেছিল–তুমি আমার সাবান ব্যবহার করছো কেন? ওসমান সাহেব অবাক হয়ে বলেছিলেন– তোমার আলাদা সাবান নাকি?

: হ্যাঁ। নীল সাবানদানীতে যে সাবান সেটা আমার।

: ও, আচ্ছা।

তবু তার মনে থাকতো না। রানুর সাবান মেখে ফেলতেন। ভুল ধরা পড়া মাত্র লজ্জাবোধ করতেন।

: চা খাচ্ছেন না কেন? চা খান।

তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন–অপলা চাটা ভালই বানিয়েছ।

: আমি বানিয়েছি বুঝলেন কি করে?

: আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি।

: আবার অনেক কিছু বুঝতেও পারেন না।

: তা ঠিক আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি না।

অপলা একটু অবাক হল। সে ধারণা করেছিল ওসমান সাহেব তার কথায় আপত্তি করবেন। কিছু কিছু মানুষকে দেখলেই মনে হয় এরা কারো কথাই মেনে নেয় না। সব সময় কঠিন কিছু যুক্তি-তর্ক বের করে বিপক্ষের মানুষটিকে ধরাশায়ী করে দেয়। যুক্তিগুলি দেয়া হয় খুব ঠাণ্ডা মাথায়। গলার স্বর থাকে খাদে। মুখ থাকে হাসি হাসি কিন্তু প্রতিটি বাক্যই কেটে কেটে বসে যায়। ওসমান সাহেব কি এ রকম একজন মানুষ?

: অপলা, এমন মন দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? কি দেখছ?

অপলা লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়াল। বিব্রতস্বরে বললো–আপনি বসুন আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসব। কাপড় বদলাব।

: আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য তোমাকে তাড়াতাড়ি আসার দরকার নেই। আমার একা বসে থাকার অভ্যাস আছে। ইউ টেক ইওর টাইম।

মাথা ধরাটা এখনো যায় নি। ওসমান সাহেব দ্বিতীয় ট্যাবলেটটি গিলে ফেললেন। একা সময় কাটানো তার নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে। সেগুলো কাজে লাগাতে শুরু করলেন। ঘরের প্রতিটি জিনিসের দিকে তিনি তাকাবেন। এবং বেশ

কিছু সময় এগুলি নিয়ে ভাববেন। এই ছোট্ট ঘরে তিনি তাঁর পদ্ধতি আগেও অনেকবার খাটিয়েছেন। প্রতিটি জিনিসই তাঁর চেনা, তবু প্রতিবারই নতুন নতুন ডিটেইল চোখে পড়ে। যেমন আজ চোখে পড়লো শোকেসে কিছু নতুন বই এনে রাখা হয়েছে। সবই কবিতার বই। রানু কবিতা পড়ে না। এখন কি পড়তে শুরু করেছে, না উপহার পাওয়া? শোকেসে একটা তালাও লাগানো হয়েছে। খুব সম্ভব টগরের জন্যে। শোকেস ঘাঁটাঘাটির বয়স এখন। দেয়ালে যে ক্যালেন্ডার ঝুলছে তার পাতা উল্টানো হয়নি। এখনো দেখা যাচ্ছে জুলাই মাস। এই ভুল রানু করবে না। সে এসব ব্যাপারে খুব সাবধান। কিন্তু ভুলটা করেছে। এটাকে কি সুক্ষ্ম কোন মানসিক পরিবর্তনের লক্ষণ বলা যাবে? ওসমান সাহেব ক্যালেণ্ডারের ছবিটির দিকে মন দিলেন, রানু এসে ঢুকলো তখন।

সে নিশ্চয়ই কোথাও বেরুবে। যত্ন করে সেজেছে। কালো জমিনের উপর লাল পাতা আঁকা জামদানী শাড়ি। শাড়িটার জন্যেই কি তার চেহারা বদলে গেছে, না রোগা হবার জন্যে এমন লাগছে? ওসমান সাহেব মুগ্ধ হয়ে তাকালেন। এবং মনে মনে বললেন–কিছু মেয়ে আছে যাদের রূপ সব সময় টের পাওয়া যায়।

: তোমরা কোথাও যাচ্ছ নাকি?

: হ্যাঁ বিয়েতে যাচ্ছি।

: আমি তাহলে যাই?

: না বস। টগর আসবে। টগরকে তুমি আজ রাতে তোমার সঙ্গে রাখবে। সকাল বেলা আমি ওকে নিয়ে আসব। অসুবিধা হবে?

: না। কার বিয়ে?

: আমাদের এক আত্মীয়।

রানু বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই সামনে বসল। শীতল স্বরে বললো–সামনে তো এ্যাসট্রে আছে, চায়ের কাপে ছাই ফেলছ কেন?

: এ্যাস্ট্রেটা এত সুন্দর যে ছাই ফেলতে ইচ্ছা করে না। সুন্দরের মধ্যে অসুন্দর ঠিক মানায় না।

: আমার সঙ্গে বড় বড় কথা বলে লাভ নেই। তোমার বড় বড় কথা অনেক শুনেছি। আর শুনতে ইচ্ছা করছে না।

তিনি দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরালেন এবং খুব সাবধানে ছাই ফেললেন এ্যাসট্রেতে। রানু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। ওসমান সাহেবও এগিয়ে গেলেন–হাল্কা গলায় বললেন, এ বাড়িতে তোমার সঙ্গে পুরুষ মানুষ কেউ থাকে না?

: না।

: একা একা থাক ভয় লাগে না।

: ভয় লাগবে কেন? এটা আমার বড় খালার বাড়ী। রাতে আমি বড় খালার সঙ্গে ঘুমাই।

: এটা তোমার খালার বাড়ী জানতাম না তো। আপন খালা?

রানু জবাব দিল না। আগ্রহ নিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। ওসমান সাহেব দেখল ক্রীম কালারের একটা গাড়ি এসে থেমেছে। প্রায় ছ'ফুটের মত স্বাস্থ্যবান একটি তরুণ হাসি মুখে নামছে গাড়ি থেকে। খুব সম্ভব এই ছেলেটির সঙ্গে রানু বিয়েতে যাবে। রানুর দিকে তাকালেন। ছেলেটিকে ওসমান সাহেব আগে দেখেছেন

কি না মনে করতে পারলেন না। দেখেছেন হয়তো, মানুষের চেহারা তাঁর মনে থাকে না।

: রানু ঐ ছেলেটা কে?

: আমাদের দূর সম্পর্কে আত্মীয়-আলম। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

: ওর সঙ্গে কি যাচ্ছ?

: হ্যাঁ। এত প্রশ্ন করছ কেন?

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন। আলমকে দেখে মনে হল সে ওসমান সাহেবকে দেখে খুব অবাক হয়েছে। সে তার বিস্ময় গোপন করল না। হাসি মুখে বললো-কেমন আছেন আপনি?

: ভাল। ভাল আছি।

: আপনি কি আমাকে চিনেছেন? আমি রানুর মামাতো ভাই। আমার নাম আলম। রানু কি আপনাকে আমার কথা বলেছে?

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। অস্পষ্টভাবে হাসলেন। যার মানে হ্যাঁও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আলম বললো-আমি আপনার একটা মাত্র বই পড়েছি-নাম হলো গিয়ে 'চৈত্রের রাতে।' বইটা আমার একটুও ভাল লাগে নি। আপনি রাগ করলেন না তো?

: না, রাগ করি নি।

: রানুকে বলেছিলাম-আমি তো বই পড়ি না। পড়তে ভালও লাগে না। উনার সবচে' ভাল বইটা দাও, পড়ি। রানু ঐটা দিল।

আলম সিগারেট ধরালো। নড়েচড়ে বসলো। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে একটা আলোচনায় নামতে চায়। ওসমান সাহেব শঙ্কিত বোধ করলেন। যে তার বই পছন্দ করে না তার সঙ্গে আলোচনা জমে না। কথা বলতে গেলেই মনের উপর চাপ পড়ে।

: আচ্ছা ওসমান ভাই, চৈত্রের রাতে বইটিতে নীলু মেয়েটি শেষ মুহূর্তে এই কাণ্ডটি কেন করল?

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। আলম উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলো-"নীলু যা করেছে তাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আমি তো তাকে ক্ষমা করবো না। ইন ফেক্ট...." তিনি হেসে ফেললেন। আলম কথা বন্ধ করে অবাক হয়ে বললো-হাসছেন কেন? ওসমান সাহেব বললেন, উপন্যাসটি আপনার পছন্দ হয় নি তবুও নীলুর ব্যাপারে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছেন। তাই হাসছি।

আলম আধ-খাওয়া সিগারেট এ্যাস্ট্রেতে গুজে নতুন সিগারেট ধরালো। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো-অনেক লেট করে ফেললাম আমরা। রানু বললো-টগরকে নিয়ে আসতে এত দেরী করছে কেন, বুঝছি না। সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। তার চোখে চিন্তার ছাপ। কপালে দু'টি সুক্ষ্ম ভাঁজ।

টগরকে তার কিছুক্ষণ পরই আসতে দেখা গেল। সে তার খালার কোলে ঘুমুচ্ছে। রানু বললো-যাক, টগরকে সঙ্গেই নিয়ে যাব। ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আলম বললো-চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

: দরকার নেই কোন।

: চলুন না। এমনিতেও আমাকে সিগারেট কিনতে হবে।

আলম বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত এলো এবং এক সময় বললো-আপনি আপনার নাম লিখে একটা বই আমাকে দেবেন। আমি আমার বন্ধুদের দেখাব।

: ঠিক আছে দেব। রানুর কাছে রেখে যাব।

: আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।

: না। আমি বিয়ে-টিয়েতে বিশেষ যাই না। আপনারা যান।

: আপনার বাসায় আপনাকে নামিয়ে দেব।

: দরকার নেই কোন।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। অল্প কয়েক পা হাঁটার পরই মনে হলো মিমির প্যাকেটটা টগরকে দেয়া হয় নি। আলম এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই ফিরে গিয়ে তার হাতে দেয়া যায়। কিন্তু ফিরলেন না। লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন।

আকাশে মেঘ। ঘন কালো মেঘ।

বৃষ্টি কি হবে? ভাদ্র মাসে এত মেঘ হয় আকাশে?

২

ওসমান সাহেব বাড়ি ফিরলেন রাত আটটায়। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটাবার সময় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। তাঁর ধারণা বৃষ্টির ফোঁটা যদি ছোট হয় এবং যদি খুব কাছাকাছি হয় তাহলে বৃষ্টি থামতে দীর্ঘ সময় লাগে। ফোঁটার ধরন দেখে তাঁর মনে হলো সারা রাত বৃষ্টি হবে। এবারে খুব শুকনো ধরনের বর্ষা গেছে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে বৃষ্টির শব্দ শোনা হয়নি। আজ হয়ত শোনা যাবে।

চার টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল। ওসমান সাহেব চকচকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে মনে মনে বললেন, বৃষ্টি আসার আনন্দে তোমাকে এক টাকা বকশিস দেয়া গেলো।

বসার ঘরে টিভি চলছে। আকবরের মা এবং তার ছেলে জিতু মিয়া পা ছড়িয়ে টিভি দেখছে। তারা দেখলো ওসমান সাহেব ঢুকছেন কিন্তু কেউ গা করলো না। দু'জনই ভান করলো-দেখতে পায় নি। ওসমান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন-সদর দরজা খোলা কেন আকবরের মা? আকবরের মা জবাবই দিল না। তাকিয়ে রইল।

: অন্য কোন ঘরে বাতি জ্বালাওনি কেন? যাও শোবার ঘরের বাতি জ্বালাও। টিভির সাউন্ড কমিয়ে দাও।

আকবরের মা বিরক্ত মুখে উঠে গিয়ে বাতি জ্বালালো। ওসমান সাহেব ঘরে ঢুকে দেখলেন বেশ পরিষ্কার করে বিছানা করা। লেখার টেবিলে নতুন টেবিল ক্লথ। কাচের জগে পানি। পিরিচ দিয়ে ঢাকা একটা গ্লাস।

লেখার কাগজ। একটা লাল এবং একটা কাল বল পয়েন্ট পেন। হাতের বাঁ পাশের বুকশেলফের বইগুলি চমৎকার করে গোছানো। শুধু তাই নয়, খাটের পাশে ছোট্ট টেবিলটায় একটা স্টেনলেস স্টিলের বাটিতে কিছু টাটকা বেলি ফুল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন-কেউ এসেছিল আকবরের মা।

: মিলা আফা আসছিল।

www.BDeBooks.Com

: গিয়ে কি দেখি জান? তোমাদের জিতু মিয়া সোফায় পা তুলে লাট সাহেবের মত বসে আছে। এমন এক চড় দিয়েছি। চড়ের কথা তোমাকে বলেছে?

: না।

: আচ্ছা ভাইয়া, শোন, যে জন্যে তোমাকে টেলিফোন করলাম–ভাবীকে গতকাল দেখলাম একটা ছেলের সঙ্গে রিকসায় করে যাচ্ছে। সুন্দর মত ছেলে। চেক চেক একটা সার্ট গায়ে। দু'জনে খুব হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করছিল। ভাইয়া, তুমি শুনতে পাচ্ছ?

: পাচ্ছি।

: কিছু বলছ না কেন?

: দেখ মিলি রানুর সঙ্গে আমার বনিবনা হয়নি। আমরা আলাদা থাকছি। এখন সে যদি কোন ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয় তাহলে হবে। আমি এখানে কি বলব?

: কিছুই বলবে না? ভাবীর সঙ্গে তোমার সেপারেশন তো এখনো হয়নি।

: এখনও হয়নি কিন্তু হবে। রানু কাগজপত্র জমা দিয়েছে। আচ্ছা মিলি আমি রাখলাম, ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাবার জন্যে ধন্যবাদ।

: শোন ভাইয়া, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি।

: বল কি বলবি।

: তুমি নাকি বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছ?

: বাড়ি বিক্রি করবো কেন?

: কেন করবে তা আমি কি করে জানব। আমি যা শুনলাম তোমাকে বললাম।

: ভুল শুনেছিস।

: কার কাছে শুনলাম সেটা জিজ্ঞেস করলে না?

: না গুজব শোনায় আমার আগ্রহ নেই। মিলি আমি রাখলাম।

: এত রাখি রাখি করছ কেন?

: ক্ষিধে লেগেছে। ভাত খাব।

: ঠিক আছে তাহলে ভাত খাবার পর আমাকে টেলিফোন করবে।

: কেন কথা এখনও শেষ হয় নি?

খুব একটা ইন্টারেস্টিং গল্প তোমাকে বলব ভাইয়া। আমার এক বান্ধবীর জীবনের সত্যি ঘটনা। তুমি এটা নিয়ে একটা গল্প লিখতে পার। তবে বান্ধবীর নাম ব্যবহার করতে পারবে না। হ্যালো, ভাইয়া, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

: পাচ্ছি।

: একটু ধরে রাখ। বাবু কি জন্যে ডাকছে শুনে আসি। আচ্ছা ভাইয়া শোন, হ্যালো? বাবুর ভাল নাম রেখে দিলে নাতো। খুব সুন্দর দেখে তিন অক্ষরে একটা নাম দাওতো। শুরু হবে ম দিয়ে। আমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে চাই।

: মৌসুমী রাখ।

: না মৌসুমী না। মৌসুমী সিনেমার নায়িকার নাম।

: মিতুল।

: ওটাতো ছেলেদের নাম।

: আজকাল ছেলেদের এবং মেয়েদের একই নাম হয়।

: মিতুল শব্দের মানে কি?

: আমি জানি না।

: বল কি, তুমি এতবড় লেখক হয়ে মিতুল শব্দের মানে জান না?

: আমি বড় লেখক তোকে বলল কে? আচ্ছা এখন রাখলাম।

তিনি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। আকবরের মা এবং জিতু মিয়া গভীর আগ্রহে টিভি দেখছে। জীবনের সমস্ত সুখ ও আনন্দ যেন এই যন্ত্রটিতে। রানু চলে যাওয়ায় এরাই বোধ হয় সবচেয়ে খুশী।

তিনি নিজেও কি খুশী হন নি? সম্পূর্ণ নিজের মত করে থাকার একটা আলাদা আনন্দ আছে। স্বাধীনতার আনন্দ। রানুর অভাব তিনি যতটা বোধ করবেন ভেবেছিলেন ততটা করছেন না, তেমন কোন শূন্যতা তার মধ্যে তৈরী হয় নি। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। শুধু রানু কেন টগরের জন্যও কি তিনি তেমন কোন আকর্ষণ অনুভব করেন? মনে হয় না। কাউকে ভালবাসার ক্ষমতাই বোধ হয় তার নেই।

আকবরের মা বললো–ভাইজান ভাত দিব?

: দাও। কি রান্না আজকে?

: কই মাছ।

ওসমান সাহেব তৃপ্তি করে ভাত খেলেন। খাওয়ার শেষে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে দু'টি সিগারেট শেষ করলেন। তাঁর পান খেতে ইচ্ছা হল। ঘরে পান ছিল না। জীতু মিয়া ছাতা মাথায় দিয়ে পান কিনতে গেলো। ওসমান সাহেবের মনে হলো এই জীবনটাই বা নেহায়েত খারাপ কি। নিঃসঙ্গতারও তো এক ধরনের আনন্দ আছে। শূন্যতার মধ্যেও আছে পরিপূর্ণতা। নৈঃশব্দ্যের গান।

: ভাইজান আপনার টেলিফোন।

তিনি রিং শুনতে পেলেন। বেশ জোরেই শব্দ হচ্ছে। কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না কেন? যা আমরা শুনতে চাই না আমাদের মস্তিষ্ক সব সময় চেষ্টা করে তা যেন শুনতে না হয়।

ওসমান সাহেব বললেন–আকবরের মা, তুমি বারান্দায় একটা মোড়া এনে দাও আর যে টেলিফোন করেছে তাকে বলে দাও আমি এখন ব্যস্ত, সকাল বেলা টেলিফোন করতে।

: মিলা আফা ফোন করছে।

: যা বলতে বললাম–বল।

; আমি কইছি, আপনে বারান্দায়।

অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি টেলিফোন ধরলেন–কি ব্যাপার মিলি?

: ভাইয়া আমার কথা শেষ হবার আগেই তুমি খট করে টেলিফোন রেখে দিলে কেন?

: কি বলতে চাস বল।

: তুমি আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার কর কেন?

ওসমান সাহেব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। মিলি বললো–বাবার শরীর এত খারাপ তুমি একবারও তাঁকে দেখতে যাও নি। পরশু দিন তিনি দুঃখ করছিলেন। আমাগীকাল আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

: ঠিক আছে।

: শোন ভাইয়া, তুমি বাবার সঙ্গে কয়েকদিন থাকবে। একা একা এই বাড়িতে পড়ে থাকার কোন মানে আছে?

: আচ্ছা সেটা দেখা যাবে।

মিলি আরো মিনিট দশেক কথা বলে টেলিফোন রাখলো। ওসমান সাহেব নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘুম ঘুম লাগছে, আবার শুয়ে পড়তেও ইচ্ছা হচ্ছে না। রানু যখন ছিলো দু'টো পর্যন্ত জেগে থাকতেন। এখন এগারোটা বাজতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। এর অন্তর্নিহিত রহস্যটি কি?

বৃষ্টির জন্য শীত করছে। পাতলা কোন একটা জামা গায়ে দিয়ে ঘুমুতে হবে। আলনায় তেমন কিছু নেই। কোথায় থাকতে পারে? কাবার্ডে নিশ্চয়ই নেই। কাবার্ডে থাকতো রানুর কাপড় এবং কোন কারণে তিনি কাবার্ড খুললে রানু বিরক্ত হত। কঠিন স্বরে বলতো–আমার জিনিসে হাত দিচ্ছ কেন?

মজার ব্যাপার হচ্ছে রানু তার জিনিসের কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়নি। আসার সময় যেমন চটের একটা হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে এসেছিল, যাওয়ার সময়ও ঠিক সেভাবেই গিয়েছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমাদের সবার মধ্যেই নাটক করবার প্রবণতা আছে। রানুর মধ্যে সেটা হয়ত ছিল বেশী মাত্রায় নয়ত বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় নীল রঙের শাড়ি পরার দরকার ছিল না। ওসমান সাহেবের ধারণা সে এই শাড়ি পরেছে কারণ প্রথম যখন সে এ বাড়িতে আসে তার পরনে ছিল নীল শাড়ি। কিংবা সমস্ত ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। রানু হয়ত সচেতনভাবে কিছু করেনি। তিনি অন্য রকম ব্যাখ্যা করছেন। যাবার সময় গায়ে নীল শাড়ি ছিল বলেই সেই শাড়ি পরেই গিয়েছে।

জিতু মিয়া পান নিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিল। ওসমান সাহেব বললেন, এখন আর লাগবে না সকালে খাবো। জিতু বেচারী বৃষ্টি মাথায় হেঁটে হেঁটে পান আনতে গেছে–একটা নিয়ে খেলেই হত। কিন্তু তার উঠতে ইচ্ছা করছে না। শরীর জুড়ে আরামদায়ক একটা আলসা।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। কি মাস এটা? ভাদ্র মাস না? বাংলা মাসের নামের মধ্যে ভাদ্র মাস নামটাই সবচেয়ে খারাপ। সবচে সুন্দর হলো শ্রাবণ। চৈত্র নামটাও ভাল। ওসমান সাহেব হাত বাড়িয়ে শেলফ থেকে একটা বই নামালেন। পড়তে ইচ্ছে করছে না। চোখ বুলানোর জন্য নেয়া। এক সময় প্রচুর পড়তেন। রাতের পর রাত বই পড়ে কাটিয়েছেন। একবার 'জাম্প ইন্টু নাথিংনেস' নামে একটা বই রাত তিনটায় পড়ে শেষ করলেন। তারপর নিজে চা বানিয়ে খেলেন এবং সেই বই-ই আবার গোড়া থেকে পড়তে শুরু করলেন। চমৎকার সময় ছিল সেটা। আনন্দও উল্লাসের সময়। মনে আছে একটি জাপানী ছোটগল্প একরাতে চারবার পরার পর অনুবাদ করতে বসলেন। তার সমগ্র জীবনে এই একটিই অনুবাদ কর্ম। সেই অনুবাদটি তিনি কখনো প্রকাশ করেননি। প্রকাশ না করার পেছনের যুক্তিটি ছিল ছেলেমানুষী যুক্তি–'আমি ঐ জাপানী লেখকের চেয়েও অনেক বড় লেখক হব। ওর গল্পের অনুবাদ আমি কেন করব?'

তিনি বড় লেখক হতে পেরেছেন? অনেক গল্প-উপসন্যাস লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু বড় লেখক হতে পেরেছেন কি? 'কেউ তার নিজের প্রতিভার বাইরে যেতে পারে না।' খুব সত্যি কথা। বাতি নিভিয়ে ওসমান সাহেব জাপানী গল্পের কথা ভাবতে শুরু করলেন–

'একটা ছোট্ট শহর। সেই শহরের নিয়ম হচ্ছে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের শহরের রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা। কোমর পর্যন্ত ঢুকানো থাকে গর্তে। শরীরটা বেরিয়ে থাকে। দিন যায়। ধীরে ধীরে এরা বদলে যেতে থাকে। এবং এক সময় এরা গাছ হয়ে যায়। এই রকম একজন অপরাধী পুরুষ ধীরে ধীরে গাছ হচ্ছে তার রোজ রাতে তার স্ত্রী আসে তার কাছে। জানতে চায় ''তোমার কেমন লাগছে?'' পুরুষটি ক্লান্ত স্বরে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে। মেয়েটি জানতে চায়–তুমি কি এখনো আমাকে ভালবাসো। পুরুষটি থেমে থেমে বলে আমি জানি না। আমি গাছ হয়ে যাচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি না।

''যখন মানুষ ছিলে তখন কি আমাকে ভালবাসতে?''

একটি অসাধারণ গল্প। কিন্তু আজ এই বর্ষার রাতে তিনি এই গল্পটির কথা ভাবছেন কেন? নিজেকে কি তিনি 'গাছ' হিসাবে ভাবছেন। রানু হচ্ছে সেই গাছের পাশে আসা মেয়েটি?

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। গল্পটির প্রভাব। অন্য কিছু নয়। প্রতিভাবান জাপানী গল্পকার তার মধ্যে একটি বিশুদ্ধ আবেগ সৃষ্টি করেছেন। চোখ ভিজে ওঠার পেছনে রানুর কোন ভূমিকা নেই।

৩

মিলির বয়স তেইশ।

রূপসী মেয়েদের যা যা থাকতে হয়, সবই মিলির আছে। গায়ের রং ফর্সা। গড়পড়তা মেয়েদের তুলনায় অনেকখানি লম্বা। কাটা কাটা চোখ মুখ। বাঁ চোখের নিচে চোখে পড়ার মত কালো তিল। তবু মিলির ধারণা তাঁর চেহারাটা খুবই সাধারণ। সাধারণ এবং বাজে। তা না হলে বিয়ে নিয়ে কোন মেয়ের এত ঝামেলা হয়? কথাবার্তা অনেক দূর এগুবার পর পাত্রপক্ষ হঠাৎ সময় চায়। "খালার অসুখ, ছেলের এক ভাই বিদেশে থাকেন–তিনি বিয়েতে আসার ছুটি পাচ্ছেন না" ইত্যাদি। বিয়ে ঠিকঠাক হবার পর সময় চাওয়ার একটাই মানে। বিয়ে হবে না।

যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল তার নাম মতিয়ুর রহমান। মোটা –সোটা বেঁটে–খাট মানুষ। নাকের নিচে হিটলারী গোঁফ। সিভিল সাপ্লাইয়ে কাজ করে। মিলির জন্যে খুব যে আকর্ষণীয় পাত্র তা নয়। তবু এই বিয়ে নিয়েও কত ঝামেলা। কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার পর দিনই ছেলের বড় ফুপা টেলিফোন করে জানালেন, ছেলে ঠিক করেছে তার ছোটবোনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে বিয়ে করবে না।

সে সময়টা মিলির খুব খারাপ কেটেছে। এমনিতেই সে রোগা। এই সব ঝামেলায় আরো রোগা হয়ে গেল। গালের হাড় বের হয়ে এল। তার চেয়েও বড় কথা মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল। চিরুনী দিয়ে একটা টান দিলেই একগাদা চুল উঠে আসে। মাথা ভর্তি চুল মিলির। কিন্তু এভাবে উঠতে থাকলে মাথা ফাঁকা হয়ে যেতে বেশি দিন লাগার কথা নয়। তার দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হত না। এ অবস্থায় এক সপ্তাহের মধ্যে হুট করে মিলির বিয়ে হয়ে গেল, মতিয়ুর রহমানের

www.BDeBooks.Com

সঙ্গেই। এবং তখনো তার ছোট বোনের বিয়ে হয়নি। মিলির ধারণা শ্বশুর বাড়ির কেউ তাকে পছন্দ করে নি, নেহায়েত ছেলের জন্যে কোথাও কিছু পায়নি তাই আবার তার কাছে এসেছে। কথাটা আংশিক সত্য। শ্বশুরবাড়ির অন্য কেউ তাকে পছন্দ করেনি কিন্তু মতিয়ুর রহমান করেছিল। এবং বিয়েটা হয়েছে তার আগ্রহেই। এরকম আজগুবী কথা মিলি বিশ্বাস করে না। সে নিজেকে সুন্দর দেখানোর যত রকম প্রক্রিয়া আছে সব চালিয়ে যায়। তার ধারণা কোনটিই তার বেলায় কোন কাজ করে না। কাজ করলে তার বরের চোখেই পড়ত। কিন্তু পড়ে না।

সে গত পরশু সামনের দিকের এক গাদা চুল কেটে ফেলেছে। এত বড় একটা ব্যাপারও মতিয়ুরের চোখে পড়েনি। মিলি যখন বলেছে, কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ? সে নির্লিপ্ত গলায় বলেছে–কি চেঞ্জ?

: কিছুই চোখে পড়ছে না?

: না তো। কোন কিছু চোখে পড়ার ব্যাপার আছে না কি?

মিলি বহু কষ্টে নিজেকে সামলেছে। তার ধারণা তার বরের তার প্রতি কোন উৎসাহ নেই। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম হয় না কি? ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু তার তেমন কোন ভাল বন্ধু নেই।

বিকেলে মিলি তার শাড়ির ট্রাংক খুলল। কোনটাই তার পছন্দ হল না। আচ্ছা সে কেন বেছে বেছে সব জংলি কালারগুলি পছন্দ করে? কেনার সময় মনে হয় কি অপূর্ব রং, কি অদ্ভুত ডিজাইন। কিন্তু কেনার পর আর তাকাতে ইচ্ছে করে না।

: কোথাও যাচ্ছ নাকি?

: হ্যাঁ।

: কোথায়?

: ভাইয়ের কাছে যাব।

মতিয়ুর হালকা সুরে বলল,–আমি একটা লিফট দিতে পারি। এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। মিলি গম্ভীর গলায় বলল, আমার লিফট-টিফট লাগবে না। বলেই মনে হল–এটা সে বলল কেন? তাদেরতো কোন ঝগড়া হয়নি। মিলি গলার স্বর বদলে বলল, দেখতো কোন শাড়িটা পরব।

: একটা পড়লেই হয়। ভাইয়ের কাছে যেতে আবার এত সাজগোজ লাগে নাকি?

: তাই বলে ফকিরনীর মত যাব?

: পর এই সবুজটা পর।

: এমন কড়া রোদে ডার্ক কালার পরব?

: বিকেলে রোদ থাকবে না।

: না থাকুক। ডার্ক কালার আমাকে মানায় না। বিহারী মেয়েদের মত লাগে।

মতিয়ুর কিছু বলল না। তার মানে সে স্বীকার করে নিল যে ডার্ক কালার তাকে মানায় না। যেটা তাকে মানায় না সেটা পরতে বলার অর্থ কি? মিলির গলা ভার ভার হয়ে গেল। সে ঠিক করলো কোথাও যাবে না। ঘরেই থাকবে। মিলির কোন সিদ্ধান্তই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এটাও হল না। সে সবুজ রঙের শাড়িটা পরল

এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বদলে হলুদ ফুটি দেয়া একটা সাদা শাড়ি পরল।

ওসমান সাহেব ঘরে ছিলেন না। কোথায় গিয়েছেন কখন ফিরবেন আকবরের মা বলতে পারল না। মিলি বিরক্ত স্বরে বলল, কাল টেলিফোন করে বলে রেখেছি আমি আসব। আকবরের মা ভীত স্বরে বলল–আফা চা দিমু?

: আমি চা খাই নাকি? কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?

: জ্বি না।

: কিছুই বলে নি?

: বলছে টেলিফোন বাজলে আমরা কেউ যেন না ধরি।

: কেন?

: আমি কই ক্যামনে?

মিলি আধঘন্টার মত বসল। এই সময়ের মধ্যেই শোবার ঘর এবং বসার ঘর পরিষ্কার করল। আকবরের মাকে দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করাল। শোবার ঘরের বুক শেলফের সমস্ত বই নামিয়ে আবার নতুন করে রাখল।

লেখার টেবিল কাল যেমন গোছানো ছিল আজও তেমনই আছে। তার মানে ভাইয়া লিখতে বসে নি। সাদা কাগজে অবশ্যি কিছু কাটাকুটি আছে। মিলি পড়তে চেষ্টা করল হলুদ পাখি সবুজ বন। এইটিই আট দশ বার লেখা। কোন নতুন গল্প বা উপন্যাসের নাম। মিলি তার ভাইয়ের কোন লেখা ছাপা হয়ে যাবার পর আর পড়ে না। গল্পের বই তার ভাল লাগে না। কয়েক পাতা পড়বার পরই তার মাথা ধরে। শুধু চৈত্রের রাতে বইটা ছয়ত্রিশ পাতা পর্যন্ত পড়েছে। কারণ সেখানে একটা চরিত্র আছে নাম মিলি। সবাই বলে এটা নাকি তাকে নিয়েই লেখা। কিন্তু মিলির তা মনে হয় না। কারণ বইয়ের মিলি খুব সুন্দর। একটু বোকা। সেই মিলি অল্পতেই রাগ করে।

: আকবরের মা, আমি যাচ্ছি।

: বইতেন না?

: খালি বাড়িতে বসে থেকে করব কি?

: যাইবেন কই?

: সেটা দিয়ে তুমি কি করবে? যত বাড়তি কথা। তুমি কথা কম বলবে। এত বেশী কথা বল কেন?

গাড়ির ড্রাইভারও জিজ্ঞেস করল–কোথায় যাবেন? রেগে যেতে গিয়েও মিলি রাগ সামলালো। কারণ এটা নিজেদের গাড়ি নয়। মতিয়ুরের মামাতো বোনের গাড়ি। মাঝে মাঝে নিয়ে আসা হয়। আজ রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মিলি গাড়িটা নিজের কাছে রাখতে পারবে। কিন্তু তার যাবার কোন জায়গা নেই।

: বেগম সাহেব কোন দিকে যাবেন?

: নিউমার্কেটে চল।

: আজ সোমবার নিউমার্কেট বন্ধ।

: তোমাকে যেতে বলছি তুমি যাও। সোমবার নিউমার্কেট বন্ধ এটা তুমি জান, আমি জানি না?

মিলি গেটের সামনে গাড়ি রেখে বন্ধ নিউমার্কেটে ঢুকল। কিন্তু মাস্তান ধরনের ছেলে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদের দিকে তাকালেই বুকের মধ্যে

ধুক করে শব্দ হয়। মিলি তবু তাকাল, সব ক'টি ছেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এর মধ্যে একটি প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা। নিউমার্কেট বন্ধ হলেও দু'টি ওষুধের দোকান খোলা। সে গট গট করে ঢুকল ওষুধের দোকানে চারটি প্যারাসিটামল ও দু'টি ঘুমের ট্যাবলেট 'ফেনোবরবিটন' কিনলো। দু'টি কিনল যাতে দোকানীর মনে কোন সন্দেহ না হয়। দু'টি করে কিনে কিনে সে একটা ক্রীমের কৌটা ভর্তি করে ফেলেছে। কৌটাটির দিকে তাকালে তার ভয় লাগে। আবার ভালও লাগে।

: বেগম সাহেব এখন কোনদিকে যাবেন?

: নিউ পল্টন লাইন। গোরস্তানের পাশ দিয়ে যাও। ইরাকী গোরস্তান চেন? ঐ দিকে।

মিলির সমস্ত সিদ্ধান্তের মত এই সিদ্ধান্তও আকস্মিক। এখন সে যাচ্ছে রানুদের বাসায়। সে নিশ্চিত জানে রানুকে বাসায় পাওয়া যাবে না। আজ একটা খারাপ দিন। কাউকে আজ পাওয়া যাবে না। টেলিফোন করলে সেটা হবে রং নাম্বার। টিভির সামনে বসলে কারেন্ট চলে যাবে।

রানু ঘরেই ছিল। মিলিকে দেখে তার যতটা অবাক হবার কথা ততটা হল না। যেন মিলির এখানে আসাটা খুব স্বাভাবিক। সে রোজই আসে। কিন্তু তাতো নয়। মিলি বলল, ভাবী আমি আরো একদিন এসেছিলাম। তুমি ছিলে না।

: জানি তোমার নোট পেয়েছিলাম।

: আজ কিন্তু ভাবী বেশীক্ষণ থাকব না। পাঁচ মিনিট বসব।

: এত তাড়া কিসের?

: ওর এক মামাতো বোনের গাড়ি নিয়ে এসেছি, সাড়ে আটটার মধ্যে ফেরত দিতে হবে।

: সাড়ে আটটা বাজতে দেরী আছে। তুমি আরাম করে বস। নতুন হেয়ার স্টাইল দেখছি।

: কেমন লাগছে ভাবী?

রানু হাসি মুখে বলল–একটু ছেলে ছেলে লাগছে। মিলির মুখ কালো হয়ে গেল। তাকে ছেলে ছেলে লাগছে। এটা সে নিজেও লক্ষ্য করেছে। রানু বলল–মেয়েদের চেহারা একটু ছেলে ছেলে দেখালে খারাপ লাগে না। ছেলেদের যেমন মেয়ে মেয়ে চেহারাতে ভালই লাগে অনেকটা এ রকম। মিলির মুখের অন্ধকার কাটল না। সে করুণ মুখ করে বসে রইল। রানু বলল, শোবার ঘরে চল। আমার সংসার দেখ।

তার শোবার ঘরটি চমৎকার করে সাজানো! দু'টি খাট পাশাপাশি। একটিতে টগর ঘুমিয়ে আছে। ওর গায়ে পাতলা একটা চাদর।

: ও এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে কেন ভাবী?

: টগরের শরীরটা ভাল না জ্বর।

মিলি উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে টগরের কপালে হাত রাখল, বেশ জ্বর তো ভাবী! হাত পুড়ে যাচ্ছে।

: খুব বেশী না। একশ এক।

: একশ এক, কম দেখলে? ভাইয়াকে খবর দিয়েছ?

: না, ওকে খবর দেইনি। সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি হৈ চৈ করি না। ঠান্ডা লেগেছে, গা গরম হয়েছে। সেরে যাবে। তুমি কিছু খাবে মিলি?

: না।

: এক কাপ চা খাবে?

: আমি চা খাই না ভাবী। চা খেলে রাতে আমার ঘুম হয় না।

রানু সহজ স্বরে বলল–চায়ের সঙ্গে ঘুমের কোন সম্পর্ক নেই। আমার সাথে এক কাপ খাও কিছু হবে না। এসো রান্নাঘরে, মোড়া পেতে দিচ্ছি। রানু চায়ের কেতলি বসাল। মিলি তার পাশেই চুপচাপ বসে রইল। রানু বলল, গল্পটল্প কর। চুপচাপ বসে আছ কেন?

: কি গল্প করব?

: তোমরা যে গাড়ি কিনবে শুনেছিলাম তার কি হল?

: জানি না কিছু। ও রিকন্ডিশন্ড গাড়ি কিনতে চায় না। নতুন গাড়ি কেনার মত টাকাও বোধ হয় নেই।

: বোধ হয় বলছ কেন? তুমি জান না?

: না। টাকা পয়সার ব্যাপারে আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না। ও নিজেও বলে না।

: নাও, দেখ চায়ে চিনি হয়েছে কি না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিলি রানুকে দেখতে লাগল। স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে কিন্তু তাতে যেন তাকে আরো সুন্দর লাগছে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া একটি বাচ্চা মেয়ের মত লাগছে। রানু বলল–তুমি কি কিছু বলতে চাও নাকি?

: না, কি বলব?

: মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে কি একটা বলতে গিয়েও বলছ না?

মিলি ইতস্তত: করে বলল–ভাইয়ার মত এমন একজন ভাল মানুষকে তোমার পছন্দ হল না কেন? এটা আমার খুব জানার ইচ্ছা। নাকি সে ভাল মানুষ না? রানু সহজভাবেই বলল তোমার ভাই দূর থেকে খুব ভাল মানুষ। শুধু ভাল মানুষ না, খুবই ভাল মানুষ। । কিন্তু কাছ থেকে না। তোমরা কেউ ওকে কাছ থেকে দেখ নি।

: আমার ভাই আর আমি কাছ থেকে দেখি নি?

রানু হালকা গলায় বলল–পাশাপাশি থাকলেই কাছ থেকে দেখা হয়না মিলি।

দু'জনই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। এক সময় রানু বলল–আটটা বেজে গেছে, তোমার না সাড়ে আটটায় গাড়ি ফেরত দিতে হবে?

মিলি উঠে দাঁড়াল। শোবার ঘরে গিয়ে টগরের মাথায় হাত রাখল। ঘাম দিচ্ছে। জ্বর কমে যাচ্ছে বোধ হয়। রানু তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেখতে এল। মিলির মনে হল আবহাওয়াটা কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। কেউ সহজ হতে পারছে না। মিলি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবার জন্য জিজ্ঞেস করল–শাড়িটাতে আমাকে কেমন লাগছে ভাবী?

: খুব একটা ভালো লাগছে না। সাদার ব্যাক গ্রাউণ্ড হলুদ ফোঁটা গুটি বসন্তের মত দেখাচ্ছে। রাগ করলে না তো?

: না রাগ করব কেন? তোমার কাছে যা সত্যি মনে হয়েছে তাই বলেছ।

www.BDeBooks.Com

মিলি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। রানু বলল–খুব সাবধানে নামবে, সিঁড়িটা ভাল না। মিলি কোন জবাব দিল না। তার চোখ ঝাপসা। অল্পতেই তার চোখে পানি আসে।

মিলিরা থাকে কলাবাগান, লেক সার্কাসে। নিজেদের বাড়ি নয়। ভাড়া বাড়ি। বাড়িটি কেনার কথা হচ্ছে। কথাবার্তা কোন পর্যায়ে আছে মিলি জানে না। মতিয়ুর এ সব ব্যাপারে তার সঙ্গে কখনো কোনো কথা বলে না। মিলির শ্বশুর একবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন–বাড়ি কেনার কি হয়েছে। তখনি শুধু মিলি জানল বাড়ি কেনার একটা কথাবার্তা চলছে। একদিন সত্যি সত্যি কেনা হয়ে যাবে এবং তারও অনেক দিন পর হয়ত মিলি জানবে। কিংবা হয়ত জানবেই না।

মতিয়ুর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর সঙ্গে খুব রোগা, চশমা পরা একজন লোক। সে ছেলেটির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। মিলিকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেও সে না দেখার ভান করল। এবং আগের মতই হেসে হেসে কথা বলতে লাগল। কিন্তু লোকটি তাকিয়ে আছে মিলির দিকে। বেশ ভদ্রভাবেই তাকিয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মিলির কি উচিত কাছে এগিয়ে যাওয়া? না। মতিয়ুর পছন্দ করবে না, সে তার কোন বন্ধুর সঙ্গে মিলিকে আলাপ করিয়ে দেয় না।

ওদের বাড়িতে বাইরের পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলার রেওয়াজ নেই। মতিয়ুরের একটি বোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ফিজিক্সে অনার্স। সে ও বোরকা পড়ে ক্লাসে যায়।

মিলি তার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। ভাইয়াকে টেলিফোন করল কয়েকবার। রিং হচ্ছে, কিন্তু ধরছে না। তার মানে ভাইয়া ফেরেনি। এবং আকবরের মা টেলিফোন ধরছে না। মিলির রোখ চেপে গেল। কতক্ষণ সে না ধরে থাকবে? রিং হতে থাকুক। পাঁচবার, ছ'বার, সাতবার, আটবার ন'বার।

: হ্যালো।
: কে ভাইয়া?
: টেলিফোন ধরছিলে না কেন?
: এইমাত্র আসলাম।
: ওদের টেলিফোন ধরতে নিষেধ করে গেছ কেন?
: কি বলতে চাস সেটা বল। আমি গোসল করব।
: ভাইয়া শোন, আমি ভাবীর বাসায় গিয়েছিলাম।
: ভাল।
: সুন্দর বাসা।
: সুন্দর হলে তা ভালই।
: টগরের জ্বর। খুব জ্বর।
: ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। মিলি বলল–হ্যালো, ভাইয়া আমার কথা শুনছ?
: শুনছি।
: কিছুতো বলছ না।
: কী বলব?

মিলি খানিকক্ষণ ইতস্তত: করে বলল–তোমাকে একটা ছেলের কথা বলেছিলাম না, কালো মত, ভাবীর সঙ্গে এক রিকশায় যাচ্ছিল?
: হ্যাঁ বলেছিলি।
: ঐ ছেলেটা ভাবীর বসার ঘরে বসেছিল।

তিনি একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–ঐ ছেলেটার নাম আলম। ও এসেছিল আমার এখানে একটা বই নিতে। আমার সঙ্গেই ছিল এতক্ষণ। তুই ওকে দেখিস নি। শুধু শুধু কেন এত মিথ্যা বলিস?

মিলি কোন কথা বলল না। ওসমান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন–রেখে দেই কেমন?
: আচ্ছা।
: আর কিছু বলবি?
: না।

ওসমান সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

৪

ওসমান সাহেবের বাবা ফয়সল সাহেবের বয়স তিয়াত্তর। এই বয়সেও তিনি বেশ শক্ত। রোজ ভোরে দু'মাইল হাঁটেন। বিকেলে ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট ফ্রি হ্যাণ্ড একসারসাইজ করেন। চোখের দৃষ্টি ঠিক আছে। কিছুদিন আগেও চশমা ছাড়া পড়তে পারতেন। এখন অবশ্যি প্লাস ওয়ান পাওয়ারের চশমা লাগে। লোকটি ছোটখাট এবং রোগা-পাতলা। রোগা লোকেরা যেমন হয়–দারুণ রগচটা। দু'মাস আগে তাঁর ছোটখাট একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তার রাগারাগি না করার জন্যে কঠিন নিষেধ জারি করেছেন। বাড়ির লোকজনদেরও বলা হয়েছে যেন কিছুতেই তাঁকে রাগানো না হয়। যা বলেন তাই যেন সবাই মেনে চলে। সবাই করেছেও তাই। এতে ফয়সল সাহেব আরো রেগে যাচ্ছেন। আজও মিলিকে ঢুকতে দেখে তিনি রেগে গেলেন। রাগের যদিও কোন কারণ ছিল না।

তিনি বসেছিলেন বারান্দায় ইজিচেয়ারে। নিচু একটা কফি টেবিলে পা তুলে দিয়েছেন। কোলের উপর খবরের কাগজ। তিনি কাগজ পড়ছিলেন না। মিলিকে ঢুকতে দেখে কাগজের উপর চোখ রাখলেন। মিলি ক্ষীণস্বরে বলল, কেমন আছ বাবা?
: ভালই আছি, খারাপ থাকব কেন?
: না মানে শরীর ঠিক আছে তো?
: ঠিক না থাকলে তুই কি করবি, ঠিক করে দিবি?

মিলি কি বলবে বুঝতে পারল না। বাবার সামনে একটি চেয়ার আছে। সেখানে কি বসবে খানিকক্ষণ? কিন্তু বাবা নিশ্চয়ই তা পছন্দ করবেন না। মিলি সংকুচিত হয়ে বসেই পড়ল। ভয়ে ভয়ে বলল, নানান ঝামেলায় থাকি, আসাই হয় না।
: আসতে বলি নাকি?
: না বলবেন কেন? নিজে থেকেই তো আসা উচিত।

: আমি সুখেই আছি। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। নিজেদের কথা ভাব। নিজেদের চরকায় তেল দে। আই থিং ইওর চরকা নিডস ওয়েলিং।

ফয়সল সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং অতিদ্রুত পা নাচাতে শুরু করলেন। এটা তাঁর একটা সিগন্যাল। যার মানে হচ্ছে আমি আর একটি কথারও জবাব দেব না, এখন বিদেয় হও। মিলি তবু আরেকবার চেষ্টা করল। বেশ উৎসাহের ভঙ্গি করে বলল, রানু ভাবীর বাসায় গিয়েছিলাম। ওরা ভালই আছে। তবে টগরের গা গরম।

ফয়সল সাহেব পত্রিকাটি চোখের আরও কাছে নিয়ে এলেন। যেন হঠাৎ দারুণ একটা খবর চোখে পড়েছে।

: আপনি যদি রানু ভাবীকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন তাহলে মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।

: আমি বুঝিয়ে বলব কেন? হু এম আই? এখানে আমার কথা আসছে কেন? যাদের ঝামেলা তারা মিটাবে।

: ভাবী আপনাকে খুব রেসপেক্ট করে।

: সে রেসপেক্ট করতে চাইলে করবে। তার মানে এই না....

ফয়সল সাহেব কথা শেষ করলেন না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। আগে দিনে এক প্যাকেট করে খেতেন। স্ট্রোক হবার পর পর ডাক্তার সিগারেট নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ফয়সল সাহেব কারো কোন কথা কানে নেন না কিন্তু এই কথাটি মেনে চলেন। সিগারেট খান না কিন্তু মুখে দিয়ে বসে থাকেন।

মিলি দেখল তার বাবা আগুন না ধরিয়ে সিগারেট টানছেন এবং নাকে ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গি করছেন। মিলি কিছু বলতে গিয়েও বলল না। তার খানিকটা ভয় ভয় করতে লাগল। ফয়সল সাহেব বললেন দেখা তো হয়েছে এখন চলে যা। নাকি আরো কিছু বলবি? মিলি ইতস্তত: করে বলল মেয়ের একটা নাম দেন না বাবা। তিন অক্ষরের। ম দিয়ে শুরু হবে।

: তোর মেয়ের কি স্বাস্থ্য ভাল?

: জ্বি।

: তাহলে নাম রাখ মুটকি। তিন অক্ষর ম দিয়ে শুরু। যা যা চেয়েছিলি সবই আছে।

ফয়সল সাহেব দুলে দুলে হাসতে লাগলেন। চোখে পানি এসে গেল মিলির। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। এ বাড়িতে এসে তার নিজের ঘর না দেখে সে যেতে পারে না। দোতলায় তার ঘরটি তালা দেয়া। তালাচাবি তার কাছেই আছে। সে যখনি আসে তার ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তার খুব কান্না পায়। আজও সে তার ঘরে ঢুকল। সবকিছু আগের মত আছে। একটি জিনিসও উলট পালট হয় নি। মিলি ছোট্ট খাটটাতে শুয়ে পড়ল। সে যেদিন তার ঘুমের ওষুধ খাবে-এই খাটে শুয়েই খাবে। মিলি বালিশ জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর হাত মুখ ধুয়ে নিচে নেমে এল।

বাবা এখনো বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর সামনে বসে আছে বীথি নামের ঐ কম বয়েসী মেয়েটি বাবার সেক্রেটারী। তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়।

ডিকটেশন নেয়। মিলি লক্ষ্য করল মেয়েটি বসে আছে খালি পায়ে। তার মানে কি এই যে সে এখন এ বাড়িতে থাকে? কেন থাকে?

: বাবা যাই?

ফয়সল সাহেব জবাব দিলেন না। মাথা নাড়লেন। বীথি বলল-তুমি কখন এসেছ আমি জানি না তো? চা-টা খেয়েছ?

মেয়েটি এভাবে কথা বলছে যেন সে এ বাড়ির একজন অতিথি আপ্যায়ন করছে। সবচে মজার ব্যাপার হচ্ছে তাকে তুমি তুমি করে বলছে। তাকে সে তুমি করে কেন বলবে? মিলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনি ভাল আছেন?

: হ্যাঁ আমি ভাল। স্যারের শরীর ভাল না। দেখা-শোনারও লোকজন নেই। আমি তাই কিছুদিন ধরে এ বাড়িতেই থাকি। তুমি জান বোধ হয়।

: না আমি জানতাম না। এখন জানলাম। আচ্ছা যাই।

ফয়সল সাহেব মাথা এলিয়ে চোখ বন্ধ করেছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়। এই বয়সে লোকজন আচমকা ঘুমিয়ে পড়ে। বীথি বলল, তুমি আসবে ঘন ঘন। খোঁজ-খবর নেবে।

মিলি বলল, আপনি আমাকে তুমি তুমি বলছেন কেন?

ফয়সল সাহেব চোখ মেললেন। মিলি ভাবল বাবার কাছ থেকে সে প্রচণ্ড একটা ধমক খাবে। কিন্তু ফয়সল সাহেব কিছু বললেন না। আবার চোখ বন্ধ করে ফেললেন। খুব দ্রুত তাঁর পা দুলতে লাগল।

৫

শেষ রাতের দিকে ওসমান সাহেব একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন, যেন ক্লাস নিতে গিয়েছেন। তিনি পড়াবেন আর্যদের আগমনের ইতিহাস। কিন্তু ক্লাসে ঢুকেই টের পেলেন তাঁকে পড়াতে হবে জ্যামিতি। দু'টি ত্রিভুজকে সর্বসম প্রমাণ করতে হবে। ত্রিভুজ দু'টির দুই বাহু ও অন্তঃস্থ কোণ সমান ম্যাট্রিকে পড়ে এসেছেন তবু বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো মাত্র সব গুলিয়ে গেল। তিনি হকচকিয়ে তাকালেন ছাত্রদের দিকে। সবাই হাসছে। মেয়েগুলি হেসে একজন অন্যজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। এতো হাসির কী আছে? তিনি বিড় বিড় করে বললেন, -এই হাসছ কেন? তারা আরো জোরে হেসে উঠল। তিনি কপালের ঘাম মুছবার জন্য পকেটে হাত দিতে গিয়ে টের পেলেন তার গায়ে কোন কাপড় নেই। কী ভয়াবহ ব্যাপার। ওসমান সাহেব গোঙানির মত শব্দ করতে করতে জেগে উঠলেন। তাঁর সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। তিনি ক্ষীণ স্বরে ডাকলেন রানু রানু। তিনি জানেন রানু এখানে নেই। তবুও প্রতিদিনই আধো-ঘুম আধো-জাগরণে মনে হয় সে পাশেই আছে, ডাকলেই সাড়া দেবে।

তিনি ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। হাতের কাছে কাচের জগ কিন্তু পানি নেই। তিনি উঠে গিয়ে বাতি জ্বালালেন। গায়ে মুখে পানি ঢাললেন। রাত শেষ হয়ে এসেছে-চারটা দশ বাজে। আবার ঘুমুতে যাবার কোন মানে হয় না। চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। বানাবে কে? বিয়ের পর পর ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা বানিয়ে রাখতো রানু। কোন ভাবে যদি লেখক স্বামীকে সাহায্য করা যায়।

www.BDeBooks.Com

ডিকশনারী দেখে বানান ঠিক করা। লেখা কপি করে দেয়া। কত উৎসাহ। জীবনটাই অন্য রকম ছিল।

বিয়ের পরপর একবার এ রকম ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। ভয়ে অস্থির হয়ে ডাকলেন–রানু রানু। রানু হকচকিয়ে গেল। ভয় পাওয়া গলায় বলল,–কী হয়েছে?

: ভয় পেয়েছি। দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম একটা পাগল আমাকে তাড়া করেছে।

বলতে বলতে তিনি শিউরে উঠলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। রানু অবাক হয়ে বলল–এত ভয় পাওয়ার মত কি দেখলে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন তো আমি রোজই দেখি। ওসমান সাহেব নিচু গলায় বললেন–না এ রকম তুমি দেখ না। এটা একটা ভয়াবহ স্বপ্ন। তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। সম্পূর্ণ অন্য রকম ব্যাপার।

রানু তার হাত ধরে অনেকক্ষণ পাশে বসে রইল। তারপর চা বানিয়ে আনল।

ওসমান সাহেব শিশুর মত তাকে জড়িয়ে ধরে বাকি রাতটা জেগে কাটালেন। রানু নিজেও ঘুমাল না। একজন বয়স্ক মানুষ সামান্য একটা স্বপ্ন দেখে এতটা ভয় পেতে পারে তা তার ধারণার বাইরে ছিল। সে নিচু স্বরে বলল–তুমি কি প্রায়ই এ রকম দুঃস্বপ্ন দেখ?

: প্রায়ই না মাঝে মাঝে দেখি।

: সব সময় এ রকম ভয় পাও?

: হ্যাঁ।

বেশ কিছু সময় চুপচাপ থেকে রানু বলল, তোমার এক গল্পের নায়ক এ রকম দুঃস্বপ্ন দেখতো। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। রানু বলল–বেচারা অবশ্যি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়।

তিনি রাগি গলায় বললেন–ওর পাগল হওয়ার অন্য কারণ ছিল।

: রাগ করছ কেন?

: রাগ করছি না। লেখার সঙ্গে সবাই লেখককে মিশিয়ে ফেলে। এটা ঠিক না। লেখা এবং লেখক এক নয়।

: আহ আমি ঠাট্টা করছিলাম।

ওসমান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, –এই ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

: তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? রাগ করার মত কিছু তো আমি বলিনি। দাও মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি–নাকি অন্য কিছু চাই?

ওসমান সাহেব জবাব দেননি। পাশ ফেরে ঘুমুতে চেষ্টা করেছেন। ঘুম আসেনি। দুঃস্বপ্ন দেখার পর সাধারণত তাঁর ঘুম হয় না। আজও হবে না। অবশ্যি আর রাতও খুব বাকি নেই। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। কাক ডাকতে শুরু করবে। লেখক হয়েও অলেখক সুলভ চিন্তা করলেন। কাক ডাকত শুরু করবে না বলে বলা উচিত ছিল পাখি ডাকতে শুরু করবে।

তিনি চটি পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পাগল গল্পের নায়কের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সেও দুঃস্বপ্ন দেখার পর বাকি রাতটা ঘুমুতে

পারত না। বারান্দায় এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করত। সূর্য ওঠার পর ঘুমুতে যেত। একজন নিঃসঙ্গ মানুষের গল্প। শেষ পর্যায়ে যে স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলে। চমৎকার একটি গল্প। শুধু চমৎকার নয় একটি অসাধারণ গল্প। আশ্চর্যের ব্যাপার, সমালোচকরা এই গল্পটিকে গুরুত্ব দেন নি। কেন দেন নি? ওসমান সাহেব ঠিক করে ফেললেন আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো এই গল্পটি পড়বেন। স্বপ্ন দৃশ্যে বর্ণনাগুলি ভাল করে দেখা দরকার। এই গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহ তৈরির জন্যে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে কী গল্পের গাঁথুনি আলগা হয়ে গেছে?

সাদামাটা একটা সূর্য উঠল। ভোর হওয়া নিয়ে কবি সাহিত্যিকরা এত হৈ চৈ করে কী জন্যে কে জানে? সূর্য ওঠার মধ্যে রহস্যময় কিছু নেই। জোছনায় কিছু রহস্য আছে। কাজেই চাঁদ নিয়ে কিছুটা মাতামাতি করা যেতে পারে। সূর্য নিয়ে নয়।

আকবরের মা উঠে পড়েছে। গ্যাসের চুলায় আগুন জ্বলছে চায়ের কেতলি বসানো হয়েছে। ভোর বেলার এই আয়োজনটি চমৎকার। দেখলেই মন ভাল হয়ে উঠতে শুরু করে।

: আজ আমি লেখা নিয়ে বসব।

: জ্বি আইচ্ছা।

: যেই আসুক বলবে আমি বাসায় নেই। কখন ফিরব তার ঠিক নেই। টেলিফোনেও একই কথা বলবে।

: জ্বি আইচ্ছা। ফেলাস্কে চা বানাইয়া দিমু?

: না, চা–টা লাগবে না।

অনেক দিন পর লেখার টেবিলের কাছে এসেছেন। সাদা খাতা খোলা। দেখলেই কিছু একটা লিখতে ইচ্ছা করে। 'অরণ্য এগিয়ে আসছে' এই গল্পটি লিখে ফেললে কেমন হয়?

'অরণ্য এগিয়ে আসছে। ছোট শহরের সবাই বুঝতে পারছে–পালানোর পথ নেই।' প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটিই থাকবে। কিন্তু লেখাটা আসছে না।

টেবিলে এক পাশে মিমির প্যাকেট। লাল লাল পিঁপড়া প্যাকেটটি ছেঁকে ধরেছে। টগরকে দেয়া হয়নি। কেন দেয়া হয়নি? হাতেই তো ছিল। তবু শেষ মুহূর্তে দেয়া হল না কেন? তিনি কি টগরকে ভালবাসেন না? কিন্তু তা কি করে হয়!

ওসমান সাহেব মিমির প্যাকেটটি তাঁর লেখার কাগজের উপর এনে রাখলেন। পিঁপড়াদের মধ্যে একটি সাড়া পড়ে গেল। হঠাৎ বস্তুর অবস্থাগত পরিবর্তন কেন হল তারা বুঝতে পারছে না। ছুটাছুটি করছে পাগলের মত। ওসমান সাহেব মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

রানুর ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

অভ্যাস মত টগরের গায়ে হাত রাখল। গা গরম। টেম্পারেচার কত হবে? রাত দু'টোর দিকে একবার টেম্পারেচার নেয়া হয়েছিল, নিরানব্বই। এখন বোধ হয় তার চেয়েও বেশী। রানু টগরকে নিজের কাছে নিয়ে এলো। গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে উত্তাপ যদি কিছু কমিয়ে দেয়া যায়। এত ভুগে কেন সে? দু'দিন পর পর

অসুখ। হাম থেকে উঠবার পরই এক নাগাড়ে সাতদিন সর্দিজ্বর। সেই জ্বর সারল, সঙ্গে সঙ্গে হল আমাশা। একটা কিছু লেগেই আছে। শরীর শুকিয়ে কাঠির মত হয়েছে–শুধু মুখটা শুকায়নি। বড়সড় একটি মুখে দু'টি বিশাল চোখ। ওর বাবার চোখ পেয়েছে। শুধু চোখ নয় বাবার স্বভাব–চরিত্রও বোধ হয় কিছু পেয়েছে। কোন ব্যাপারেই কোন অভিযোগ নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা এক জায়গায় বসে থাকতে পারে।

টগর ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠল। রানু ডাকল–এই টগর!

সে তার ছোট হাত দু'টি দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। কেমন তাকাচ্ছে পিট পিট করে।

: টগর, এই পাজী।

: কী।

: শরীর খারাপ লাগছে?

: টগর মাথা নাড়ল। তার খারাপ লাগছে। কিন্তু মুখ হাসি হাসি। বলল–দুধ খাবি?

: বোতলে করে খাবো।

: এত বড় ছেলে বোতলে করে খাবি কি? মালটোভা দিয়ে বানিয়ে দেব। এক চুমুকে খেয়ে ফেলবি, ঠিক আছে?

: টগর ঘাড় কাত করল, সে গ্লাসে করে দুধ খেতে রাজি আছে।

: বেশী করে চিনি দিও।

: দেব।

দুধ বানিয়ে এনে রানু দেখল–টগর বালিশটা দু'পায়ের ফাঁকে নিয়ে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, জ্বর কি কমে আসছে? রানু অনেকক্ষণ ছেলের পাশে বসে রইল।

রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। অপলা জেগেছে নিশ্চয়ই। সেও খুব ভোরে ওঠে। হাত–মুখ ধুয়ে পড়তে বসে। মেডিকেলে টেস্ট দেবে। এ্যালাউ হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। রোজ ঘুমুতে যায় দেড়টা দু'টোর দিকে। রানু রান্নাঘরে এসে দেখল অপলা চায়ের কেতলি বসিয়েছে। সে হাসি মুখে বলল–তুমি আজ এত ভোরে উঠলে যে? ব্যাপার কী?

: ব্যাপার কিছু না।

: টগরের জ্বর আছে এখনো?

: কম, গা ঘামছে।

: রাতে বেশ কয়েকবার কাঁদল। তখনি বুঝেছি শরীর খারাপ। ওকে আজ একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।

: রাতে কেঁদেছে নাকি?

: হ্যাঁ, তুমি টের পাওনি?

: না।

রানুর কিছুটা মন খারাপ হল। টগর, কেঁদেছে সে টেরও পায়নি। ও অবশ্যি কেঁদে–কেটে পাড়া মাথায় করবে না। নিজে নিজেই শান্ত হয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করবে।

: আপা চা খাবে?

: খালি পেটে চা খাই না।

: খালিপেট হবে কেন। নোনতা বিস্কুট আছে, দেব?

: দে।

অপলা চা ঢালতে ঢালতে বলল–আপা, তুমি এত চিন্তিত কেন? রাতে ভাল ঘুম হয় নি?

: হয়েছে।

: তাহলে? মুখ এমন শুকনো কেন?

: টগরের আবার জ্বর আসল–এই জন্যেই খারাপ লাগছে।

: আপা তুমি একটা কাজ কর–দুলাভাইকে খবর দাও। সে কয়েকদিন ঘন ঘন আসুক। ছেলেকে নিয়ে ছুটাছুটি করুক, দেখবে জ্বর কমে যাবে।

রানু গম্ভীর হয়ে গেল। অপলা বলল– কথা বলছ না কেন আপা? চুপ করে আছ কেন?

: তুই সব সময় দুলাভাই দুলাভাই বলিস। সব জেনে–শুনেও কেন বলিস?

: তাহলে কী বলব? টগরের বাবা? না ওসমান সাহেব?

রানু কিছু বলল না। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। অপলা বলল–ঠিক আছে আর বলব না। কিন্তু তুমি তাকে আসতে বল। এক মাস ধরে আসছেন না।

: আসতে না চাইলে আসবে না। ধরে নিয়ে আসতে হবে?

: ঠিক তা–ও না আপা। তুমিই আসতে নিষেধ করেছ।

: নিষেধ করি নি, বলেছি, এত ঘন ঘন যেন না আসে। আমি জীবনটাকে বদলাতে চেষ্টা করছি। তুই কেন বুঝতে চেষ্টা করছিস না?

: তোমার ধারণা উনি ঘন ঘন এলে জীবন বদলানো যাবে না?

: এই নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

রানু উঠে পড়ল। টগরের ঘুম ভেঙেছে। সে গম্ভীর মুখে রওনা হয়েছে বাথরুমের দিকে। বয়সের তুলনায় সে কি একটু বেশী গম্ভীর? রানু ডাকল দেখি টগর এদিকে আয় তো। জ্বর আছে কি না দেখি। টগর গুটি গুটি এগিয়ে এল।

: এইত জ্বর নেই। গুড বয়। যাও দাঁত মেজে আস। নিজে নিজে মাজতে পারবে না?

: পারব।

: ভেরী গুড।

রানু শুনল–টগর, অপলার সঙ্গে কথা বলছে। [illegible] আর বেশ ভাব। কথাবার্তা হচ্ছে বন্ধুর মত।

: কেমন আছিস রে টগর?

: ভাল।

: তোর মা'র মত মুখটা এমন [illegible] আছিস কেন? কেমন [illegible] হয় মনে আছে?

: আছে।

: [illegible] হাসি দেখ তো দেখি [illegible] চমৎকার। দেখি [illegible] দাঁতগুলো কী অবস্থা [illegible] আর।

www.BDeBooks.Com

: না।

: না কেন?

: তুমি ফেলে দেবে।

: ফেলব না, হাত দিয়ে দেখব নড়ছে কি না। আয় কাছে আয়।

রানু টগরের, ছোট্ট একটি চীৎকার শুনল। তারপর আবার চুপ। অপলা বলছে–এইত ফেলে দিলাম, ব্যথা পেয়েছিস?

: না।

তাহলে কাঁদছিস কেন? ব্যাটাছেলেদের এত কাঁদতে নেই, কাঁদবে মেয়েরা। তুই কি মেয়ে?

: না।

: যা, হাত–মুখ ধুয়ে আয়।

বাথরুমের কল দিয়ে পানি পড়ছে। টগর হাত–মুখ ধুচ্ছে নিশ্চয়ই। রানু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল দাঁত পড়ার মত একটা বড় ঘটনা সে তার মাকে বলতে এল না। যেন এটা বলার মত কিছু নয়। নাশতার টেবিলে খুব সহজভাবেই রানু জিজ্ঞেস করে–তোমার দাঁত পড়ে গেছে নাকি?

: হাঁ।

: কই আমাকে তো কিছু বল নি। দেখি এখন তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে। বাহ সুন্দর লাগছে তো।

টগর ছোট্ট করে হাসল। রানু বলল–আজ আমি বাইরে যাব। তুমি অপলার সঙ্গে থাকতে পারবে না?

: পারবো।

: বিকেলে তোমার বাবা আসবেন তোমাকে দেখতে।

: আজ কী বুধবার?

রানুর বুকে ছোট একটা ধাক্কা লাগল। টগর কী মনে মনে তার বাবার জন্যে অপেক্ষা করে? নয় তো বুধবার তার মনে থাকার কথা নয়।

: হাঁ, আজ বুধবার। নাও এই রুটিটা খাও।

: আদ্দেকটা খাই?

: ঠিক আছে খাও।

: বাবা যখন আসবে তুমি তখন থাকবে না?

: থাকব। আমি পাঁচটার মধ্যে আসব।

রানু খানিকক্ষণ চুপ চরে থেকে বলল–তুমি কী তোমার বাবার সঙ্গে ঐ বাড়িতে দু'একদিন থাকতে চাও?

টগর ঘাড় কাত করল। সে থাকতে চায়।

: আমার জন্যে তোমার খারাপ লাগবে না?

টগর কিছু বলল না।

: রাতে ঘুম ভাঙলেই কাঁদবে–আম্মা কোথায়? আম্মা কোথায়? কাঁদবে না?

: হাঁ কাঁদব।

: তাহলে যাবে কেন?

টগর জবাব দিল না। মায়ের দিকে সরাসরি তাকালও না।

রানু অনেকক্ষণ বসে থাকার পর তার ডাক পড়ল। সিদ্দিক সাহেব নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেলেন। সহজ স্বরে বললেন–একটা বোর্ড মিটিং ছিল। তাই দেরী হল কিছু মনে করবেন না। আপনাকে চা–টা দিয়েছে তো?

: হাঁ দিয়েছে।

: বসুন এখানে। আরাম করে বসুন।

এই ঘরটি এয়ারকন্ডিশণ্ড। হুম হুম একটা শব্দ হচ্ছে যন্ত্রটা হয়তো ভাল না। কিন্তু ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো। অফিস মনে হয়না। মনে হয় অফিস নয় কারো ড্রয়িং রুম।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। কিন্তু কোন কাগজ বা ফাইলপত্র নেই। টেবিলের মাঝখানে ধবধবে সাদা একটা ফুলদানি ভর্তি ফুল। ঘরের এক কোণায় ছোট একটা আলনা, সেখানে টাওয়েল ঝুলছে। অফিস ঘরে আলনা কেন কে জানে।

: আপনি কেমন আছেন বলুন।

: আমি ভালই আছি।

: চা কফি কোনটাই খাব না।

সিদ্দিক সাহেব সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলেন। এখানে সম্ভবত কিছু হবে না। রানুর ধারণা ছিল হবে। গত সপ্তাহের কথাবার্তা এরকমই ছিল। সিদ্দিক সাহেব হাসি মুখে বলেছিলেন–পোষ্ট না থাকলেও অনেক সময় পোষ্ট তৈরি করা হয়। আপনি আগে মন ঠিক করুন। রানু বলেছিল–আমার মন ঠিক করাই আছে।

: বেশ তাহলে আগামী সপ্তাহে আসুন। দশটার আগে আসতে পারবেন?

: পারব।

সেদিন সিদ্দিক সাহেবের যে হাসি–খুশি ভাব ছিল আজ তা নেই। গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছেন। যেন কোন একটি অস্বস্তিকর কথা বলতে দ্বিধা করছেন।

সিদ্দিক সাহেব একটি মুখবন্ধ খাম এগিয়ে দিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন–এখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে। শর্তগুলি আপনার যদি পছন্দ হয়, তাহলে আপনি আগামী মাসের এক তারিখ থেকে জয়েন করতে পারেন।

: কী পোষ্ট, কী কাজ কিছুই তো বললেন না।

: এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে সব বলা আছে। তিন মাস আপনি থাকবেন ট্রেইনী হিসাবে। বিভিন্ন সেকশনে যাবেন এবং কাজ শিখবেন। তিন মাস পর আমরা যদি মনে করি আপনার ট্রেনিং ভাল হয়নি তাহলে সেটি এক্সটেন্ট করে ছ'মাস করা হবে। ট্রেনিং পিরিয়ডে আপনার ভাতা হবে মূল বেতনের অর্ধেক। অন্য কোন ফেসিলিটিও থাকবে না।

খামটা এখানে খোলা উচিত হবে কী না রানু বুঝতে পারছে না। সিদ্দিক সাহেব বললেন আপনি কি কিছু বলবেন?

: জ্বি না। থ্যাংক উই।

: এখন নিশ্চয়ই বাড়ি যাবেন?

: জ্বি।

: একটু বসুন।

রানু বসে রইল। সিদ্দিক সাহেব বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে বললেন– ড্রাইভার সাহেবকে বল ইনাকে বাসায় পৌঁছে দিতে।

জুনিয়র অফিসার্স গ্রেড। বেতন সব মিলিয়ে দু'হাজার টাকার মত। এই চাকরি নেয়াটা কী ঠিক হবে? ড্রাইভার বলল,

: আপা কোন দিকে যাব?

: আমি যাব নিউ পল্টন। নিউমার্কেটে নামিয়ে দিলেই হবে। কিছু কেনাকাটা করব।

রানু কথাটা বলেই একটু অস্বস্তি বোধ করল। নিউমার্কেটে কেনাকাটা করব এটা বলার দরকার ছিল না। সাফাই গাইবার কোন ব্যাপার নয়।

ওসমান সাহেব রানুর বসার ঘরে একা একা বসেছিলেন। রানুকে ঢুকতে দেখে তিনি তাকালেন। রানুর হাতে এক গাদা জিনিসপত্র। দু'হাতে সেগুলি ঠিক সামলানোও যাচ্ছিল না। ওসমান সাহেব সহজ স্বরে বললেন, অনেক কিছু কিনলে দেখি। রানু কিছু বলল না। জিনিসপত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

অপলা টগরের পাশে শুকনো মুখে বসে আছে। সে রানুকে দেখেই বলল–ওর তো বেশ জ্বর আপা। একশ দুইয়ের উপরে। তিন-চারবার বমি করেছে। রানু বলল–ও কখন এসেছে?

: বেশীক্ষন হয় নি। দশ-পনেরো মিনিট। আমি বলেছিলাম ভেতরে এসে বসতে। উনি আসেন নি।

রানু টগরের কপালে হাত দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে জ্বর দেখল। শুকনো মুখে বলল– থার্মোমিটারটা আবার দে তো দেখি।

অপলা বলল, চল ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। দুলাভাই আছেন তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

: তাকে সঙ্গে করে নিতে হবে কেন?

অপলা চুপ করে গেল। থার্মোমিটার দেখল–রানু বলল–কত?

: একশ এক। একটু কমেছে। জ্বর ছেড়ে যাবে বোধ হয়। ঘাম হচ্ছে।

রানু কিছু বলল না। অপলা বলল–তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে বস। অনেকক্ষণ উনি একা একা বসে আছেন।

রানু মনে হল শুনতেই পেল না।

অপলা বলল–তুমি চা খাবে, চা দেব? পানি গরম আছে।

: না, চা-টা কিছু খাব না।

: রানু বসার ঘরে ঢুকলো। ওসমান সাহেব বললেন, জ্বর কী খুব বেশী? বেশী হলে একজন ডাক্তার নিয়ে আসি। কাছেই আমার একজন চেনা ডাক্তার আছেন।

: ডাক্তার আনতে হবে না। আমি নিয়ে যাব।

: জ্বর কবে থেকে?

: দু'-তিন দিন থেকে।

: আমাকে তো খবর দাও নি।

: খবর দেওয়ার মত কিছু হয়নি। তাছাড়া আমার খবর দেবার লোক নেই তুমি ভাল করেই জান।

: তোমার খালার বাসায় টেলিফোন নাই?

: আছে। তাঁদের টেলিফোন আমি আমার নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করব কেন?

ওসমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললো–তোমার খালার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভাল না নাকি?

: সম্পর্ক খারাপ হবে কেন?

অপলা চা নিয়ে ঢুকল, লজ্জিত মুখে বললেন, চা ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু চা দিলাম।

: আর কিছু লাগবে না।

রানু বলল–অপলা তুই ঘরে যা আমি একটু কথা বলছি। অপলা বিব্রত ভঙ্গিতে ঘরে গেল। ওসমান সাহেব তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রানু বলল আমি একটি চাকরি পেয়েছি। কাজেই তুমি মাসে মাসে যে টাকাটা আমাকে দিতে সেটা আর দিতে হবে না।

: চাকরিটা কি?

: সেটা দিয়ে তোমার তো কোন দরকার নেই। তোমার স্ত্রী হিসাবে আমি যদি নিচু ধরনের কাজ করতাম তাহলে হয়ত তোমার অহংকারে লাগত। এখন তো অহংকারে লাগার কোন প্রশ্ন নেই।

: তুমি ভুল করছ রানু আমি অহংকারী না।

: বাজে কথা বলবে না।

তিনি চুপ করে গেলেন। রানু থমথমে গলায় বললো, কেন তুমি আমাকে তোমার বাবার কাছে এ রকম একটা কায়দা করে পাঠালে?

: কী কায়দা?

: মিলি এসে বললে উনি খুব অসুস্থ। মৃত্যুশয্যায়। আমাকে এবং টগরকে দেখতে চান। আমি ঠিক সেই দিনই গেলাম দেখা করতে। গিয়ে দেখি দিব্যি সুস্থ মানুষ। বাগানে ফুলগাছ লাগাচ্ছেন। আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন আমাকে চেনেন না–এই প্রথম দেখলেন। টগর ফুল গাছে হাত দিয়েছিল বলে ধমক দিলেন। বিশ্রী গলায় ধমক।

: উনি বুড়ো মানুষ। তুমি নিজেও জান তার মাথা পুরোপুরি ঠিক না। তাছাড়া যা ঘটেছে আমাকে বাদ দিয়েই ঘটেছে। মিলি প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। তুমি তো মিলির স্বভাবও জান। জান না?

: না আমি তোমাদের কারোর স্বভাবই জানি না। তোমার নিজের স্বভাব বুঝতে আমার ছ'বছর লেগেছে।

: বুঝতে পারলে কিছু?

: হ্যাঁ, তোমারটা বুঝেছি।

: ভাল। বুঝতে পারাই উচিত। তুমি বুদ্ধিমান মেয়ে।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন–আজ যাই। রানু তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলল খুব তাড়া মনে হয়, কোথায় যাচ্ছ, মনিকার কাছে?

: হ্যাঁ, ওর কাছে যাব একবার।

: সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হবে? আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কী? সতীনাথ ভাদুড়ি না মানিক বাবু?

www.BDeBooks.Com

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আজ তুমি নানা কারণে উত্তেজিত। কাজেই বেশীক্ষণ থাকতে চাই না।

: মনিকা কখনো উত্তেজিত হয় না, তাই না?

: হবে না কেন, সেও হয়। আমরা সবাই নানা কারণে উত্তেজিত হই।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন রানু তার সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এসেছে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, টগরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। রানু তার জবাব দিল না।

টগরের ঘুম ভাঙল ছ'টার দিকে। ভাল মানুষের মত কাপে করে মালটোভা খেল। তার কিছুক্ষণ পরই ঘর ভাসিয়ে বমি করল। অপলা বলল,–খারাপ লাগছে নাকি টগর?

: না।

: চল আমরা ডাক্তারের কাছে যাব। আয় শার্টটা বদলে দেই। তার আগে চল মুখ ধুইয়ে দি।

টগর বাধ্য ছেলের মত অপলার সঙ্গে সঙ্গে গেল। বাথরুমে ঢুকেই গলার স্বর নিচু করে বলল,আজ কী বুধবার খালামণি?

: হ্যাঁ। কেন?

টগর আর কোন কথা না বলে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে আয়নায় তার দাঁত দেখতে লাগল। উপরের পাটির একটি দাঁত নেই। কেমন অচেনা দেখাচ্ছে তাকে। অপলা বলল, দাঁত তোলার সময় ব্যথা লেগেছিল? টগর তার জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল–আজ কি বার খালামণি? বুধবার?

মনিকার ওখানে যাবার কোন ইচ্ছা ওসমান সাহেবের ছিল না। তবু ওদিকেই রওনা হলেন। ঘরে ফিরে কিছু করবার নেই। ফিরতেও ইচ্ছা করছে না।

মনিকাদের বাড়ির সামনে নবীর লাল গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যেন পড়েছিলেন অন্ধকারে বস্তুর কোন রং থাকে না। সব হয়ে যায় ধূসর বর্ণ। কিন্তু তিনি অন্ধকারেও গাড়ির লাল রং দেখতে পেলেন। কিংবা হয়ত এই গাঢ় লাল রং তাঁর স্মৃতিতে ছিল। এখন যা দেখছেন তার কিছুটা আসছে স্মৃতি থেকে, কিছুটা সত্যি সত্যি দেখছেন।

গাড়ি গেটের বাইরে কেন? ওসমান সাহেব একধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। চিত্রটি ঠিক মিলছে না। নবী তার গাড়ি গেটের বাইরে রেখে মনিকার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না। এই জিনিস ওর চরিত্রে নেই। বুড়ো দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে সালাম করল। ওসমান সাহেব বললেন, রহমত ভাল আছ? রহমতের মাথা অনেকখানি নিচু হয়ে গেল।

: মেম সাহেব আছেন?

: জ্বি আছেন।

: তোমার শরীর এখন সেরেছে তো?

: জ্বি স্যার।

: ব্যথা হয় না আর?

: আগের মত হয় না।

রহমত তাঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত এল। এই লোকটিও তাঁকে

খুবই পছন্দ করে। কেন করে কে জানে। ওসমান সাহেব এসব ছোট-খাট ব্যাপার লক্ষ্য করেন। আজও লক্ষ্য করলেন রহমত এগিয়ে গিয়ে অসহিষ্ণুভাবে পর পর তিন বার কলিং বেল টিপল। তিনি ভালই জানেন ফেরার সময়ও সে হেঁটে হেঁটে তাঁর সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত যাবে। কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলবে না।

মানুষের ভালবাসা কখনো নিঃস্বার্থ নয়। রহমতের ভালবাসা কী নিঃস্বার্থ? তিনি কখনো এ ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে ভাবেন নি। ভাবতে হবে।

মনিকা দরজা খুলে ছোট করে হাসল। যেন সে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মনিকার গায়ে হালকা নীল রংয়ের সুতির শাড়ি। গলায় লাল একটা মাফলার। আবার ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়। মনিকার ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগে।

: ভাল আছ মনিকা?

: ভালই ছিলাম। ঘন্টাখানেক আগে থেকে আর ভাল নেই। নবী এসেছে বড্ড পাগলামি করছে।

তিনি কিছুই বললেন না। মনিকা বলল–আজ আমি ওকে স্ট্রেইট বলেছি আমার বাড়িতে আর আসবে না।

: সে তো আগে ও বলেছ।

: আজ যেভাবে বলেছি সেভাবে আগে কখনো বলি নি। আজ সত্যি সত্যি বিরক্ত হয়েছি।

ওসমান সাহেব বসার ঘরে কাউকে দেখলেন না। একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করবেন নবী কোথায়? তাও করলেন না। মনিকা গম্ভীর গলায় বলল–তুমি খানিকক্ষণ একা একা বস। আমি চুল বেঁধে আসি।

তিনি প্রায় দু'মাস পর এলেন। মনিকা একবারও জিজ্ঞেস করল না, এতদিন আসা হয়নি কেন? মনিকার কিছু বিচিত্র ব্যাপার আছে।

এই বসার ঘরটিতে ওসমান সাহেব ঠিক সহজ বোধ করেন না। সবকিছু বড় বেশী গোছানো। কার্পেটের রং টকটকে লাল। এই রং রক্তের কথা মনে করিয়ে দেয়। রক্তের উপর পা রাখতে তাঁর ভাল লাগে না।

ওসমান সাহেব সিগারেট ধরাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজের মেয়েটি টে তে করে এক গ্লাস পানি রেখে গেল। রূপোর গ্লাস। খুবই ঠাণ্ডা পানি। গ্লাসের চারদিকে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে যা দেখা মাত্র তৃষ্ণা পায়। ওসমান সাহেব তৃষ্ণার্তের মত পানি খেলেন। কাজের মেয়েটি বলল, আর এক গ্লাস পানি আনি?

: না, আর লাগবে না।

: চা আনব?

: না, চা আনতে হবে না।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন মেয়েটি হাসি চাপতে চেষ্টা করছে। তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটির মুখে হাসি দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। শঙ্কার ছাপ পড়ল। সে গ্লাস নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল।

প্রথম যেদিন এ বাড়িতে এসেছিলেন সেদিন ওসমান সাহেব সোফায় বসে পানি খেতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বারেও তাই। এরপর থেকে আর চাইতে হয় না। পানি আসে। তিনি ঘড়ি দেখলেন সাড়ে ন'টা। আর মনে হচ্ছিল রাত অনেক। এটা একটা অদ্ভুত

ব্যাপার। কোন কোন বাড়িতে পা দেয়া মাত্র মনে হয় ঘড়ির কাঁটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

মনিকা আসতে খুব দেরী করছে। তিনি বসে আছেন একা একা। এটি নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয়। মনিকার ব্যবহারে কোথায় যেন একটি অবহেলার ভাব আছে। প্রথম যখন এ বাড়িতে এলেন সেদিনই ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল। যদিও সেদিন মনিকা এগিয়ে এসে সবাইকে হতচকিত করে পা ছুঁয়ে সালাম করল। নবী ছিল সঙ্গে। সে অবাক হয়ে বলল, একি কাণ্ড, সে কী রবি ঠাকুর নাকি? আমি তো জানি একমাত্র রবি ঠাকুরকেই লোকজন পা ছুঁয়ে প্রণাম করতো। মনিকা বলেছিল,আমি স্কুলে পড়ার সময় ভেবে রেখেছিলাম যদি কোনদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আমি সালাম করব। ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। মনিকা সহজ স্বরে বলল, ক্লাস টেনে যখন পড়ি ঠিক করলাম যদি উনি অবিবাহিত হন তাহলে তাঁকে গিয়ে বলব-আমাকে বিয়ে করুন। নবী স্বর ফাটিয়ে হাসতে লাগল। ওসমান সাহেবের মনে হল হাসি স্বতস্ফূর্ত নয়। কষ্ট করে হাসা নবীকে তিনি কখনো এভাবে হাসতে দেখেননি।

সে রাতে মনিকার সঙ্গে গল্প উপন্যাস নিয়ে কোনই আলাপ হয়নি। মনিকার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তার সমস্ত উৎসাহ মিইয়ে গেছে। সে পাকা আমের আচার বানানোর কী একটি পদ্ধতি নিয়ে গল্প করতে শুরু করল। এবং এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হচ্ছে কিছু মনে করবেন না, আমি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। ওসমান সাহেব অপমানিত বোধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আবার একদিন এলেন নবীর সঙ্গে। সেদিনই মনিকার এ রকম আলগা আলগা ভাব। তার পরেও তিনি এলেন। কেন এলেন? কেন বারবার আসেন?

ওসমান সাহেব দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরাবারও অনেকক্ষণ পর মনিকা এল। অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম? কাজের মেয়েটি চুল টেনে দিচ্ছিল, আরাম লাগছিল খুব। তোমায় পানি দিয়ে গেছে?

: হ্যাঁ

: আরও লাগবে?

: না, লাগবে না। নবী কোথায়?

: গেস্ট রুমে ঘুমুচ্ছে। বমি-টমি করে বিশ্রী কাণ্ড। যে জিনিস সহ্য হয় না সে জিনিস কেন খায়?

মনিকা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল। ওসমান সাহেব বললেন, তোমার হ্যাসবেণ্ডের কোন খবর পেয়েছ?

: না।

: তিনি আছেন কেমন?

: আগের মতই আছে। লাংসটলারেন্স, ই সি জি সব কিছুই হয়েছে। শরীরে কোন অসুখ নেই। ডাক্তাররা বলছেন সাইকো সিমেটিক। মনের রোগ। কিন্তু সে সেটা বিশ্বাস করছে না। আরও বড় ডাক্তার দেখাতে চায়।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ মানসিক রোগীদের এই প্রবলেম। তারা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না রোগটা মনে, শরীরে নয়। তুমি চা খাবে?

: না।

: খাও এক কাপ। সিলোনিজ টি। খুব চমৎকার ফ্লেভার।

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। মনিকা কাজের মেয়েটিকে চায়ের কথা বলে তার সামনে এসে বসল। তার বসে থাকার ভঙ্গিতে কোন আড়ষ্টতা নেই। সে কোন কথা বলছে না। কথা না বলে কোন মেয়ে চুপচাপ বসে থাকলে সমস্ত পরিবেশ আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মনিকার বেলায় হয় না। কাজের মেয়েটি বলল-

: উনার ঘুম ভাঙছে। আপনারে ডাকে। মনিকা কঠিন স্বরে বলল, তাকে এ ঘরে আসতে বলল। বল তার বন্ধু এসেছে-ওসমান সাহেব।

নবী লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। গায়ের রং শ্যামল। মেয়েলী ধরনের মুখ। চেহারায় কাঠিন্য আনবার জন্যে সে নানান সময় নানান কায়দা-কানুন করেছে। একবার জুলফি রেখেছে, একবার গোঁফ রেখেছে। কিছুদিন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িও ছিল। লাভ হয়নি। কোন এক বিচিত্র কারণে তার চেহারা থেকে ছেলেমানুষি দূর হয়নি।

যৌবনে দুর্দান্ত কিছু কবিতা লিখেছিল। হঠাৎ এক রাতে ঠিক করল কবিতা মেয়েদের ভাষা, কবিতায় কাঠিন্য নেই। প্রতীক, উপমা এইসব ছেলেমানুষি ব্যাপার। কাজেই সে চলে এলো গদ্যে। লিখল 'দুপুর' নামের উপমা ও প্রতীক বিবর্জিত উপন্যাস। প্রচুর লেখালেখি হল দুপুর নিয়ে। সমালোচকদের কেউ কেউ উল্লসিত হলেন। কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কোন বিদেশী ঔপন্যাসিকের ছাপ পড়েছে সেটা বের করবার জন্যে। কবিখ্যাতি তেমন না জুটলেও কথা-শিল্পীর স্বীকৃতি পাওয়া গেল। পুরোপুরি সাহিত্যে নিবেদিত না হলে কিছু লেখা যাবে না এই ভেবে নবী চাকরি ছেড়ে দিল। পরবর্তী তিন বছর একটি লাইনও লিখল না। ইদানীং সে বলছে নাটক হচ্ছে সাহিত্যের সবচেয়ে পরিশীলিত রূপ। যেকোন এক শুভদিনে নাটক লেখা শুরু হবে এই ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে গত ছ'মাস ধরে। এখনও কিছু লেখা হয়নি। শুভ দিন এখনো আসেনি। নবী ঘরে ঢুকলো অপ্রসন্ন মুখে, মনিকার আজকের ব্যবহারে সে খুবই বিরক্ত হয়েছে। মনিকা বলেছিল- তুমি হুট করে ভিতরের ঘরে ঢুকবে না। এটা ভাল দেখায়না। এ কেমন কথা মনিকা তার ফুফাতো বোন এ-বাড়িতে সে আসছে ছেলেবেলা থেকে। মনিকার স্বামী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। নবী অবাক হয়ে বলল, তুমি চাও না আমি এ বাড়িতে আসি?

: আসতে ইচ্ছা হলে আসবে। তবে হুট করে শোবার ঘরে ঢুকবে না। এবং মাতাল অবস্থায় আসবে না।

নবী অবাক হয়ে বলল, -মাতাল বলছ কাকে? মাতাল কাকে বলে জান?

মনিকা ঠাণ্ডা গলায় বলল, মাতালের ডেফিনেশন নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তবে মাতাল আমার চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। তোমার চাউনি দেখেই বুঝতে পারছি তুমি এক্ষুণি বমি করবে।

: বমি করব?

: হ্যাঁ।

: তোমার ধারণা বমি করব?

: একমাত্র মাতালরাই প্রতিটি কথা দু'বার করে বলে। তুমি দয়া করে বাথরুমে যাও।

www.BDeBooks.Com

: আমি আরো দশ পেগ খেতে পারি, তা জান?

: খেতে পারলে তো ভালই।

মনিকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে উঠল। এবং আশ্চর্য, নবীকে কিছুক্ষনের মধ্যে সত্যি সত্যি বাথরুমে ছুটে যেতে হল। মনিকা মাতাল চেনে।

ওসমান সাহেব নবীর দিকে তাকালেন। নবী সে চাউনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মনিকাকে বলল, ক্ষিধে লেগেছে। কিছু খাব?

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেবিলে ডিনার দেয়া হবে। এখন একটু ভাল লাগছে?

নবী তার জবাব না দিয়ে ওসমান সাহেবের পাশে গম্ভীর মুখে বসল। ওসমান সাহেব বললেন– কেমন আছেন?

: ভাল।

: নাটকের কাজ কেমন এগুচ্ছে?

: ধরি নি এখনো। আমি তো আপনার মত না যে এক সপ্তাহে দু'টা উপন্যাস নামিয়ে দেব। আমি কম লিখব; কিন্তু যা লিখব ভাল লিখব।

মনিকা হালকা গলায় বলল, – তোমার ধারণা উনি ভাল লিখছেন না?

: পাঠযোগ্য লেখা মানেই ভাল লেখা না। ডিকেটটিভ উপন্যাসও তরতর করে পড়া যায়।

: তুমি এটা বলছ ঈর্ষা থেকে।

: ঈর্ষা? কিসের ঈর্ষা? আমি ঈর্ষা করি মানিক বাবুকে, ওসমান সাহেবকে ঈর্ষা করব কেন? তা ছাড়া ঈর্ষা একটা মেয়েলী ব্যাপার। পুরুষ মানুষদের ঈর্ষা থাকে না।

ওসমান সাহেব ঘড়ি দেখে বললেন,– আমি আজ উঠি। নবীর মুখ গম্ভীর। মনিকা খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছে। সে কিছু বলল না। নবী বলল, আমিও উঠব। মনিকা বলল, ক্ষিধে লেগেছে বলেছিলে।

: এখন ক্ষিধে নাই।

ভাত খেয়ে বিশ্রাম নাও। ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দেবে। তুমি নিজে নিজে ড্রাইভ করে যেতে পারবে না।

: আমি ঠিকই পারব। তুমি সব ব্যাপারে আমাকে আণ্ডার এস্টিমেট কর।

: সব ব্যাপারে করি না। কিছু কিছু ব্যাপারে করি।

নবীর মুখ আরও গম্ভীর হল। সে ওসমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল,– আমার উপর যদি ভরসা থাকে তাহলে আমি আপনাকে একটা লিফট দিতে পারি। মাতালের গাড়িতে চড়বেন?

ওসমান সাহেব হাসলেন। তিনি রাজি আছেন।

নেশাগ্রস্ত ড্রাইভারদের প্রবণতা হচ্ছে স্পীড বাড়ানো। সবাইকে দেখানো যে ঠিক আছে। গাড়ি চালানোর কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু নবীর গাড়ি চলছে খুব ধীরে। সে বড় রাস্তায় না উঠা পর্যন্ত কোন কথা বলল না। তাকে দেখে মনে হল সে খুবই চিন্তিত। ওসমান সাহেব বসে আছেন চুপচাপ। একবার শুধু বললেন, আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দরকার নেই। রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিলেই চলবে। নবী তার জবাব না দিয়ে হঠাৎ গাড়ির গতি অনেকখানি বাড়িয়ে দিল।

নবীকে তিনি পছন্দ করেন? এই প্রশ্নটি অনেকবার নিজেকে করেছেন। কখনো

ঠিক জবাব পান নি। আজও পেলেন না। ওসমান সাহেব 'দুপুর' উপন্যাসটি পড়েছেন। এটি একটি প্রথম শ্রেণীর রচনা। এক মসজিদের পেশ ইমাম–জোনাব আলী, এক দুপুরে ঠিক করলো একটি খুন করবে। সে সিন্দুকের ভেতর থেকে গরু কোরবানীর প্রকাণ্ড ছুরিটি বের করে ধার দিতে বসল। কাকে সে খুন করবে উপন্যাসের কোথাও তা বলা হল না।

নানান চরিত্রকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল একে একে এবং মনে হল এদের সবাইকে খুন করা যেতে পারে। যে লোক এমন একটি জটিল বিষয়েকে এত চমৎকার ভঙ্গিতে উপস্থিত করতে পারে তাকে পছন্দ করতেই হয়। ওসমান সাহেব হঠাৎ করে বললেন–নবী সাহেব, আপনি কী আমার কোন লেখা পড়েছেন?

: সেন্টিমেন্টাল লেখা আমি পড়ি না। আপনার একটা লেখা পড়তে চেষ্টা করেছিলাম, মেয়েলী জিনিসে এমন ঠাসা যে গা ঘিন ঘিন করে। মেয়েদের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়।

; মেয়েদের গায়ের গন্ধ খুব কী খারাপ?

: না খারাপ না ভাল। কিন্তু উপন্যাসে উঠে এলেই খারাপ। আধুনিক কালের সাহিত্যে সেন্টিমেন্টের কোন ব্যবহার থাকা উচিত নয়। একালের লেখা হবে জার্নালিষ্টিক।

ওসমান সাহেব তর্কে গেলেন না। নবী বললো, আপনি রাগ করলেন নাকি?

: না।

: আমি যা বললাম তা কি স্বীকার করেন?

: পুরোপুরি না করলেও কিছু করি।

: আপনার জীবদ্দশাতেই যখন আপনার লেখা কেউ পড়তে চাইবে না, তখন পুরোপুরি স্বীকার করবেন।

নবী গাড়ি বাড়ির সামনে এনে রাখল। ওসমান সাহেব বললেন,–নামবেন? ক্ষিধের কথা বলেছিলেন। আমার সঙ্গে খেতে পারেন। নবী থেমে থেমে বললো,– আমি আপনার এখানে খাব না। আমি এখন আবার মনিকার ওখানে যাব।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ। আমি বের হয়ে এসেছি আপনাকে বের করে আনার জন্যে।

ওসমান সাহেব তাকিয়ে রইলেন। নবী বললো,–ওকে আজ আমি একটা কথা বলব। সুস্থ অবস্থায় কথাটা বলার চেষ্টা করেছি। বলতে পারি নি। সে জন্যেই পাঁচ পেক হুইস্কি খেয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছেন?

: পারছি।

: জানতে চান?

: না, আমি জানতে চাই না।

: জানতে না চাইলেও আমি আপনাকে শুনাতে চাই। লিসন কেয়ারফুলি। আমি মনিকাকে বিয়ে করতে চাই। এই কথাটি আজ তাকে বলব। তার হ্যাসবেণ্ড থাকুক না থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। বুঝতে পারছেন?

: বুঝতে চেষ্টা করছি।

: আপনার ধারণা মদের ঝোঁকে এসব বলছি?

: বলতেও পারেন। অনেকে বলে। এ নিয়ে আমি ভাবছি না।

নবী হিস হিস করে বলল–

: আমি ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে যাব এবং মরব না। এতেই প্রমাণ হবে আমি মাতাল নই। কি বলেন?

সে একসিলেটারে চাপ দিল। গাড়ি লাফিয়ে উঠল।

৬

মিলি চুপি চুপি তার স্টিলের আলমারি খুলল। তার ভাবভঙ্গি অনেকটা চোরের মত। দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। সব ক'টা পর্দা টেনেছে এবং এমনভাবে আলমারির সামনে আছে যাতে চট করে আড়াল করা যায়। তবু তার হাত কাঁপছে। সে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ভেজানো দরজার দিকে।

মিলি ভয়ে ভয়ে তার টিনের কৌটা খুলল। ঘুমের অষুধগুলি সে গুনবে। মাঝে মাঝেই সে গুনে দেখে ক'টা হল। এর আগের বার ছিল তেত্রিশটি এরপরও সে ছ'টি কিনেছে। তার মানে উনচল্লিশটি হওয়া উচিত কিন্তু একচল্লিশটি হচ্ছে। সে আবার গুনতে শুরু করল, ঠিক তখন ঢুকল মতিয়ুর রহমান।

বিদ্যুৎ গতিতে আলমিরা বন্ধ করে মিলি হাসল। ফ্যাকাশে হাসি। তার মুখও শূন্য। মতিয়ুর রহমান কিছু লক্ষ্য করল না। ঘরে একটি ইজিচেয়ার আছে। সে সেখানে বসে সিগারেট ধরাল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, ফ্যানটা বাড়িয়ে দাও তো মিলি।

: মিলি ফ্যান বাড়িয়ে দিল।

: খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

মিলি মাথা নাড়ল। সে খেয়েছে। এ বাড়িতে অনেক মানুষ-জন। দু'তিন বারে খাওয়া হয়। সে বাচ্চাদের সঙ্গে প্রথম বারে খেয়ে নেয়। তার শাশুড়ী পছন্দ করেন না। ননদরা হাসাহাসি করে। কিন্তু সে না খেয়ে পারে না। সন্ধ্যা মিলাতেই তার ভাতের ক্ষিধে পেয়ে যায়।

: শুয়ে পড়া যাক তা হলে, কি বল?

মিলি কিছু বলল না। তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। মতিয়ুর অন্য রকমভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে। যার অর্থ পরিষ্কার। সে ঘুমুতেও এসেছে সকাল সকাল। সে এখন বেশ কিছুক্ষণ হালকা গলায় কথাবার্তা বলবে। মিলি কিছু বলার থাকলে শুনবে। মিলি বলল, ভাইয়ার ছেলেটার জ্বর।

: তাই নাকি?

: হুঁ। বেশ জ্বর।

: জ্বর-টর হচ্ছে চারদিকে। বর্ষার শুরুতে হয় এসব। ডাক্তার দেখাচ্ছে?

: দেখাচ্ছে। হয়ত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। তা হলে অবশ্যি ভালই হয়।

:ভাল হয় কেন?

: ছেলের অসুখের কারণে বাবা- মা কাছে আসবে। সমস্যা মিটে যাবে।

মতিউর কিছু না বলে আরেকটি সিগারেট ধরাল। মিলি টেনে টেনে বলল,

বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখে বাবা-মা মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তাই না?

: জানি না। ওদের তো লিগাল সেপারেশন হয়ে গেছে। হয়নি?

: হুঁ। তাতে কি?

মতিয়ুর বলল, বাতিটা নিভিয়ে ব্লু বাতিটা জ্বেলে দাও।

মিলি অস্পষ্টভাবে একটি নিঃশ্বাস ফেলল। কড়া আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বালাল। দরজা বন্ধ করল এবং মৃদু স্বরে বলল-কাপড় খুলে ফেলব?

মতিউর জবাব দিল না। রাগী চোখে তাকাল। মিলির প্রায় কান্না এসে যাচ্ছিল। সে কান্না থামিয়ে শাড়ি খুলতে শুরু করল। ঘর ভর্তি আলো। সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কি লজ্জার ব্যাপার। মিলি ক্ষীণ স্বরে বলল, এই বাতিটাও নিভিয়ে দেই?

: দরকারটা কি, থাক না।

মিলি বড় একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। সব বিবাহিত মেয়েদের জীবনই কি এ রকম? বিশেষ বিশেষ দিনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তারাও কি বসে থাকে স্বামীর সঙ্গে? তাদের স্বামীরাও কি সিগারেট টানতে টানতে লজ্জায় জড়সড় হয়ে যাওয়া স্ত্রীর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে? এসব প্রশ্নের উত্তর কোনদিন জানা যাবে না। কাকে জিজ্ঞেস করবে মিলি? এসব কি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায়? ছিঃ। তার নিজের মেয়েটির কথা ভেবে সে এই কারণেই কষ্ট পায়। তার জীবনও কি এরকম হবে? যদি হয় সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে। মিলি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। মতিয়ুর আরেকটি সিগারেট ধরিয়েছে। এটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার করণীয় কিছু নেই।

বাবু কি কেঁদে উঠল নাকি? মিলি কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে রইল। না বাবুর কান্না নয়। অবশ্যি সে কাঁদলেও মিলির কিছু করার নেই। তার শাশুড়ী বাবুর দেখা শোনার দায়িত্ব নিয়েছেন। মিলির নাকি শিশু পালনের ক্ষমতা নেই। কবে নাকি বাবু কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছে, তার ঘুম ভাঙ্গেনি। হবে হয়তো। মাঝে মাঝে তার খুব ঘুম পায়। এখন অবশ্যি রাতগুলি জেগেই কাটে সারাক্ষণ, মনে হয় এই বুঝি বাবু কাঁদছে। এই বুঝি বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ল।

: মিলি।

: উঁ।

: পানি দাও তো এক গ্লাস।

পানির জগ ও গ্লাস আরেক মাথায়। মিলির কি এই অবস্থায় হেঁটে হেঁটে পানির গ্লাস আনতে যেতে হবে। গায়ে কোন কাপড় জড়াতে পারবে না। কারণ তাতে মতিউর রাগ করবে। মিলি উঠে দাঁড়াল। আয়নায় তার শরীরের ছায়া পড়ছে। সেই ছায়াটি কি সুন্দর? ওর কাছে কি সুন্দর লাগছে? মিলি জানে না। তার জানতেও ইচ্ছা করে না। সে এগিয়ে যায় পানির গ্লাস আনতে। মতিয়ুর রহমান সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

৭

ফয়সল সাহেব ডেনটিষ্টের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে উপরের পাটির একটি দাঁত তুলে ফেলতে হবে। মাঝে মাঝেই ব্যথা হচ্ছে। অসহ্য ব্যথা নয়-

www.BDeBooks.Com

চিনচিনে ব্যথা। ঠাণ্ডা পানি খেতে পারেন না। দাঁত শির শির করে।

অল্প বয়স্ক ডেনটিষ্ট তাঁকে অবাক করল। সে গম্ভীর হয়ে বলল, আপনার দাঁত তো ঠিক আছে? শুধু শুধু তুলতে চান কেন? চমৎকার দাঁত, হেসে খেলে আরো দশ বছর যাবে। এনামেল নষ্ট হয়েছে সে জন্যই ঠাণ্ডা পানি খেতে পারেন না,এটা কিছুই না।

ফয়সল সাহেব হৃষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরলেন। রিক্সা নিলেন না। দের মাইল রাস্তা হাঁটলেন। এই বয়সে হাঁটা ভাল। ব্লাড সার্কুলেসন ভাল হয়। হার্ট ঠিক থাকে। ভাদ্র মাসের কড়া রোদে তাঁর খানিক কষ্ট হল। কিন্তু মনে আনন্দ। আনন্দ থাকলে কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে হয় না। তাঁর ধারণা হল তিনি দীর্ঘদিন বাঁচবেন। আরো দশ বছর তো বটেই। দশ বছর খুব কম সময় নয়। দীর্ঘ সময়। তাঁর খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে। মৃত্যুর মত একটা ভয়াবহ ব্যাপারকে যত ঠেকিয়ে রাখা যায় ততই ভাল।

কাবুল মিয়া ফয়সল সাহেবকে দেখেই ছুটে গিয়ে গেট খুলে দিল। কাবুল মিয়া ফয়সল সাহেবের বুইক গাড়ির ড্রাইভার। এই গাড়ি গত দু' বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ফয়সল সাহেব সারাচ্ছেন না। অবশ্যি কাবুল মিয়ার চাকরি ঠিকই আছে। খাওয়া-দাওয়া এবং বেতন ঠিক মতই পাচ্ছে। তার বর্তমান চাকরি হচ্ছে বারান্দায় পা ছড়িয়ে ঘুমানো এবং হঠাৎ কোন কোন দিন ছুটে গিয়ে গেট খুলে দেয়া। অবশ্যি এই বিশেষ কাজটি সে শুধু ফয়সল সাহেবের জন্যেই করে। তার নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন।

ফয়সল সাহেব হাসি মুখে বললেন -কি খবর কাবুল মিয়া? কাবুল মিয়ার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বড় সাহেব এই সুরে কখনো কথা বলেন না।

: ভালতো কাবুল মিয়া?

: জ্বি স্যার।

: তোমায় গাড়িটা তো ঠিকঠাক করতে হয়

কাবুল মিয়া হাত কচলাতে লাগল।

: বাগানের এই অবস্থা কেন?

কাবুল মিয়া কি বলবে ভেবে পেল না। মালীকে ফয়সল সাহেব নিজেই গত মাসে বিদায় করেছেন। এম্নিতেই বাগানের অবস্থা কাহিল ছিল। মালী চলে যাবার পর মরুভূমি হয়ে গেছে।

: বাগান সাজাতে হবে বুঝলে কাবুল মিয়া। শীত এসে যাচ্ছে। ফ্লাওয়ার বেড তৈরী করতে হবে। ঝামেলা আছে। আছে না?

: জ্বি স্যার আছে।

তিনি উৎফুল্ল মনে দোতলায় উঠে শিশুদের গলায় ডাকলেন, বীথি বীথি।

বাড়ির সবাই ফয়সল সাহেবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করল। এ বাড়িতে অনেক লোকজন। বেশীর ভাগই আশ্রিত। আশ্রিত লোকজন গৃহকর্তার মেজাজের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তাদের মেজাজও গৃহকর্তার মেজাজের সঙ্গে ওঠানামা করে। কাজেই এ বাড়ির সবার মনেই সুবাতাস বইল। যদিও সবাই জানে এ সুবাতাস ক্ষণস্থায়ী। ফয়সল সাহেবের মেজাজ খুব বেশী সময় ঠিক থাকে না। কে জানে হয়ত আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তিনি উল্টে যাবেন।

কিন্তু তিনি উল্টালেন না। সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে দেখা গেল বীথির সঙ্গে। ইজিচেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। বীথি কিছু বলছে না। তিনি একাই কথা বলছেন-

বুঝলে বীথি, ব্রিটিশ আমলে নাইনটিন ফর্টিসিক্স কিংবা ফর্টি ফাইভে একটা স্ট্রেঞ্জ মামলা হয়। দুই ভদ্রলোক একই সময়ে একটা ছেলের পিতৃত্ব দাবী করে মামলা করেন। এদের একজনের নাম রমেশ হালদার। আমি ছিলাম এই রমেশ হালদারের লাইয়ার। মামলায় আমরা জিতে যাই। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে রমেশ হালদার ঐ ছেলের বাবা ছিল না বলে আমার ধারণা।

: বলেন কি?

: এই যুগে অবশ্যি পিতৃত্ব এষ্টাবলিশ করা খুব সোজা। ডি এন এ টেষ্ট করলেই হয়। তখনতো এসব ছিলনা। বুঝলে বীথি মামলাটা ছিল দারুণ ইন্টারেষ্টিং।

: এইসব লিখে ফেলেন না কেন?

: কথাটা খারাপ বলনি তো, লেখা যায়।

ফয়সল সাহেব, সোজা হয়ে বসলেন। হাসিমুখে বললেন- এইটা আর কি মামলা, একটা মামলা ছিল মেয়ে-ঘটিত। ফিকসান তার কাছে কিছু না।

: আপনি স্যার লিখে ফেলেন।

: এই বয়সে কি আর লেখা সম্ভব হবে। কিছু পড়তে গেলেই চোখে ষ্ট্রেইন পড়ে।

: আপনি বলবেন, আমি লিখব।

ফয়সল সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি নিজেই বের হলেন খাতা কিনতে।

রাতে টেলিফোন করলেন ছেলেকে। একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। ওসমানের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। পুত্র-কন্যাদের খোঁজ-খবর রাখাকে তিনি চারিত্রিক দুর্বলতা মনে করেন।

: ওসমান নাকি?

: জ্বি কি ব্যাপার।

: ব্যাপার কিছু না। তুই আছিস কেমন?

: ভাল আপনার শরীর কেমন?

: শরীর ভালই।

: কোন দরকারে টেলিফোন করছেন, না এম্নি?

: তোর কাছে আবার আমার কি দরকার? এম্নি করলাম। আচ্ছা শোন বীথি মেয়েটাকে তোর কেমন লাগে? আমার সেক্রেটারী। দেখেছিস তাকে?

: না, দেখিনি। শুনেছি মিলির কাছে।

: এই বাড়িতেই সে এখন থাকে। নিডি মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল। হ্যাসবেণ্ডের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

: ও তাই নাকি।

: আমার এখানে থাকে বলে তোরা আবার কিছু মনে করিস না তো?

: না, কি মনে করব?

: আচ্ছা রাখলাম।

ফয়সল সাহেব, হৃষ্টচিত্তে ঘুমুতে গেলেন। এবং তার কিছুক্ষণ পরই খবর পেলেন টগরের ডিপথেরিয়া হয়েছে বলে ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন। তাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করার জন্যে নেয়া হচ্ছে।

ফয়সল সাহেবকে দেখে মনে হল না এই খবরটি তাঁকে বিচলিত করেছে। তিনি ক্লিনিকে যাবার জন্যে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাপড় বদলাতে লাগলেন। বীথিকে বললেন, গাড়িটা ঠিক করা দরকার। কখন কি দরকার হয়। কালকে আমাকে মনে করিয়ে দিও তো?

৮

টগরকে ভর্তি করা হয়েছে একটা ক্লিনিকে।

ঝকঝকে তকতকে একটা বাড়ি। হাসপাতাল মনেই হয় না। রুগীটুগীও নেই। তিন নম্বর রুমে একটি মাত্র পেসেন্ট। সেও খুবহাসি খুশী। অল্প বয়সী একজন তরুণী। প্রথম মা হবে। সকালবেলা ব্যথা উঠেছিল, সবাই ব্যস্ত হয়ে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার বললেন ফলস পেইন। স্বামী ভদ্রলোক নার্ভাস প্রকৃতির। সে স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে রাজি নয়। রাতটা এখানেই রাখতে চায়। সে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সিগারেট দিচ্ছে এবং স্ত্রীর ব্যথা উঠার ব্যাপারটি বলছে। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে, দরকারের সময় কাউকে পাওয়া যায় না। তাঁর নিজের গাড়ি আছে। আত্মীয়-স্বজনদেরও গাড়ি আছে কিন্তু তার স্ত্রীকে আনতে হলো রিকশায়। এর নাম ভাগ্য।

ওসমান সাহেব পৌঁছেলেন রাত এগারোটায়। ওয়েটিং রুমে অপলা বসে আছে। আর কাউকে দেখা গেল না। বারান্দার সোফায় এক বুড়ো ভদ্রলোক পা এলিয়ে পড়ে আছেন। অপলা বললো, দুলাভাই, আপনার এত দেরী হল কেন? ওসমান সাহেব সহজ স্বরে বললেন–পিজিতে গিয়েছিলাম। তোমরা কোথায় আছ কেউ বলতে পারল না।

: বুঝলেন কি করে আমরা এখানে?

: তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম। রানুর খালার কাছ থেকে ঠিকানা আনলাম। টগর কেমন আছে?

: ভাল আছে। ভয়ের কিছু নেই। ঘুমুচ্ছে। আপনি ভেতরে চলে যান আপা সেখানে আছে। দু'নম্বর রুম।

: আর সঙ্গে আর কে আছে?

: আর কেউ নেই। যান আপনি–ছেলেকে দেখে আসুন।

তিনি সিগারেট ধরালেন এবং বেশ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন অসুস্থ ছেলের জন্যে যে রকম আবেগ অনুভব করার কথা সে রকম তিনি করছেন না। কিংবা হয়ত এই ক্লিনিকটি মনের উপর চাপ ফেলতে পারছে না। হাসপাতাল যে রকম ফেলে।

ওসমান সাহেবের পানির তৃষ্ণা হচ্ছিল। এখানে পানি কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে। অপলা বিরক্ত স্বরে বলল, দাঁড়িয়ে আছেন [illegible]

আছে।

: তুমি এখানে বসে আছ কেন?

: এম্নি আমার ভাল লাগছে না।

অপলা অন্য দিকে মুখ ফেরাল। ঝগড়া-টগড়া কিছু হয়েছে। মেয়েরা অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে ঝগড়া করতে পারে।

এই ক্লিনিক বিত্তবানদের জন্যে। বেশ বড় বড় রুম। জানালায় সুন্দর পর্দা। প্রশস্ত বেডে ফোমের তোষক। ওসমান সাহেব দেখলেন টগর কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। গায়ে ধবধবে সাদা একটা চাদর। সাদা চাদর সব সময় মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। ওসমান সাহেব মনে মনে ঠিক করলেন রানুকে বলবেন চাদরটা বদলে দিতে।

রানু খুব ভয় পেয়েছে। সে বসে আছে টগরের মাথার পাশে। কিছুক্ষণ পর পরই টগরকে ছুঁয়ে দেখছে।

টগর বেঁচে আছে এ ব্যাপারে সে যেন নিশ্চিত হতে চান। রানুর চোখের নিচে কালি পড়েছে। সে কাঁপছে অল্প অল্প। এতটা ভয় পাওয়ার মত সত্যি কী কিছু হয়েছে? টগর তো ঘুমুচ্ছে বেশ স্বাভাবিকভাবে। ওর ঘুমন্ত মুখে তেমন কোন যন্ত্রণার ছাপ নেই। কোথায় যেন পড়েছিলেন, শিশুদের মুখে শারীরিক কোন কষ্টের ছাপ পড়ে না। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন,–ও কেমন আছে?

: ভাল। ঘন্টাখানেক আগে ঘুমিয়েছে।

: গায়ে জ্বর আছে?

: আছে।

তিনি টগরের কপালে হাত রাখতেই সে কেঁপে উঠল। যেন সে বুঝতে পারছে অপরিচিত কারোর স্পর্শ। এ হাত মায়ের হাত নয়।

: বেশ জ্বর তো গায়ে।

: হ্যাঁ। বারটার সময় আরেক ডোজ অষুধ পড়বে।

ওসমান সাহেব ইতস্তত করে বললেন– ক্লিনিকের কাউকে বল সাদা চাদর বদলে একটা রঙিন চাদর দিতে।

: কেন?

: এমনি বলছি। কারণ নেই।

রানু কাঁপা গলায় বলল,–কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে। তুমি বল।

: সাদা চাদর মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়।

রানু কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে টগরের গায়ের চাদর তুলে ফেলল। ওসমান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন–এত ভয় পাচ্ছ কেন রানু? ভয়ের কিছু নেই।

: তুমি বুঝলে কি করে ভয়ের কিছু নেই?

তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিন্তু রানু তাকিয়ে আছে আগ্রহ নিয়ে। সে একটা জবাব চায়।

: বল কি করে বুঝলে ভয়ের কিছু নেই?

: আমার মন বলছে। দেখবে ও সকালের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

রানু বলল,–বারটা বাজতে কত দেরী বলতো?

: পনেরো মিনিট।

www.BDeBooks.Com

হল ঘরে একজন নার্স আছে তাকে খবর দাও। বারটার সময় অষুধ দিতে হবে। আর শোন, তুমি কি আত্মীয়-স্বজন সবাইকে খবর দিয়েছ?

: না। কাউকেই কিছু বলি নি।

: সবাইকে বল।

: দরকার আছে কোন?

: আছে। নয়ত পরে সবাই রাগ করবে।

কথাটা মিথ্যা নয়। এদেশে অসুখ-বিসুখ সামাজিক ব্যাপার। যথা সময়ে সবাইকে জানাতে হবে। কেউ যেন বাদ না পড়ে। কাউকে খবর না দেয়ার মানে হচ্ছে তাকে দাম দেয়া হয়নি। তুচ্ছ করা হয়েছে।

ওসমান সাহেব ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। নার্সকে দেখা গেল ট্রেতে করে অষুধপত্র সাজিয়ে আনছে। ক্লিনিকটি মনে হচ্ছে ভালই। ঘড়ি ধরে সব হচ্ছে। বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী আছে এখনো।

নার্স মেয়েটি মধ্য বয়সী। গায়ের রং শ্যামলা। কিন্তু ধবধবে সাদা শাড়ির জন্যে তাকে কালো দেখাচ্ছে। ভালই লাগছে। মেয়েটির মধ্যে মা মা ভাব আছে।

ওসমান সাহেব হাসিমুখে তাকালেন। মেয়েটি বিরক্ত গলায় বলল-এত মানুষ কেন এখানে? শুধু একজন থাকবেন। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করেন। ক্লিনিকের নিয়ম-কানুন মানতে হবে তো।

মেয়েটির গলার স্বর পুরুষালি। কথা বলার ভঙ্গিটিও বাজে। ওসমান সাহেব ওয়েটিং রুমে চলে এলেন।

অপলা বেঁটে মত একটি লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে? লোকটির হাতে এটা জ্বলন্ত সিগারেট। সে হাত মুঠো করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সিগারেট টানছে। ওসমান সাহেব এগিয়ে আসতেই সে হাসি মুখে বলল-স্লামালিকুম স্যার, আবদুল মজিদ আমার নাম। পিডিপিতে কাজ করি।

ভদ্রলোকের গলার স্বর এমন যেন দীর্ঘদিনের পরিচয় তাদের। ওসমান সাহেব অস্পষ্টভাবে হাসলেন।

: আপনার কথা শুনলাম স্যার উনার কাছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক। আপনাদের সাথে দেখা হওয়া ভাগ্যের কথা। সিগারেট নেন স্যার।

ওসমান সাহেব সিগারেট নিলেন। মজিদ দামী একটা লাইটার বিদ্যুৎগতিতে বের করল। হাসি মুখে বলল-আপনার নাম শুনেছি।

লেখা পড়ি নাই। আউট বই পড়ার আমার অভ্যাস নাই। আমি খুবই লজ্জিত।

: লজ্জিত হবার কিছু নাই। পড়ার অভ্যাস অনেকের নেই। অনেকে সময় ও পায় না।

: আমার স্ত্রী অবশ্যি খুব পড়ে। রাত-দিন গল্পের বই নিয়ে আছে। আমাকে রাতে পড়ে শুনাতে চায়। যা মুসিবত। সারাদিন পরিশ্রম করে রাতে একটু ঘুমাব। তা না গল্প শোন। অন্য মানুষদের জীবনের বানানো গল্প শুনে কোন লাভ আছে স্যার, বলেন?

: না। লাভ আর কি।

: এই তো আপনি স্বীকার করলেন। অনেস্টলি এডমিট করলেন। নিজে সাহিত্যিক হয়েও করলেন। আপনি স্যার গ্রেটম্যান।

অপলা হাসছে মুখ টিপে। ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মজিদ ক্রমাগত কথা বলে যেতে লাগল-তার স্ত্রীর ব্যথা কীভাবে উঠল, কত ঝামেলা করে আসতে হল এখানে। এসে দেখা গেল ফলস পেইন। আসার সময় আত্মীয়-স্বজন কাউকেই খবর দেয়া হয়নি। এখান থেকে টেলিফোন করারও উপায় নেই। কারণ তার সবকিছু মনে থাকে কিন্তু টেলিফোন করারও উপায় নেই। কারণ তার সবকিছু মনে থাকে কিন্তু টেলিফোন নাম্বার মনে থাকে না। একটা কালো ডাইরীতে সব নাম্বার লেখা আছে কিন্তু তাড়াহুড়ার জন্যে সে ডাইরীটাই আনা হয়নি। অপলা বললো-আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন। তাঁর নিশ্চয়ই মনে আছে। মেয়েদের এসব জিনিস খুব মনে থাকে।

মজিদ প্রায় লাফিয়ে উঠল-দ্যাটস রাইট। এক্ষুনি যাচ্ছি।

অপলা বলল, ভদ্রলোক মাথা ধরিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যি খুবই সরল টাইপের মানুষ। তার জীবনের পুরা হিস্ট্রি আমাকে বলেছেন। আপনার উপন্যাসের জন্যে একটা চমৎকার ক্যারেকটার। ঠিক না দুলাভাই?

ওসমান সাহেব সহজ স্বরে বললেন, খুব কমন ক্যারেকটার। এ জাতীয় মানুষ প্রচুর আছে আমাদের চারপাশে। তাছাড়া এদের তুমি যতটা সরল মনে করছ ততটা না। এদের অনেকেই বোকার একটা মুখোশ পড়ে থাকে। এই মুখোশ দিয়ে প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। সেগুলিকে তখন আর মিথ্যা বলে মনে হয় না।

অপলা তাকিয়ে রইল। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না?

: বিশ্বাস করব না কেন? করছি।

: না, করছ না। এই লোকটির কথাই ধর, সে যে মিথ্যা বলছে তা কি টের পেয়েছ?

: সে আবার কি মিথ্যা বলল?

: ঐ যে বলল আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিতে পারি নি। এটা মিথ্যা। আমি এসে দেখি, এখানে একগাদা লোকজন। সে সবাইকে সিগারেট দিচ্ছে।

: ঔপন্যাসিকরা খুব ভাল ডিটেকটিভ হতে পারে বোধ হয়। এরা সবকিছু খুব তলিয়ে দেখে। ঠিক না দুলাভাই?

ওসমান সাহেব একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর নিজের কাছেই মনে হলো অপলাকে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে ইমপ্রেস করা। এই বালিকাটিকে মুগ্ধ করবার একটি গোপন ইচ্ছা কী তার অবচেতন মনে বাসা বেঁধে আছে? কেন আছে?

: অপলা।

: জ্বি।

: এখানে টেলিফোন আছে?

: অফিসে আছে। দু' টাকা করে দিতে হয়। এরা ভাল বিজনেস শুরু করেছে। আমি কী আসব আপনার সঙ্গে?

: এসো।

: আপার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম। নার্সটা একগাদা কথা শুনিয়ে দিল। ইচ্ছা হচ্ছিল একটা চড় দেই।

: দিলে না কেন?

অপলা অবাক হয়ে তাকাল। ওসমান সাহেবের গলার স্বরে কোন রসিকতা নেই। তিনি সত্যি সত্যি জানতে চান। অপলা মৃদু স্বরে বলল: আপনি লোকটি খুব অদ্ভুত।

: তাই কী?

: হ্যাঁ।

রাতে দেড়টায় টেলিফোন করা বিরক্তিকর ব্যাপার। বার বার রিং হবে কেউ ধরবে না। তারপর যখন ধরবে তখন ভয়ার্ত স্বর বের করবে-কী হয়েছে কী হয়েছে? কী হয়েছে ব্যাখ্যা করার পরও বুঝতে চাইবে না। আবার বলতে হবে। মধ্যরাতে সুসংবাদ দিয়ে কেউ ফোন করে না।

কিন্তু আশ্চর্য, রিং করা মাত্রই মিলি ধরল এবং সহজ স্বরে বলল-কাকে চাই?

: মিলি নাকি?

: হুঁ। কী ব্যাপার, ভাইয়া?

:তুই এখনো ঘুমুস নি।

: না, রাতে তো আমার ঘুম হয় না।

: ঘুম হয় না মানে?

: হয় না মানে হয় না। মাঝে মাঝে ঘুমের অষুধ খাই। তুমি এত রাতে কি জন্যে ফোন করেছ?

: টগরের শরীরটা খারাপ। ডিপথেরিয়া। ওকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

মিলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, এই কথাটা তুমি এত পরে বলছ কেন? ঠিকানা কি বল, আমি এক্ষুনি আসছি।

: আসার দরকার নেই, ও ভালই আছে।

: তোমাকে ঠিকানা দিতে বলছি তুমি ঠিকানা দাও।

ওসমান সাহেব ঠিকানা দিলেন। তিনি নিশ্চিত জানেন মিলি আধা ঘন্টার মধ্যে আসবে। এবং আসার আগে ঢাকা শহরে যত পরিচিত লোকজন আছে সবাইকে টেলিফোন করবে। টেলিফোনের ভাষাটা হবে এরকম-সর্বনাশ হয়ে গেছে-টগরের শরীর খুব খারাপ। এখন তখন অবস্থা। হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এক্ষুনি আসুন।

অপলা বলল,-মিলি আপা আসছে নাকি?

: হ্যাঁ আসছে। মনে হচ্ছে বিরাট একটা দল নিয়ে আসবে। ও ঝামেলা ছাড়া কিছু করতে পারে না।

অপলা অল্প হাসলো। ওসমান সাহেব বললেন, ক্ষিধে পেয়েছে, রাতের খাওয়া হয়নি। তোমরা কিছু খেয়েছ?

: না।

: মিলিকে বলে দেই কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আসতে।

: বলুন।

যা ভাবা গেছে, টেলিফোন এনগেজড। মিলি নিশ্চয়ই পাগলের মত

চারদিকে টেলিফোন করছে। ওসমান সাহেব বেশ শব্দ করেই হাসলেন। অপলা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আপনাকে একটা কথা বলব দুলাভাই?

: বল।

: আগে কথা দিন রাগ করতে পারবেন না।

: না, রাগ করব না।

: এই যে টগর এরকম অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে এটা আপনাকে এফেক্ট করে নি। ঠিক না?

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। অপলা বলল আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

: না, রাগ করি নি।

: আমার ধারণা ছিল কবি-সাহিত্যিকদের অনুভূতি অনেক তীক্ষ্ম। ধারণাটা বোধ হয় সত্যি না।

একজনকে দিয়েই সবার বিচার করা ঠিক?

অপলা চুপ করে রইল। সে একটু লজ্জিত বোধ করেছে। মজিদ সাহেবকে সিগারেট হাতে হাসতে হাসতে আসতে দেখা গেল।

: স্যার, আমার স্ত্রী আপনাকে চিনেছে। আপনার তিনটা বই সে পড়ছে। এর মধ্যে দু'টা খুব ভাল লেগেছে। নাম বলেছিল। এখন মনে নাই।

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। পানির তৃষ্ণা অনেক বেড়েছে। কোথায় পানি পাওয়া যাবে কে জানে।

রাত দু'টার দিকে রানু এসে বলল, টগরের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার বলেছে অক্সিজেন দিতে হবে। রানু কাঁপছে থরথর করে। ওসমান এগিয়ে এসে তার হাত ধরলেন।

রানু কাঁদতে শুরু করল। এত ভয় পেয়েছে সে? ওসমান সাহেব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। আশেপাশে কেউ নেই। বারান্দার শেষ প্রান্তে মজিদ সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি আড়ালে সরে গেলেন। এই ছোট্ট ভদ্রতাটি ওসমান সাহেবের বড় ভাল লাগল।

রানুর হাত থরথর করে কাঁপছে। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, কোন ভয় নেই রানু। এরকম অভয়বাণী দেয়ার যোগ্যতা কি তাঁর আছে? তিনি ডাক্তার নন। মহাপুরুষও নন। রানু যেমন ভয় পেয়েছে, তিনিও পেয়েছেন। তবু অভয় দেয়ার দায়িত্বটি তিনি নিলেন কেন? পুরুষ হিসেবে এই দায়িত্ব কি আপনাতেই এসেছে তাঁর কাছে?

: রানু চল টগরের কাছে যাই। মিলিরা এসে পড়বে।

টগর জেগে আছে কি ঘুমিয়ে আছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। অক্সিজেনের নল তার নাকে স্কচ টেপ দিয়ে আটকানো। অল্প বয়সী ডাক্তারটি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। টগরের যে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে তা মনে হল না। সে বেশ স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ওসমান সাহেব বললেন, কেমন দেখছেন? ডাক্তার ছেলেটি হাসিমুখে বলল,-ভাল, ভয়ের কিছু নেই। ব্রিদিংয়ের কষ্ট হচ্ছিল মনে করে অক্সিজেন দিয়েছি। আসলে অক্সিজেনের নল দেখলেই লোকজন ভয় পায়।

www.BDeBooks.Com

রানু শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। ডাক্তার ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে সহজ স্বরে বলল, তেমনি কিছু অসুবিধা হলে তো আমি স্যারকে ডেকে আনতাম। আনতাম না?

রানু কাঁপা গলায় বলল, আপনি আপনার স্যারকে ডেকে আনুন।

: কোনই প্রয়োজন নেই।

: প্রয়োজন আছে, ডেকে আনুন।

: বিশ্বাস করুন দরকার হলেই আমি তাঁকে ডাকব।

রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, আপনি বুঝতে পারছেন না, এই ছেলেটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ওসমান সাহেব তাকালেন রানুর দিকে। তার চোখ ভেজা। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটি কঠিন। শিশুটিকে রক্ষার জন্যে সে যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। চমৎকার একটি ছবি তো। তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর কোন উপন্যাসে এরকম কোন ছবি আছে কি? তিনি মনে করতে পারলেন না। বাইরে গাড়ির হর্ণ দিচ্ছে। মিলিরা কি এসে পড়েছে? তিনি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন।

দু'টি গাড়ি ভর্তি করে একগাদা মানুষ এসেছে। মিলি যাকে যেখানে পেয়েছে ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছে। বাবা এসেছেন। বাবার সেক্রেটারী সুন্দরী মেয়েটি পর্যন্ত এসেছে। ওসমান সাহেব বিরক্ত হবার বদলে খুশী হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, এতগুলি মানুষ হঠাৎ চলে আসার একটা উৎসবের ভাব চলে এসেছে।

তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময়ও এরকম হল। নানান জায়গা থেকে এত মানুষজন এল যে বাড়িটি হয়ে গেল বিয়ে বাড়ির মত। সবাই মায়ের ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ চোখ মুছে তারপর ছড়িয়ে পড়ে সারা বাড়িতে। সবাই চেষ্টা করে মুখের ভাব যথাসম্ভব করুণ রাখতে। সেটা বেশীক্ষণ সম্ভব হয় না। পুরানো দিনের মজার মজার সব ঘটনা মনে পড়ে যায় একেক জনের। খানিকক্ষণ হাসির পর আবার দারুণ গম্ভীর হয়ে যায় সবাই।

পরিষ্কার মনে আছে, পানি আনবার জন্যে রান্নাঘরে ঢুকে ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন তিন-চারজন মাঝ-বয়সী মহিলা সুখী সুখী মুখে জমিয়ে গল্প করেছেন। চুলায় এক বিশাল কেতলীতে চায়ের পানি ফুটছে। টেবিলে সারি সারি চায়ের কাপ। ওসমান সাহেবকে দেখেই একজন মহিলা বললেন- চায়ের দেরী হবে। দুধ আনতে গেছে। দুধ নাই।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন, মিলির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। সে বোধ হয় রাস্তায় আসতে আসতে কেঁদেছে। তার চোখ লাল। নাক ফুলে আছে। মিলি তাঁকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, টগরের খবর কি?

: ভালই।

: কে যেন বলল অক্সিজেন দিচ্ছে।

: তা দিচ্ছে।

: তাহলে ভাল হয় কিভাবে? এসব কি বলছ তুমি?

ওসমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। মিলি বলল, আরে, তুমি কেমন মানুষ? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

: কোথায় যাব?

: টগরের কাছে গিয়ে বস?

: বসলে কি হবে?

: বসলে কি হবে মানে? নিজের ছেলের এত বড় অসুখ আর তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আরাম করে বিড়ি সিগারেট খাবে?

বলতে বলতে মিলি কেঁদে ফেলল। মেয়েরা এত সহজে কাঁদতে পারে? মনিশ রায় বলে তার এক বন্ধু একবার বলেছিল মেয়েদের সব কিছুর মধ্যে একটা লোক দেখানোর ব্যাপার আছে। কোন মেয়ের যদি স্বামী মরে যায় সে কাঁদবে কিন্তু এমনভাবে কাঁদবে যেন তাঁকে খারাপ না দেখা যায়। কাঁদার মধ্যেও সে একটু আর্ট খুঁজবে

মিলি অবশ্যি আর্ট-ফার্ট খুঁজছে না। সে বিশ্রী একটা ভঙ্গি করেই কাঁদছে। ওসমান সাহেব বললেন, এত কাঁদছিস কেন?

: কাঁদব না?

: কাঁদার মত তো কিছু হয়নি?

মিলি ফোঁফাতে ফোঁফাতে বলল, সব কিছুর মূলে হচ্ছে তুমি। তোমার মধ্যে মায়া বলে কিছু নেই।

: মায়ার সঙ্গে ডিপথেরিয়ার কি সম্পর্ক? ডিপথেরিয়া একটা জীবাণুঘটিত অসুখ। খুব মায়া আছে এমন একজন বাবার ছেলেরও ডিপথেরিয়া হতে পারে। তুই যা-তোর ভাবীর কাছে যা। তবে এমন হাউমাউ করে কাদিস না।

মিলি তীব্র কণ্ঠে বলল, কেমন করে কাঁদতে হবে? তোমার উপন্যাসের নায়িকাদের মত? ফিচ ফিচ করে?

তিনি হেসে ফেললেন। স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা মাঝে মাঝে বেশ মজার কথা বলে।

মিলি ঘরের দিকে চলে গেল। তার মুখ থম থম করছে। রানুর কাছে গিয়ে সে দ্বিতীয় দফায় কেঁদে-কেটে একটা ঝামেলা করবে। ওসমান সাহেব হাঁটতে হাঁটতে বরান্দার শেষ মাথায় চলে গেলেন। সিগারেটটা ড্যাম্প। টানতে কষ্ট হচ্ছে।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন, তাঁর বাবা খুবই উৎসাহী ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছেন। কোন রকম ঝামেলা উপস্থিত হলে বুড়োরাই বোধ হয় সবচেয়ে উৎসাহী হয়। তাঁদের উত্তেজনাহীন জীবনে সাময়িক উত্তেজনার বিষয়গুলি তাঁরা উপভোগ করেন।

বাবাকে দেখা গেল গম্ভীর হয়ে কাকে হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন ধরাধরি করে ওয়েটিং রুম থেকে একটা সোফা বাইরে নিয়ে এল। তিনি রাজা-বাদশাদের মত মুখ করে বসলেন। এই লোকটি যে বাড়িতেই যান সে বাড়িকেই মনে করেন নিজের বাড়ি। ওয়েটিং রুম থেকে সোফা টেনে বারান্দায় আনার কোন দরকার ছিল না। ওয়েটিং রুমে দিব্যি বসা যেত। আর এমন যদি হয় যে তাঁকে বরান্দাতেই বসতে হবে তিনি বেতের চেয়ারে বসতে পারতেন। বেশ কয়েকটি বেতের চেয়ার আছে বরান্দায়। ওসমান সাহেব সিগারেট ফেলে দিয়ে বাবার কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি ধমকের স্বরে বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

: এখানেই ছিলাম।

: ক্লিনিকে আনার বুদ্ধি দিল কে? ক্লিনিকে কোন চিকিৎসা হয়? টাকার শ্রাদ্ধ

ছাড়া কিছুই হয় না। যত বেকুবী কাণ্ডকারখানা। আসল যে ডাক্তার সে ঘুমাচ্ছে। এক চেংড়া ছেলেকে দিয়ে রেখেছে। সে এ বি সি ডি জানে না, ডাক্তারী জানবে কি?

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ডাক্তারী জানবে না কেন? মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে এসেছে।

: পাশ করলেই ডাক্তার হয়? হাজার হাজার ছেলে পুলে তো ল' পাশ করছে। ওরা পারে ওকালতী করতে? কোর্টে দাঁড়িয়ে একটা আর্গুমেন্ট করতে গেলেই তো প্যান্ট নষ্ট করে ফেলবে।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। বাবার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। হৈ চৈ শুরু করলেন।

অপলা এসে বলল, –চাচাজান আপনাকে ভেতরে ডাকে।

: কে ডাকে?

: রানু আপা। বড় ডাক্তার এসেছে।

: ঘুম ভেঙ্গেছে তাহলে। আমি ভেবেছিলাম তোর দশটার আগে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হবে না। ওসমান তুই ও আয়।

: না ঠিক আছে। আপনি একাই যান। একসঙ্গে এতগুলি মানুষের ভিড় করা ঠিক হবে না।

ওসমান সাহেব বাবার খালি করা সোফায় বসলেন। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে এখানে পানি কোথায় পাওয়া যায় কে জানে। মোটা নার্সটাকে একটি ট্রে নিয়ে যেতে দেখা গেল। ওসমান সাহেব একবার ভাবলেন তাকে জিজ্ঞেস করবেন। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারলেন না। বাবা হলে কড়া গলায় বলতেন–, 'এই যে মেয়ে, ঠাণ্ডা দেখে এক গ্লাস পানি আন। গ্লাস ধুয়ে আনবে।' এই বলায় কোন রকম জড়তা থাকতো না। যেন নিজের বাড়িতেই কাউকে কিছু বলছেন। একটি মানুষের সঙ্গে অন্য একটি মানুষের এত তফাৎ।

ওসমান সাহেব দেখলেন বাবার সেক্রেটারী মেয়েটি ছোট ছোট পায়ে এগিয়ে আসছে। মিলির কাছে এর কথা শুনেছেন। কিন্তু দেখা হল এই প্রথম। কি যেন নাম মেয়েটির? অত্যন্ত পরিচিত চেহারা। আগে কি দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন? টিভি বা সিনেমায় অভিনয়–টবিনয় করে নাকি? করলেও তাঁর দেখার কথা নয়। টিভি–সিনেমা তিনি দেখেন না। মেয়েটির নাম কি রেবা? না রেখা? প্রথম অক্ষরটি কি 'র' না অন্য কিছু?

: স্লামালিকুম।

: ওয়ালাইকুম সালাম।

: ডাক্তার সাহেব এসে দেখেছেন। টগর ভাল আছে। অক্সিজেনের নল সব খুলে ফেলা হয়েছে।

: তাই নাকি?

: জ্বি।

ক্রেস্টাপেন পেনেসিলিন দেয়া হচ্ছে, দশ লাখ ইউনিট করে। এটিএসও দেয়া হয়েছে। ভয়ের কিছুই নেই। সকালের মধ্যে সে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠবে।

: আপনি এতসব জানলেন কোত্থে কে?

মেয়েটি লজ্জিত স্বরে বলল, জিজ্ঞেস করে জেনেছি। আচ্ছা আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?

: পারব না কেন? আপনি আমার বাবার সেক্রেটারী। মিলি আমাকে বলেছে। মিলি আমাকে ঠিক পছন্দ করে না।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। মিলিকে ব্যস্তভাবে আসতে দেখা গেল। বীথি সরে গেল। মিলি বিরক্তস্বরে বলল, এ মেয়েটে এতক্ষণ ধরে কি গুজ গুজ করছিলো?

: তেমন কিছু না। কথা বলছিল।

: অসুখ–বিসুখের মধ্যে তার এত কি কথা?

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে ওসমান সাহেব বললেন, টগর কেমন আছে?

: ভাল ঘুমাচ্ছে। তোমাদের জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি। এসো।

: কী এনেছিস?

: স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে এনেছি। চট করে আর কি পাব?

: তোর বর তোর সঙ্গে আসে নি?

: ও ঘুমাচ্ছিলো। জাগাই নি। টগরের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক বল? টগরের অসুখ হলেই কি আর না হলেই বা কি?

: তাই বলে কাউকে কিছু না বলে চলে আসবি?

: হুঁ আসব। এসো, খেতে এসো।

রানু সহজভাবেই স্যাণ্ডউইচ মুখে দিচ্ছে। মিলি ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছে। সেই চা ঢালা হচ্ছে। উৎসবের আমেজ চারদিকে। ওসমান সাহেব চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে অপলাকে বললেন, মজিদ সাহেবকে ডেকে নিয়ে আস। বেচারা একা ঘুর ঘুর করছে।

রানুর চেহারা থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে গেছে। সে হাসতে হাসতে পাশে বসে থাকা মোটা ভদ্রমহিলাকে কি যেন বলল। তিনিও হাসতে শুরু করলেন। এখানে যারা এসেছে এদের অনেককেই ওসমান সাহেব চেনেন না। যেমন মোটা ভদ্রমহিলা। মুখ চেনা চেনা। পারিবারিক উৎসবে ইনি নিশ্চয়ই আসেন। চৌদ্দ পনেরো বছরের চশমাপরা একটু ভাবুক ভাবুক ধরনের ছেলেকে ও দেখা যাচ্ছে একে এর আগে কোনদিন দেখেননি, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ না নিশ্চয়ই।

অপলা এসে বলল, দুলাভাই, মজিদ সাহেব আপনাকে একটু বাইরে ডাকেন।

: কেন?

: জানি না কেন। আপনি একটু আসেন। ভদ্রলোক খুব আপসেট।

মজিদ সাহেব শুকনো মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ওসমান সাহেবকে দেখেই বললেন, কাণ্ড দেখেছেন? এখন বলছে সিজারিয়ান করতে হবে। এতক্ষণ কিছু বলে নাই। হঠাৎ সিজারিয়ান।

: তাই নাকি?

: স্যার ওদের ওপর আমার ফেইথ চলে গেছে। ওর যদি সিজারিয়ান লাগেও আমি এখানে করাব না। মরে গেলেও না। আমি পিজিতে নিয়ে যাব। আপনি স্যার আমাকে একটু সাহায্য করেন।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কি সাহায্য?

www.BDeBooks.Com

: আপনাকে স্যার একটু আসতে হবে আমার সাথে। আপনি সঙ্গে থাকলে বুকে হাতীর বল হয় স্যার।

তাঁকে অবাক করে দিয়ে মজিদ সাহেব চোখ মুছতে লাগলেন। ওসমান সাহেব বিরত ভঙ্গিতে বললেন, এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন।

: নার্ভাস হচ্ছি কারণ ও বাঁচবে না।

: কেমন করে বুঝলেন?

: আমি বুঝতে পারছি।

মজিদ সাহেব শিশুদের মত ফুফিঁয়ে উঠলেন।

: আমি যাব আপনার সঙ্গে। ভয়ের কিছু নেই। আমি আমার স্ত্রীকে বলে এক্ষুনি আসছি।

টগরের পাশে রানু বসে আছে। বুড়ো মত একজন ডাক্তার টগরের কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করছেন। ওসমান সাহেব ভেতরে ঢুকতেই রানু বলল, ইনি ছেলের বাবা। খুব সম্ভব ছেলের বাবা প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল। ডাক্তার সাহেব বললেন–আপনারা শুধু শুধুই ব্যস্ত হয়েছেন। ছেলে ভাল আছে। তাছাড়া আপনারা বার বার ডিপথেরিয়া ডিপথেরিয়াই বা করছেন কেন? ডিপথেরিয়া রুগী আমি আমার ক্লিনিকে কেন রাখব?

: ওর কি হয়েছে?

: ডিপথেরিয়ার মতই একটা মেমব্রেন। ফলস মেমব্রেন। কোন রকম টক্সিসিটি এখানে হয় না। আর আপনারা রাত তিনটায় ঢাকা শহরে সমস্ত লোক নিয়ে এসেছেন।

বুড়ো ডাক্তার অসম্ভব বিরক্ত হলেন। ওসমান সাহেব বললেন, পাশের রুমের মহিলার নাকি সিজারিয়ানের প্রয়োজন হয়েছে?

: হ্যাঁ হয়েছে। বাচ্চার হার্ট বিট বেড়ে একশ পঞ্চাশ হয়েছে। বাচ্চা বের না করলে দারুণ মুশকিল। এখন আপনি দয়া করে লোকজন নিয়ে বাড়ি যান শান্তিতে ঘুমুতে চেষ্টা করুন। আমাদের খানিকটা রিলিজ দিন, কবি-সাহিত্যিক মানুষ আপনারা, বেশী কিছু বলাও মুশকিল।

ডাক্তার সাহেব বিরক্ত মুখেই ঘর ছেড়ে গেলেন। ওসমান সাহেবের মনে হলো রানু নিশ্চয়ই বেশ ফলাও করে টগরের বাবার পরিচয় ডাক্তার সাহেবকে দিয়েছে। নয়ত ডাক্তার সাহেব–'কবি সাহিত্যিক' এই শব্দ ব্যবহার করতেন না। চেহারায় তাঁকে চেনে এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশী না।

ওসমান সাহেব রানুর দিকে তাকালেন। সে এখন বেশ স্বাভাবিক। পান চিবাচ্ছে। মিলি কি পানও নিয়ে এসেছিল নাকি? ওসমান সাহেব বললেন, রানু পাশের ঘরে যে মহিলা আছে তার সঙ্গে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসব।

: তুমি যাচ্ছ কেন?

: তার হ্যাসবেণ্ড খুব নার্ভাস ফিল করছে। তার ধারণা আমি থাকলে ভর্তির ব্যাপার খুব সহজ হবে।

: নিজের ছেলের এত বড় অসুখে তুমি ওর কপালে হাত দিয়ে একবার টেম্পারেচার পর্যন্ত দেখনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকেছ। আর অজানা অচেনা এক রুগীর জন্যে দরদ উথলে উঠছে?

: দরদ-টরদের কোন ব্যাপার না। একজন লোক একা একা হাসপাতালে যেতে ভয় পাচ্ছে।

: সে ভয় পাচ্ছে তাতে তোমার কি?

: আমার কিছুই না?

: না, তোমার কিছুই না। মহাপুরুষ সাজতে যেও না। তুমি মহাপুরুষ না। সাধারণ মানুষ। লেখকরা মহাপুরুষ না।

রানুর চেঁচামেচিতে দরজার কাছে একটা ভিড় জমে গেল। তিনি ভেবে পেলেন না হঠাৎ রানুর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেলো কেন? টগর পর্যন্ত জেগে উঠেছে। ওসমান সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। মজিদ সাহেব বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বললেন চলুন যাই।

৯

হাতে একটা কমলালেবু নিয়ে টগর বসে আছে। টগরের গায়ে লাল একটা সোয়েটার। কত দ্রুতই না বড় হয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। শিশুরা বোধ হয় সময়কে পেছনে ফেলে এগুতে থাকে।

রোদ এসে পড়েছে তার চোখে-মুখে। সে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। গভীর মনোযোগে কি যেন দেখছে সে।

দরজার আড়াল থেকে রানু দৃশ্যটি দেখল। এত মন দিয়ে সে কি দেখছে! রাস্তার ওপাশে পা ছড়িয়ে একটা কুকুর রোদ পোহাচ্ছে। এছাড়া দেখার মত কোথাও কিছু নেই।

এমন অদ্ভুত হচ্ছে কেন ছেলেটা? ঘুম থেকে উঠেছে ছ'টায়, এখন বাজে দশটা। কমলা হাতে বসে আছে, একবারও বলে নি-খুলে দাও। যেন হাতে নিয়ে বসে থাকতেই আনন্দ। রানু ডাকল, টগর। সে ফিরে তাকাল এবং ফিক করে হেসে ফেলল।

: কমলা খুলে দেব?

: দাও।

: রোদে বসে আছ কেন? একটু সরে ছায়াতে বস।

টগর বাধ্য ছেলের মত সরে বসল। রানু কমলার খোসা ছড়াতে ছড়াতে বলল, এখন তোমার শরীর ভাল তাই না টগর?

: হুঁ।

: নাও কমলা নাও। দেখি কাছে আসতো, গা গরম কি না দেখি। না জ্বর নেই। টগর খোসা ছাড়ানো কমলা হাতে ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে বসল। ঠিক আগের মতই তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। রানু বলল, হাতে নিয়ে বসে আছ কেন খাও। খেয়ে আমাকে বল মিষ্টি না টক।

: মিষ্টি।

: রাস্তায় কি দেখছ তুমি?

টগর লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। সব শিশুরাই কি এমন চমৎকার করে হাসে?

না টগর একাই এমন হাসতে পারে? কি সুন্দর টোল পড়ছে চিবুকে।

রানু ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। টগর বলল, পানি খাবো।

শোবার ঘরে অপলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। তার পড়ার ভঙ্গিও অদ্ভুত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এবং হেঁটে হেঁটে না পড়লে তার নাকি পড়া মুখস্ত হয় না। কেউ যে পড়াশোনা এত সিরিয়াসলি নেয় তা রানুর জানা ছিল না। অপলার মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট এমন কিছু আহামরি নয়। কিন্তু মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছে। ক্লাসের পড়াশোনা এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু অপলার ভাবে মনে হচ্ছে সামনেই ফাইনাল। রানু বলল, টগরকে এক গ্লাস পানি এনে দে তো অপলা। দরজার পাশ থেকে রানুর নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। টগর রাস্তা থেকে কখন চোখ ফিরিয়ে নেয় তাই তার দেখার ইচ্ছা।

টগর এক চুমুক পানি খেয়েই গ্লাস সরিয়ে দিল। অপলা বলল, টগর আমাকে একটা কোয়া দে তো দেখি। মিষ্টি আছে?

: হাঁ।

: খুব মিষ্টি?

: হুঁ খুব মিষ্টি।

ওয়াক থু। তেঁতুলের মত টক। তুই এটাকে বলছিস মিষ্টি। একটা চড় খাবি।

টগর খিল খিল করে হেসে উঠল। যেন এ রকম মজার কথা সে আর শোনেনি। হাসি থামিয়ে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, খালামণি, আমাকে কোলে নাও।

: পড়া বন্ধ করে আমি এখন বাবু সাহেবকে কোলে নেই। শখ কত।

: একটু নাও।

: এখন না, পড়া শেষ হোক।

অপলা ভেতরে ঢুকে গেল। রানু তাকিয়ে আছে টগরের দিকে। টগরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে। অপলার সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ আন্তরিক। কিন্তু রানুর সঙ্গে নয়। রানুকে সে কি একটু ভয় করে? মার সঙ্গে তার কি কোন দূরত্ব তৈরি হয়েছে? রানু বলল, আমার কোলে উঠতে চাও? টগর লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। সে কি চায় নাকি? মা'র চেয়ে সেকি বাবাকেই বেশি পছন্দ করে?

: টগর!

: উঁ।

: বেড়াতে যাবে আমার সাথে?

: হুঁ।

: কোথায় যেতে চাও বল। তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানেই নিয়ে যাব। বল কোথায় যাব?

এই প্রশ্নটি উদ্দেশ্যমূলক। রানু দেখতে চায় টগর তার বাবার কাছে যাবার কথাটি কিভাবে বলে। কিন্তু শিশুরা খুব সাবধানী। জীবনের কিছু কিছু জটিলতা তারা ভালই বুঝতে পারে। টগর তার বাবার কাছে যাবার কথা কিছুই বলল না। চোখ মিটমিট করতে লাগল।

: বলো কোথায় যাবে?

: তোমার ইচ্ছা।

: আমার ইচ্ছা মানে? তোমার নিজের কোন ইচ্ছা নেই?

টগর কোন কথা বলল না। রানু বলল, বাবার কাছে যাবে? টগর তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠাট্টা ভাবছে হয়তো।

: যাবে?

সে মাথা নাড়াল। রানু বলল,–মাথা নাড়ানাড়ি নয়। পরিষ্কার করে বল। যাবে?

: হুঁ।

: ঠিক আছে নিয়ে যাব। তোমাকে ও বাড়িতে রেখে চলে আসব। যতক্ষণ ইচ্ছা তুমি থাকবে। তারপর তোমার বাবা তোমাকে দিয়ে যাবো!

টগর তাকিয়ে আছে উজ্জ্বল চোখে। শিশুরা মনের মধ্যে অনেক কিছু পুষে রাখে। বাবার কাছে যাওয়াটা যে টগরের কাছে এত বড় একটা ব্যাপার তা সে কখনো বুঝতে দেয়নি।

রানু এ বাড়িতে প্রায় ছ'মাস পড়ে এসেছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তার মন খারাপ হল। সব কিছু অবিকল আগের মত আছে। কিছুই বদলায় নি। সে কি আশা করছিল এই ছ'মাসে সব বদলে যাবে?

আকবরের মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের রিকশা থেকে নামতে দেখছে। রানুকে দেখে সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। কিংবা বিশ্বাস করলেও এতই হকচকিয়ে গিয়েছে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এমন সময় সে সম্বিৎ ফিরে পেল। প্রায় পাগলের মত সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে লাগল। রানুর প্রতি মূহুর্তে ভয় হচ্ছিল–সে সিঁড়িতে একটি পতনের শব্দ শুনবে এবং আকবরের মা বালির বস্তার মত গড়িয়ে পড়বে। রানু টগরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। টগর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। যেন এই মূহুর্তে তার মাকে প্রয়োজন নেই।

ওসমান সাহেব বাসায় নেই। রানু খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। কি অবস্থা হয়ে আছে বাড়ির। মশারি তোলা হয়নি, ঘরময় সিগারেটের ছাই। এক গাদা বই বিছানায় ছড়ানো। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। এখনো নেভানো হয়নি।

: ঘরের এ অবস্থা কেন আকবরের মা?

আকবরের মা প্রশ্নটা না শোনার ভান করলো।

: এ ঘর কতদিন ধরে এরকম?

: কালকেই পরিষ্কার করছি। একদিনে এই অবস্থা।

: ও গিয়েছে কখন?

: খুব ভোরে। নাস্তাও খায় নাই।

: এতক্ষণ তুমি কি করছিলে? কোন ভদ্রলোকের বাড়ি সকাল বেলা এ রকম থাকে? কি আশ্চর্য।

রানুর বিরক্তির সীমা রইল না। যদিও এ বাড়ি অপরিষ্কার থাকলে তার কিছুই যায় আসে না। তবু এ রকম একটা অবস্থা সহ্য করা মুসকিল। বাথরুমে ভেজা কাপড় ছড়ানো। বেসিন নোংরা হয়ে আছে। রানু বলল, ও আসবে কখন?

: আফা, কিছুই কইয়া যায় নাই।

: ঘর–দোয়ার যে এরকম করে রাখ সে কিছু বলে না?

আকবরের মা চুপ করে রইল।

www.BDeBooks.Com

: জীতু মিয়া কোথায়?

: বাজারে গেছে।

সমস্ত ঘর আজ পরিষ্কার করবে। পানি দিয়ে মুছবে। কার্পেট রোদে দিবে। বাথরুম পরিষ্কার করবে।

: জ্বী আইচ্ছা।

আকবরের মা হেসে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাসি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। সেকি ভাবছে রানু ফিরে এসেছে? বসার ঘরে টেলিফোন বাজছে। আকবরের মা টগরকে কোলে নিয়ে ঘুরছে। রানু বিরক্ত মুখে বলল, টেলিফোন ধরছ না কেন?

: টেলিফোন ধরতে আমাকে নিষেধ করছে।

: কেন? নিষেধ করছে কেন?

: মিলা আফা রোজ টেলিফোন করে। ভাইজান রাগ হইছে।

: ছোট বোন টেলিফোন করলে রাগ করবে কেন? এসব কি ধরনের কথা?

রানু এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল। মিলিই করেছে। মিলি অবাক হয়ে বলল,-কে ভাবী?

: হ্যাঁ।

: তুমি এখানে কেন?

: টগরকে নিয়ে এসেছি। কাঁদছিল।

: তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে ভাবী, তুমি থাক কিছুক্ষণ। আমি আসছি।

: আমি বেশীক্ষণ থাকব না মিলি। আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।

: ঠিক আছে ভাইয়াকে দাও। তার সঙ্গে আমার খুব দরকারী কথা।

: ও তো বাসায় নেই।

: ভাবী শোন, ভাইয়া আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে কেন? টেলিফোন করলেই সে রিসিভার নামিয়ে রাখে। বাসায় বলে দিয়েছে আমি টেলিফোন করলে বলতে সে বাসায় নেই। সে এরকম করছে কেন?

: তোমার ভাই তুমি ভাল বলতে পারবে।

: বাবুর জন্যে একটা নাম চাচ্ছি দু'মাস ধরে। প্রথম অক্ষর হবে ম, এটা দিচ্ছে না। শুধু ঘুরাচ্ছে।

: তার কাছ থেকে নাম দিতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। তোমরা একটা নাম দিয়ে দাও।

: তুমি বুঝতে পারছ না ভাবী,-আমি সবাইকে বলেছি আমার ভাই নাম রাখছে। এখন তার আকিকা হচ্ছে সামনের মাসে তিন তারিখ, এগারো দিন মোটে আছে।

মিলি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর পরই রানু শুনল মিলি কাঁদছে। রানু বিরক্ত স্বরে বলল,-কাঁদছ কেন তুমি? এখানে কাঁদার মত কি হল? মিলি ধরা গলায় বলল, গতকাল সকাল বেলায় টেলিফোন করেছিলাম, ভাইয়া বলল,-নাম রাখ মাকাল। ম দিয়ে শুরু। রানু বেশ অবাক হল। এরকম নীচ ধরনের রসিকতা করবার লোক সে নয়। এবং মিলিকে সে যথেষ্টই পছন্দ করে। তাহলে এরকম

কথা বলার মানে!

: রানু বলল,-মিলি, তুমি নিজে একটা সুন্দর নাম রাখ, তারপর সবাইকে বল তোমার ভাই এই নাম রেখেছে। ঠিক আছে?

: আচ্ছা

: এখন তাহলে রাখি?

: তুমি নিজেও আমাকে দশ বারটা নাম দিবে ভাবী। ম দিয়ে শুরু হবে। এবং তিন অক্ষরে হবে।

: এত বাধ্যবাধকতা কেন? নামের মত সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত রকম কণ্ডিশন দেয়া ঠিক না।

: নামে কিছু না আসলে গেলে তুমি তোমার ছেলের জন্য এত সুন্দর নাম রাখলে কেন?

: আমি রাখিনি তোমার ভাইয়ের নাম।

: সে তার নিজের ছেলের জন্যে রাখবে আর আমার বাবুর জন্যে রাখবে না কেন?

রানু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মিলি বড় ঝামেলা করে। তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা মানেই হচ্ছে সমস্তটা দিন মাটি। তাও একবারে তার কথা শেষ হবে না। টেলিফোন নামিয়ে রাখার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার রিং করবে।

: আফা আপনার চা।

শুধু চা নয় সঙ্গে বিসকিট চানাচুর। একটা ট্রেতে করে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে এনেছে। রূপোর ট্রে। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কতবার বলেছি এই ট্রেটা কখনো বের করবে না। বলি নি?

আকবরের মা জবাব দিল না।

: টগর কোথায়?

: ঘুমাইতাছে।

: এখন ঘুমাচ্ছে কি? এখন ঘুমাবার সময়?

: নিজে নিজে গিয়া বিছানায় শুইছে। এখন গিয়াদেখি ঘমাইতাছে। আবুর ঘুমের মইধ্যে হাসে।

টগর শুয়েছে তার ছোট খাটে। আরাম করে ঘুমুচ্ছে। নিজের বাড়িতে ফিরে আসার আনন্দেই ঘুম এসে গেছে বোধ হয়। রানু টগরের কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখল-গা ঠাণ্ডা। সে মৃদু স্বরে ডাকল-টগর, বাড়ি যাবে না? টগর জবাব দিল না। সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে, ভান নয়।

: আফা বাজার আসছে।

: বাজার আসছে ভাল কথা, আমাকে ডাকছ কেন?

: কি রানমু কন।

: রোজ দিন যা রাধ তাই রাধবে। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? ঘর পরিষ্কার করেছ?

: জ্বি না।

: আগে ঘর ঠিকঠাক কর। এ রকম নোংরা বাড়িতে আমি দাঁড়িয়েই থাকতে পারছি না। গা ঘিন ঘিন করছে।

আকবরের মা ভয়ে ভয়ে বলল–আফা আপনে দুপুরে খাইতেন না?

: না আমি দুপুরে খাব না। টগরের ঘুম ভাঙ্গলেই চলে যাব।

: বাজার দেখতেন না?

জীতু মিয়া পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল। রানু বলল, কেমন আছিস তুই? দেখি এদিকে আয় তো। জীতু মিয়া এগিয়ে এসে টিপ করে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

টগর নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। রানু তার পাশে কিছুক্ষণ বসল। তারপর বারান্দায় গিয়ে বসল খানিক্ষণ। এখানে কিছু ফুলের টব ছিল। দুটি রজনীগন্ধার ঝাড় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। পানি–টানি দেয়া হয় না।

: ঘুমাইতাছে।

: এখন ঘুমাচ্ছে কি? এখন ঘুমাবার সময়?

: নিজে নিজে গিয়া বিছানায় শুইছে। এখন গিয়াদেখি ঘমাইতাছে। আবুর ঘুমের মইধ্যে হাসে।

টগর শুয়েছে তার ছোট খাটে। আরাম করে ঘুমুচ্ছে। নিজের বাড়িতে ফিরে আসার আনন্দেই ঘুম এসে গেছে বোধ হয়। রানু টগরের কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখল–গা ঠাণ্ডা। সে মৃদু স্বরে ডাকল–টগর, বাড়ি যাবে না? টগর জবাব দিল না। সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে, ভান নয়।

: আফা বাজার আসছে।

: বাজার আসছে ভাল কথা, আমাকে ডাকছ কেন?

: কি রানমু কন।

: রোজ দিন যা রাধ তাই রাধবে। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? ঘরদোর পরিষ্কার করেছ?

: জ্বি না।

: আগে ঘর ঠিকঠাক কর। এ রকম নোংরা বাড়িতে আমি দাঁড়িয়েই থাকতে পারছি না। গা ঘিন ঘিন করছে।

আকবরের মা ভয়ে ভয়ে বলল–আফা আপনে দুপুরে খাইতেন না?

: না আমি দুপুরে খাব না। টগরের ঘুম ভাঙ্গলেই চলে যাব।

: বাজার দেখতেন না?

জীতু মিয়া পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল। রানু বলল, কেমন আছিস তুই? দেখি এদিকে আয় তো। জীতু মিয়া এগিয়ে এসে টিপ করে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

টগর নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। রানু তার পাশে কিছুক্ষণ বসল। তারপর বারান্দায় গিয়ে বসল খানিক্ষণ। এখানে কিছু ফুলের টব ছিল। দুটি রজনীগন্ধার ঝাড় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। পানি–টানি দেয়া হয় না।

ওসমান সাহেব বারটার দিকে এলেন। কিছু কিছু মানুষ কখনও অবাক হয় না। তিনিও কি সে রকম? রানুকে চেয়ার পেতে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে একটুও অবাক না হয়ে বললেন, কেমন আছ?

: ভাল।

: টগরকে নিয়ে এসেছ?

: হ্যাঁ। ঘুমুচ্ছে।

: শরীর ঠিক আছে তো?

: ঠিকই আছে?

তিনি লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, তুমি আসবে জানলে ঘর–দোয়ার ঠিকঠাক করে রাখতে বলতাম। আঁস্তাকুড় বানিয়ে রেখেছে।

: এদের কিছু বল না কেন?

: প্রথম প্রথম বলতাম। এখন বলি না। মানুষের এক সময় সবকিছুই অভ্যেস হয়ে যায়।

: কিছু কিছু জিনিস অভ্যাস হওয়া ঠিক না। নোংরামি হচ্ছে তার মধ্যে একটা।

তিনি অল্প হাসলেন। হাসি মুখেই বললেন, তুমি না এলে আজ তোমার ওখানে যেতাম। যদিও আজ বুধবার না। তবে আজকের দিনটা ইম্পর্টেন্ট। আমার একটা বই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ হবে বলে খবর পাওয়া গেছে। ফাইনাল কিছু না অবশ্যি।

: কোন বইটা?

: আন্দাজ কর তো কোনটা?

রানু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, চা–টা কিছু খেয়েছ?

: হুঁ।

: আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে কেমন হয় রানু? রাতে কোন একটি ভাল রেস্টুরেন্টে......

রানু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল, মিলি টেলিফোন করেছিল। সে তার বাবুর জন্যে একটা নাম চেয়েছে আর তুমি বলেছ ম্যাকাল নাম রাখার জন্যে, এর মানে কি?

ওসমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন,–এ রকম ক্রুয়েল রসিকতা কারো সঙ্গেই করি না। মিলি বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলে। ওর কথা বাদ দাও। আমার প্রশ্নের জবাব দাও। থাকবে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত?

মিলি চুপ করে রইল। ওসমান সাহেব বললেন,–আমি কখনো তোমার কাছে বেশী কিছু চাইনি, চেয়েছি?

: এত প্যাচালো প্রশ্নের দরকার নেই। যা বলতে চাও সরাসরি বল?

তিনি নরম করে বললেন, তুমি থাকবে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত?

: না। এখানে এসেছি বলেই তুমি অন্য রকম ভাবতে শুরু করেছ। অন্য রকম ভাবার কোন কারণ নেই। আমি যা করেছি খুব ভেবে–চিন্তে করেছি। আমি কোন খুকী না। হুট করে কিছু করার বয়স আমার না।

ওসমান সাহেব অল্প হাসলেন। রানু ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, হাসছ কেন?

: তোমার রাগ দেখে হাসছি। অনেকদিন রাগতে দেখি না তোমাকে।

রানু বলল, আমি এখন উঠব। তুমি যদি তোমার ছেলেকে রাখতে চাও রাখতে পার।

: না, রাখতে চাই না। মাঝরাতে তোমার জন্যে কাঁদতে শুরু করবে।

: ভুলেই গিয়েছিলাম বাচ্চাদের কান্না তো তুমি আবার সহ্য করতে পার না।

www.BDeBooks.Com

তোমার সুক্ষ্ম অনুভূতি আহত হয়। লেখা আটকে যায়।

: লেখা আমার এম্নিতেই আটকে গেছে। একটি লাইনও লিখতে পারছি না।

: সাহিত্যের তো তাহলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

ওসমান সাহেব ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, এখন তো আমরা দু'জন দু'প্রান্তের মানুষ। তুমি এসেছ বেড়াতে। কাজেই আমরা কি এখন সহজ ভাবে গল্প-টল্প করতে পারি না?

রানু চুপ করে রইল।

: তোমার অফিস কেমন চলছে রানু?

: ভালই

: চাকরি মনে ধরেছে?

: মনে ধরাধরির কি আছে? চাকরি কি স্বামী নাকি যে মনে ধরতে হবে?

ওসমান সাহেব প্রায় নিশ্চিত মনে ছিলেন রাতের খাবার পর্যন্ত রানু থাকবে। কিন্তু সে থাকল না।

১০

মিলি সেজেগুজে বেরুচ্ছিল। তার শাশুড়ি, সুরমা তাকে ডাকলেন। সুরমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু এখনো তাঁর মাথার চুল পাকে নি। চামড়ায় ভাজ পড়েনি। ভদ্র মহিলা ছোটখাট। কথা বলেন নিচু গলায় কিন্তু যা বলেন খুব স্পষ্ট করে বলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তিনি এ সংসারের সর্বময় কর্তী। এবং আরো দীর্ঘদিন তাঁর কর্তৃত্ব থাকাবে।

মিলি শাশুড়িকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। সে সুরমাকে বেশ ভয় করে। সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ মা?

: এই একটু বাইরে যাচ্ছি, এসে পড়ব।

: যখন তখন হুট হাট করে বাইরে যাওয়া ঠিক না।

মিলি কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। সুরমার মনের ভাব ঠিক ধরা যাচ্ছে না। তিনি কথা বলছেন মিষ্টি গলায়। আদর করার ভঙ্গিতে।

: তুমি মা একা একা বেড়াও। এই শহর কি একা একা ঘুরে বেড়ানোর শহর? এখন যাচ্ছ কোথায়?

: বাবার কাছে যাব। তার শরীরটা ভাল না। খুব জ্বর।

সুরমা তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। মিলি হড়বড় করে বলল,

একশ চার পর্যন্ত উঠেছিল। মাথায় পানি-টানি ঢেলে রক্ষা। এই বয়সে এ জ্বর ওঠা খুব খারাপ।

: কিন্তু কাল তো কিছু বলনি। কাল গিয়েছিলে না তার ওখানে?

মিলি আমতা আমতা করে বলল, কাল বলতে মনে ছিল না।

সুরমা শীতল কণ্ঠ বের করলেন। কিন্তু শীতল হলেও গলার স্বরের আদুরে ভঙ্গিটি নষ্ট হল না।

: ঠিক আছে মা, যাও বাবাকে দেখে আস। ছেলেমেয়ে বাবাকে না দেখলে কে দেখবে?

: তা তো ঠিকই। তাছাড়া বাবা একা মানুষ। সব সময় চিন্তা-ভাবনা করেন। আমাদের নিয়ে তাঁর খুব চিন্তা।

সুরমা গভীর হয়ে বললেন, এটা তো মা ঠিক বললে না। বেয়াই সাহেব চিন্তা-ভাবনা নিশ্চয়ই করে কিন্তু তোমাকে নিয়ে না। যতদিন বিয়ে হয়েছে একদিন এসেছেন তোমাকে দেখতে? নাতনী হবার খবর পেয়েও তো আসেননি।

: বাবার গাড়িটা মা নষ্ট। তিনি একে বারে অচল।

: যাদের গাড়ি নেই তারা বুঝি চলাফেরা করে না?

মিলি এর কি উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। সুরমা হাসি মুখে বললেন, তোমার বাবা যেমন তোমার লেখক ভাইও সে রকম। সেও তো আসে না। তারও বুঝি গাড়ি নষ্ট?

: ভাইয়ার তো গাড়ি নেই মা। ও রিকশাতেই ঘোরাফেরা করে। খুব অসামাজিক তো, তাই কোথাও যায় না। লেখক মানুষ, নিজের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে থাকে। ভাইয়ার কোন দোষ ধরা ঠিক না মা। সে তো আর আমাদের মত সাধারণ মানুষ না।

: তা তো ঠিকই। সাধারণ কেন হবে। ঠিক আছে মা যাও ঘুরে আস। তোমার দেরী করিয়ে দিলাম।

মিলির মনটাই খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবল যাবে না কোথাও। ঘরে শুয়ে থাকবে। কিন্তু দুপুরে সে ঘুমুতে পারে না। বিছানায় গড়াগড়ি করতে খুব খারাপ লাগে। কারো সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানোরও উপায় নেই। ননদ গিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। আগে সে দুপুর নাগাদ ফিরে আসত। এখন ফিরছে না। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আসছে। তার হাবভাবে কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা। মিলির ধারণা তার এই বোরকাওয়ালির কোন একটা ছেলের সঙ্গে ভাব-টাব হয়েছে। হয়ত লাইব্রেরীর বারন্দায় বসে আড্ডা দেয়। তখনো বোরকা থাকে কি না এটা মিলির দেখার শখ। কিন্তু ভর দুপুরে ইউনিভার্সিটি এলাকায় যেতে ভয় ভয় লাগে বলে যাওয়া হয় না।

আজ সে রিকশা নিয়ে শাহবাগ চলে গেল। একটা স্ন্যাকবারে ঢুকে ঠাণ্ডা পেপসি খেল, যদিও তার মোটেও তৃষ্ণা হয়নি। সেখান থেকেই দেখল ছেলেমেয়ে নিয়ে দুটা ফ্যামিলি ঢুকছে মিউজিয়ামে। মিলি এখনো এই মিউজিয়াম দেখেনি, কাজেই যে মিউজিয়াম দেখতে গেল। দোতালায় রাজা-মহারাজাদের পালঙ্ক দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ সময় সে ঘুর ঘুর করল পালঙ্কের আশে পাশে। এক বিদেশিনী পালঙ্কের ছবি তুলছিল। মিলির ইচ্ছা হল বলে-"দয়া করে আমারও একটা ছবি তুলে দেন না।" ইংরেজীতে এটা কিভাবে বলতে হবে বুঝতে না পারার জন্যে শেষ পর্যন্ত বলতে পারল না। তবে সে ঘুরতে লাগল বিদেশিনীর সঙ্গে সঙ্গে।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসবার মুখে রিসিপশনের মেয়েটিকে বলল, আমার একটা টেলিফোন করা খুব জরুরী কোত্থেকে করতে পারি বলতে পারেন? এখন একটা টেলিফোন করতে না পারলে বিরাট বিপদ হয়ে যাবে।

মিলি তার মুখ এতই করুণ করে ফেলল যে তার নিজেরই কান্না পেয়ে যেতে লাগল। এবং এক সময় সত্যি সত্যি চোখে পানি এসে গেল। রিসিপশনিস্ট

মেয়েটি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাকে টেলিফোন জোগাড় করে দিল। সে ডায়াল ঘুরিয়ে হাসি মুখে বলল, কেমন আছ ভাইয়া? ঘুমুচ্ছিলে নাকি? না? তাহলে কি লিখছিলে? বলতো কোত্থেকে ফোন করছি? একশ টাকা বাজি, বলতে পারবে না। যে জায়গা থেকে করছি তার প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'ম'। কি আন্দাজ করতে পারছ?

রিসিপশনিষ্ট মেয়েটি অবাক হয়ে মিলির কথাবার্তা শুনতে লাগল।

১১

রাত এগারোটার সময় নবী এসে উপস্থিত। তার চোখ রক্তবর্ণ। কথাবার্তা অসংলগ্ন। ঠিকমত দাঁড়াতেও পারছে না। জীতু মিয়া বলল, সায়েব ঘুমাইতেছে। নবী ধমকে উঠল।

: ডেকে তোল। বল গিয়ে নবী এসেছে।

জীতু মিয়া ডেকে বলবে সে রকম ভরসা বোধ হয় তার হল না। নবী গলা উঁচিয়ে ডাকল,–ওসমান।

ওসমান সাহেব বাতিটাতি নিভিয়ে সত্যি সত্যি শুয়ে পড়েছিলেন। হাকডাকে বেরিয়ে এলেন।

: ওসমান, হাউ আর ইউ?

: ভাল। আপনার অবস্থা?

: অবস্থা তো দেখতেই পারছেন। খুব ভাল না। বসতে পারি?

: হ্যাঁ পারেন।

: বেশীক্ষণ বিরক্ত করব না। ঘুমুচ্ছিলেন শুনলাম। কোন লেখক রাত এগারোটায় ঘুমোয় বলে জানতাম না। রাত হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটির সময়। রাতে ঘুমুবে ননক্রিয়েটিভ লোক।

নবী সোফায় বসল। পরক্ষণেই সোফা বদলে বেতের চেয়ারে বসল। সেটিও পছন্দ হচ্ছিল না বোধ হয়। বিরক্ত ভঙ্গিতে শরীর নাড়াচ্ছে। ওসমান সাহেব বললেন, চায়ের কথা বলব? কিংবা কোন খাবার-দাবার?

: না। কফি থাকলে দিতে পারেন। নেশাটা কমানো দরকার। সুস্থ মাথায় আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। আপনি বসুন।

ওসমান সাহেব বসলেন। ঘরে কফি নেই। কফির কথা বলা হল না। নবী ঠিক কি বলতে এসেছে বুঝতে পারছেন না। অনুমান করতেও চেষ্টা করলেন না। নবীর ব্যাপারে আগেভাগে কিছু অনুমান করা মুশকিল।

নবী সিগারেট ধরাল। গম্ভীর হয়ে বলল, একটা সায়েন্স ফিকশন লেখার কথা ভাবছি। আইডিয়াটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।

সায়েন্স ফিকশনের আইডিয়া নিয়ে আলাপ করবার জন্যে কেউ দুপুর রাতে অন্যের বাড়ী যায় না। ওসমান সাহেবের মনে হল এটা হচ্ছে প্রস্তাবনা। এরপরে আসল কথা আসবে।

: আইডিয়াটা এ রকম-একটি গ্রহের কথা আমি বলব। সেই গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয়েছে অদ্ভুতভাবে। সেখানে পুরুষ এবং নারী বলে কিছুই নেই। যৌনতার ব্যাপারটি নেই। সবাই জীবনের এক পর্যায়ে গর্ভধারণ করে। ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র

এদের মৃত্যু হয়। কাজেই সে গ্রহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন ব্যাপার নেই।

: গর্ভধারণের ব্যাপারটিই হয় কিভাবে?

সেটা নিয়ে এখনও ভাবিনি। তবে যৌন মিলনের কোন ব্যাপার নেই। আইডিয়া হিসেবে আপনার কাছে কেমন লাগছে?

: ভালই।

: শুধু ভালই বলাটা ঠিক হল না। এই গল্পে নতুন ধরনের জীবনযাত্রা, নতুন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা আমি আনব। এ ধরনের একটি আইডিয়াকে শুধু ভালই বলে চালান ঠিক নয়। আপনি বলুন-খুব চমৎকার আইডিয়া।

: খুব চমৎকার আইডিয়া।

নবী উঠে দাঁড়াল-আপনার বাথরুমটা ব্যবহার করতে চাই।

: আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

: হুইস্কি আমার সহ্য হয় না। বমি করতে হবে। দামী একটা নেশা বমি করে নষ্ট করাটা ক্রাইম। কিন্তু উপায় নেই।

নবী বাথরুম থেকে বের হতে অনেক দেরী করল। ওসমান সাহেব আকবরের মাকে দিয়ে লেবু চা বানালেন। নেশা উগরে দেওয়ার পর চা খেতে হয় তো ভাল লাগবে। নবী চা খেল না। কোট কাঁধে ফেলে বলল, আমি এখন যাব।

: চা খাবেন না?

: না, আগেই তো বলেছি খাব না।

ওসমান সাহেব নবীকে এগিয়ে দেবার জন্যে রাস্তা পর্যন্ত এলেন। নবীর লাল রংয়ের ওপেল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। যে ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না সে গাড়ি চালিয়ে যাবে- ভাবতেই অস্বস্তি বোধ হয়।

নবী ড্রাইভিং সিটে বসে সে হঠাৎ বলল,-মনিকার সঙ্গে কি আজ সারাদিনে আপনার কোন যোগাযোগ হয়েছে?

: না।

: টেলিফোনেও কোন কথা হয় নি?

: না। কেন?

নবী গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। নিচু গলায় বলল,-মনিকার স্বামী মারা গেছে। আমার ধারণা ছিল সে আপনাকে জানিয়েছে।

: কবে মারা গেছে?

: কবে মারা গেছে জানি না। মনিকা খবর পেয়েছে আজ ভোরে। আমি দেখতে গিয়েছিলা। খুব কান্নাকাটি করছিল।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। মনিকা খুব কান্নাকাটি করছে এই দৃশ্যটি তিনি কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন। সে চেঁচিয়ে নিশ্চয়ই কাঁদবে না, কিংবা কে জানে হয়ত চেঁচিয়েই কাঁদবে। একটি অত্যন্ত রূপসী মেয়ে কাঁদছে দৃশ্যটি কল্পনায় চমৎকার কিন্তু বাস্তবে কুৎসিত। বেশ কিছু সুন্দরী মেয়েকে তিনি কাঁদতে দেখেছেন। তার কাছে কখনও ভাল লাগে নি।

নবী বললো,-আমি ঠিক স্টেডি ফিল করছি না। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আজ রাতটা আপনার ঘরে কাটিয়ে দেয়া যাবে?

: যাবে। আসুন।

www.BDeBooks.Com

নবী গাড়ি লক করে দোতালায় উঠে এল–খুব সহজভাবেই বলল, কাউকে বলুন গরম পানি করে দিতে, আমি একটা হট সাওয়ার নেব। একটা স্যাণ্ডুইচ বা এই জাতীয় কিছু দিতে বলুন। ভাল কথা, আমার শোবার ঘরে কিছু কাগজ রাখবেন। মাঝেমধ্যে শেষ রাতের দিকে আমার লিখতে ইচ্ছা করে।

ওসমান সাহেব মৃদু হাসলেন। উপহাসের হাসি কিনা ঠিক ধরা গেল না।

: ওসমান সাহেব।

: বলুন।

: আসুন একটা কাজ করা যাক–সায়েন্স ফিকশনের যে আইডিয়াটা আপনাকে বললাম তার উপর আপনি একটি লেখা তৈরী করুন আমিও একটি করি।

: কেন?

: কে আইডিয়া কেমন খেলাতে পারে তাই দেখা, এর বেশী কিছু নয়। আপনি যা ভাবছেন তা না।

: আমি কি ভাবছি?

: আপনি ভাবছেন এটা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার। তা নয়। এ দেশে আমি কাউকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না।

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, আপনার বিছানা তৈরী আছে, আসুন ঘর দেখিয়ে দিই। নবী রুক্ষ স্বরে বলল–আপনি কি আমার উপর বিরক্ত?

: না, আমি সহজে বিরক্ত হই না।

: তাহলে আমার আইডিয়া নিয়ে আপনি লিখতে চান না?

: না।

ওসমান সাহেব ঘুমুতে গেলেন অনেক রাতে। নবী প্রচুর ঝামেলা করল। গরম পানি দিয়ে গোসল করল। চা খেল। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হো হো করে হাসল–নিউজ কিভাবে দেয় দেখেছেন? চাচার হাতে ভাতিজা খুন। চাচার হাতে খুন লিখলেই তো বুঝা যায় ভাতিজা খুন হয়েছে। কি দরকার ভাতিজা খুন লেখা।

খবরের কাগজ পড়া শেষ হবার পর সে টেলিফোন নিয়ে বসল। রাত তখন দেড়টা। এই গভীর রাতে কাকে যেন ঘুম থেকে তুলে ধমকাতে শুরু করল। পরক্ষণেই অন্য কাউকে টেলিফোন করে মজার মজার সব কথা বলে খুব হাসতে লাগল।

ওসমান সাহেব জেগে রইলেন অনেক রাত পর্যন্ত। ঘুমের অনিয়ম হয়েছে। সারারাত হয়ত জেগে থাকতে হবে। একা একা জেগে থাকা একটা যন্ত্রণার ব্যাপার। পাশের কামরায় নবী অবশ্যি এখনও জেগে। কি সব খুটখাট করছে তবু একা একাই লাগছে নিজেকে।

তিনি মশারীর ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। মশারীর ভেতর সিগারেট খাওয়া রানু খুব অপছন্দ করত। কিন্তু এর মধ্যে একটি মজার ব্যাপার আছে ধোঁয়া আটকে থাকে মশারীর ভেতর। যেন সাদা মেঘ চারপাশে জমতে শুরু করেছে। বিশাল মেঘের টুকরো নয় ছোট্ট একটি নিজস্ব মেঘ। এবং এটিকে তৈরী করেছেন নিজেই।

ওসমান সাহেব সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন ঠিক এই

মুহূর্তে এ শহরে কতজন মানুষ জেগে আছে। জেগে আছে না বলে বলা যাক–ঘুমুতে পারছে না। চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। একদল জেগে আছে ক্ষুধার যন্ত্রণায়। অন্য আরেক দল রোগ যন্ত্রণায়। বাকিরা সবাই সৌখিন নিশি যাপনকারী। তিনি, নবী সাহেব এবং মনিকা।

মনিকা নিশ্চয়ই জেগে আছে। এবং নবীর কথা অনুযায়ী ধরে নিতে হয় খুব কান্নাকাটি করছে। এখনও কি কাঁদছে? মেয়েদের কান্নার ব্যাপারে তাঁর একটা মজার অবজারভেশন আছে। কিশোরীরা কাঁদে লুকিয়ে। যুবতীরা কাঁদে প্রকাশ্যে। প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরা আশেপাশে বেশ কিছু মানুষজন না থাকলে কাঁদতেই পারে না।

রানু তাঁর এ কথায় খুব রেগে গিয়েছিল। থমথমে মুখে বলেছিল, কি ভাব তুমি মেয়েদের মেয়েদের ছোট করে দেখবার একটা প্রবণতা আছে তোমার মধ্যে। এর মধ্যে ছোট করে দেখবার কি আছে তিনি বুঝতে পারেন নি। রানুর হঠাৎ রেগে যাওয়া দেখে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছেন।

রানু কখন থেকে তাঁকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে? বিয়ের পর পরই কি? দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকলে দু'জনের ভেতরে ক্রমে ক্রমে ভালবাসা জন্মাতে থাকে। তাদের মধ্যে সে রকম হয় নি। রানু তাঁর প্রতিটি ব্যাপারে বিরক্ত হতে শুরু করল গোড়া থেকেই।

মশারীর ভেতরে মেঘ তৈরী করছ? এই সব হালকা ধরনের কথা বলে আমাকে ভুলাতে চাও কেন? বল, তোমার আলসী লাগছে।

ওসমান সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে, চারটা দশ বাজে। কিছুক্ষণের ভেতর আকাশ ফর্সা হতে শুরু করবে। তিনি বসার ঘরে এলেন। নবীর দরজা হাট করে খোলা। সে এই শীতেও খালি গায়ে চেয়ারে বসে দ্রুত লিখছে। চমৎকার একটি দৃশ্য। তিনি দীর্ঘদিন কিছু লিখতে পারছেন না।

নবী চোখ তুলে একবার দেখল। অত্যন্ত সহজ গলায় বলল, সায়েন্স ফিকশনটা নামিয়ে দিচ্ছি।

: ভাল।

: আজ সারাদিন চালাব। ননষ্টপ, ফ্লো এসে গেছে। কাইন্ডলি কফির ব্যবস্থা করুন।

: কফি নেই চা খেতে পারেন।

: হোক। চা–ই হোক।

তিনি নিজেই চা বানাতে গেলেন। হাতের কাছে কিছুই পাওয়া গেল না, চিনির পট, দুধের কৌটা কিছুই নেই। সংসার অগোছালো হয়ে গেছে। অগোছালো এবং অপরিচ্ছন্ন। রান্না ঘরের বেসিনের উপর রাতের থালাবাটি পড়ে আছে। টক টক একটা গন্ধ ছাড়ছে। আকবরের মাকে আজ কিছু কড়া কড়া কথা বলতে হবে।

: কি ওসমান সাহেব। আপনার চা কোথায়?

: একটু দেরী হবে। আকবরের মা উঠুক ঘুম থেকে।

: ডেকে তুলুন না। ডেকে তুললেই হয়।

নবী উঠে এসে উঁচু গলায় ডাকতে লাগল, এ্যাই এ্যাই।

আকবরের মা ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

: জলদি চা বানাও। তুরন্ত। চা বানানো হয়ে গেলে গরম পানি করবে। আই

উইল টেক এনাদার হট বাথ।

ওসমান সাহেব দেখলেন নবীর চোখ মুখ উজ্জ্বল। লেখার কাজ নিশ্চয়ই ভাল হচ্ছে। নবী বলল,

: প্রথম কয়েক পাতা শুনবেন নাকি? পড়ে শুনাতে পারি।

: আপনি শেষ করুন। তারপর শুনব।

: সন্ধ্যা নাগাদ শেষ হবে। আমি কি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে পারি? এখন জায়গা বদল করতে চাই না।

: নিশ্চয়ই থাকতে পারেন।

: আপনি কফির ব্যবস্থা করবেন?

: হ্যাঁ করব।

সকাল আটটার দিকে ওসমান সাহেব বের হলেন। নবীকে কিছু বলে গেলেন না। কোথায় যাবেন কিছু ঠিক নেই। একবার কলেজে যাওয়ার দরকার। শারীরিক কারণে তিন মাসের ছুটি নেয়া আছে। সেই ছুটি বাড়িয়ে ছ'মাস করতে চান।

রাস্তায় নেমেই ভাবলেন চাকরিটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? মন বসছে না। একদল ছাত্র তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তিনি কথা বলবেন। তাঁরা নোট নেবে। হাই তুলবে। তাদের চোখে–মুখে থাকবে অপরিসীম ক্লান্তি। ভাল লাগে না। এতটুকুও ভাল লাগে না।

রাস্তায় একটা মিছিল বের হয়েছে। নির্জিব মিছিল। একদল রোগা ও ক্লান্ত মানুষ চিকন গলায় চেঁচাচ্ছে, দিতে হবে দিতে হবে। ঢাকা শহরের মিছিলগুলি সহজেই জমে যায়। ছোট একটি মিছিল দেখতে দেখতে ফুলেফেঁপে ওঠে। সমুদ্র গর্জনের মত শব্দ উঠতে থাকে। কিন্তু এই মিছিলটি ক্রমেই যেন প্রাণ হারিয়ে ফেলছে। প্রথম দিকের একজন নেতা গোছের কেউ মিছিল ভেঙ্গে পান কিনতে এল।

ওসমান সাহেব মিছিলের পেছনে হাঁটতে লাগলেন। রোদ ভালই লাগছে। শীতের সকালের রোদের মত ভাল জিনিস আর কি হতে পারে? তাঁর প্রথমদিকের একটি উপন্যাসে শীতের রোদকে তুলনা করেছিলেন শিশুর আলিঙ্গনের সঙ্গে। শিশুর দেহের ওম ওম ভাবটি আসে শীতের রোদ থেকে। অতি বাজে ধরনের তুলনা।

: আরে আপনি এখানে?

তিনি তাকিয়ে দেখলেন চশমা পরা একটি রোগা ছেলে। মাথা ভর্তি লম্বা চুল। কোন তরুণ কবি বা গল্পকার হবে।

: আমাকে চিনতে পারছেন তো?

তিনি একটি পরিচিতের হাসি দিলেন।

: আপনি এখানে কি করছেন?

: এই হাঁটছি আর কি?

: কিসের মিছিল এটা জানেন?

: না। কিসের?

: ট্রাক ড্রাইভার এসোসিয়েশনের। এক ট্রাক ড্রাইভার একটি ছেলেকে চাপা দিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পুলিশ হেভি পিটন দিয়েছে। পাবলিক ও

দিয়েছে। তার প্রতিবাদে মিছিল। চলে আসেন।

ওসমান সাহেব চলে এলেন না। হাঁটতে লাগলেন নিজের মনে। ছেলেটি বলল, লেখালেখি কেমন হচ্ছে স্যার?

: হচ্ছে না।

: কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনার ইদানিংকালের লেখাগুলি আগের গুলির মত হচ্ছে না।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ। ইদানীংকালের লেখাগুলি মনে হয় পপুলার ডিমান্ডে লেখা। তেমন ডেপথ নেই।

: তুমি কি আমার ইদানীংকালের লেখাগুলি পড়েছ?

: কিছু কিছু পড়েছি।

: দু'একটার নাম বলতে পারবে?

ছেলেটি চুপ করে গেল। ছেলেটি তাঁর নতুন লেখাগুলি পড়েনি। আগের গুলিও হয়ত পড়েনি। ওসমান সাহেব মৃদু হেসে বললেন, না পড়ে কোন মন্তব্য করা ঠিক না। তুমি কি সিগারেট খাবে? ভাল সিগারেট আছে খাওয়াতে পারি।

: জ্বি না। আমার একটা কাজ আছে। আমি মতিঝিল যাব।

: ঠিক আছে দেখা হবে পরে।

তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগলেন। মিছিল গুলিস্তানের কাছে এসে ভেঙ্গে গেল। ক্লান্তি লাগছিল। তিনি একটা রিকশা নিলেন। কোথায় যাওয়া যায়? মনিকার কাছে যাবেন কি? তার মনে হল মনিকার কাছে যাবার ইচ্ছাই এতক্ষণ পুষে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ওর কাছে যাবেন না। শোকের ব্যাপারগুলি থেকে তিনি দূরে থাকতে চান। এখন মনিকাকে ঘিরে অনেকেই বসে আছে। এ সময় উপস্থিত হবার কোন মানে হয় না। কিন্তু তবু মনিকার বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলেন।

অনেকগুলি গাড়ি পার্ক করা। তাঁর চোখের সামনেই বিরাট একটা নীল রঙের গাড়ি থামল। কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল হয়ে গেছে এমন একজন মহিলা নামলেন। মহিলাটির পরনে ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ি। কাশ্মীরী একটি শাল কাঁধে। শালটির রং টকটকে লাল। সাদার সঙ্গে লালের কম্বিনেশন কি চমৎকার লাগছে।

ওসমান সাহেব বাড়িতে ঢুকলেন না। কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া যায়? তাঁর যাবার জায়গা দ্রুত কমে আসছে। হয়ত এমন একটি সময় আসবে যখন কোথাও যাবার জায়গা থাকবে না। নিজের ঘরেই থাকবে দিন–রাত। কিছুক্ষণের জন্য রাস্তায় হাঁটবেন তারপর আবার ফিরে যাবেন নিজের জায়গায়।

রানুদের বাসায় গেলে কেমন হয়? আজ বুধবার না। তাতে কি? দেখা যাক না হঠাৎ উপস্থিত হলে কি হয়। টগর নিশ্চয়ই খুব অবাক হবে।

রানুরা বাসায় ছিল না। দরজা তালা বন্ধ। কয়েকটা দিন খুব খারাপভাবে শুরু হয়। আজও কি সে রকম একটি দিন? মিলিদের বাসায় গেলে কেমন হয়? মিলি কি আছে? না সেও ঘরে তালা দিয়ে উধাও হয়ে গেছে কোথাও।

অবশ্যি মিলিদের বাসা কোথায় তাঁর পরিষ্কার ধারণা নেই। ইচ্ছা থাকলেও

www.BDeBooks.Com

খাওয়া যাবে না। তিনি বাড়ি ফিরে এসে শুনলেন তাঁর বাবার আরেকটি স্ট্রোক হয়েছে। ওসমান সাহেবের ক্লান্তি লাগছিল। বাবার কাছে যেতে ইচ্ছা করছিল না।

১২

ফয়সল সাহেব পিঠের নিচে দুটি বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে ভোর বেলাতে তাঁর উপর দিয়ে বড় রকমের একটা ঝড় গিয়েছে। লোকজন তাঁকে দেখতে আসতে শুরু করেছে। সবাই একই কথা বিভিন্নভাবে বলছে।

: কি করে ব্যাপারটা হল?

: ব্যথাটা প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল?

: ডাক্তারের কাছে কখন গেলেন?

: ডাক্তার কি বলল?

: এখন অবস্থা কি?

: খাওয়া- দাওয়া কি করছেন?

ফয়সল সাহেব দুপুরের মধ্যেই মহাবিরক্ত হয়ে গেলেন। বীথিকে ডেকে বললেন, যেসব প্রশ্ন সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করছে সেগুলির উত্তর লিখে তুমি দেয়ালে টানিয়ে দাও। এক দুই করে নম্বর দিয়ে দেবে।

বীথি হ্যাঁ সূচক ঘাড় নেড়েছে। অন্য কিছু বললেই তিনি রেগে যাবেন নানান তর্ক-বিতর্ক শুরু করবেন। এই ঝামেলায় না যাওয়াই ভাল।

দাঁড়িয়ে থাকবে না, এক্ষুনি লিখে ফেল। সবশেষে লিখবে এখন দয়া করে বিদেয় হন। যা জানবার সবই জেনেছেন। মিলি কি করছে?

: রান্না ঘরে বাচ্চার দুধ গরম করছে।

: একেবারে আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে চলে এসেছে? সে জানে না বাচ্চাকাচ্চা আমি পছন্দ করি না? ওকে বল বাসায় চলে যেতে। আমার মরার সময় এখনো হয়নি। সময় হলে তাকে খবর দেবে।

: বীথি বলল, এটা বলা কি ঠিক হবে?

: খুবই ঠিক হবে। তুমি বলতে না পারলে আমি বলব। ডেকে আন তাকে।

ডেকে আনতে হল না। মিলি তার ছেলে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। আদুরে গলায় বলল, তোমার পাশে ওকে শুইয়ে দেই।

: কেন?

: দুধ খাবে। ও দুধ খাওয়ার সময় কাউকে কাছে থাকতে হয়।

ফয়সল সাহেব রুক্ষ গলায় বললেন, ঝামেলা করিস না, ওকে নিয়ে বাসায় চলে যা।

মিলি তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। সে বাবার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। মিলি তাকাল বীথির দিকে। বীথি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

: বাসায় চলে যাব?

: হ্যাঁ।

: কেন?

: কেন কি? এখানে থেকে লাভটা কি হচ্ছে? বাচ্চার ঘ্যান ঘ্যান পেশাব পায়খানা। একশ ঝামেলা।

: কখন সে ঘ্যান ঘ্যান করল?

ফয়সল সাহেব প্রচণ্ড এক ধমক দিলেন। মা'র কোলের বাচ্চাটি এতক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এই বার সে কাঁদতে শুরু করল। মিলির নিজের চোখেও পানি এসে গেল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ মুছল। মিলি ভেবে রেখেছে বেশ কয়েক দিন এ বাড়িতে থাকবে। স্যুটকেস গুছিয়ে এনেছে। কাজের একটি মেয়েকেও এনেছে সঙ্গে এখন কি হুট করে চলে যাবে? বাসায় গিয়ে বলব কি? বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন?

বাবু ক্রমাগত কাঁদছে। ক্ষিধের কান্না। বাবার কানে যাচ্ছে এবং তিনি নিশ্চয়ই আরো রাগছেন। মিলি সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে এল। আগে যে ঘরটিতে সে থাকতো সেই ঘর সকালবেলা সে নিজের জন্যে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন কেন যেন মনে হচ্ছে এটা অন্যের বাড়ি। এ ঘরে সে আগে কোনদিন থাকেনি।

অসুখ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়ালে টাঙ্গানোর পর ফয়সল সাহেব ঘোষণা করলেন, কাউকে যেন এ ঘরে ঢুকতে না দেয়া হয়। বীথিকে বললেন,

: কাউকেই আসতে দেবে না। ওসমানকেও নয়। বুঝতে পারছ?

: পারছি।

: ওসমান কি এসেছিল?

: জ্বি না। এখনো আসেনি। খবর পান নি বোধ হয়।

: খবর পেলেও আসবে না। মহালায়েক ছেলে। সাহিত্য সভাতে চলে গেছে। কিংবা কোন মহাকাব্য লিখছে। মহাসাহিত্যিক তো। ও এলেই হাঁকিয়ে দেবে।

ফয়সল সাহেব সিগারেট ধরালেন। বীথি মৃদু স্বরে বলল, ডাক্তার খুব করে বলে গেছেন আপনি যেন সিগারেট না খান। তিনি বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালেন।

: মরবার সময় হয়ে গেছে, সিগারেট খেলেও মরব, না খেলেও মরব, কাজেই এসব নিয়ে বাজে তর্ক করবে না।

তিনি সিগারেট শেষ করে ঘুমুতে গেলেন। ঘুমুলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত।

ওসমান সাহেব এলেন বিকেলে। বাড়ি ভর্তি মানুষ। সকালে যারা এসেছিল তাদের অনেকেই আবার এসেছে। ওসমান সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। এরা সবাই তাঁর আত্মীয়-স্বজন অথচ কাউকেই ভাল করে চেনেন না। মৃত্যু, অসুখ এইসব বড় বড় ঘটনার সময় তাদের দেখা পাওয়া যায়। তাঁরা আসেন। আন্তরিকভাবেই খোঁজ-খবর করেন।

ওসমান সাহেবকে দেখে কালো লম্বামত একজন বুড়ো মানুষ বললেন, ভাল আছ বাবা? ওসমান সাহেব হাসলেন। বুড়ো লোকটি বললেন, যাবার সময় হয়ে এসেছে আমাদের। সবাই চলে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের বলার ভঙ্গিতে কোন হতাশার ছোঁয়া নেই। যেন বেড়াতে যাবার মত কোন ব্যাপার নিয়ে কথা বলছেন।

ওসমান সাহেব মনে মনে বললেন, যাবার সময় হল বিহঙ্গের। নিতান্তই অর্থহীন কথা। এ সময় এটা মনে হবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু একেক সময় একেকটা কথা মনে আসে এবং ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে। যাবার সময় হল বিহঙ্গের এই লাইনটি এখন মাথায় ঘুরতেই থাকবে। আটকে যাওয়া রেকর্ডের

মত। কিছুতেই তাড়ানো যাবে না।

বুড়ো লোকটি বললেন, যাও বাবা তুমি ভেতরে যাও। আমরা আছি কিছুক্ষণ।

ওসমান সাহেবের কাছে এ বাড়ি এখন অপরিচিত বাড়ি। সহজভাবে ভেতরে যেতেও কেন জানি সংকোচ লাগছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেউ একজন এসে বলবে, আপনি কাকে চাচ্ছেন?

তিনি সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে গেলেন। এক সময় দোতলায় তাঁর এবং মিলির ঘর পাশাপাশি ছিল। মিলি একটু খুটখাট শব্দ হলেই ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলত, ভাইয়া একটু দেখত। চোর এসেছে। মিলির ভয় কি এখনো আগের মতই আছে? বিয়ের পর মেয়েদের অনেক কিছু বদলে যায়। ভীরু মেয়েরা হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠে। লাজুক মেয়েগুলি হাত নেড়ে নেড়ে হড়হড় করে কথা বলে।

: স্লামালিকুম। কখন এসেছেন?

বীথি, তাঁকে দেখে উঠে আসতে শুরু করেছে। উঠে আসার ভঙ্গিটি অত্যন্ত সাবলীল। এটা যেন তার নিজের বাড়ি–ঘর। সে অতিথির খোঁজ নিতে আসছে।

: স্যারের ঘুম ভেঙ্গেছে। আপনি কি দেখা করবেন?

:আছেন কেমন?

: ভালই। তবে খুব দুর্বল। সারা বিকাল ঘুমিয়েছেন। সাধারণত উনি বিকেলে ঘুমান না।

: মিলি আসেনি?

: এসেছে। সে ঘুমুচ্ছে।

: সবাই ঘুমুচ্ছে। ব্যাপার কি?

বীথি হাসল। ওসমান সাহেব ভাবলেন, সুন্দর মেয়েদের সবকিছুই কি সুন্দর? তিনি এখন পর্যন্ত কোন সুন্দরী মেয়ে দেখেন নি যাদের হাসি অসুন্দর।

: স্যারের ঘরে যাবেন এখন?

: ধীরে–সুস্থে যাই। তাঁর মেজাজ কেমন?

: খুব খারাপ। সবার ওপর রেগে আছে। আপনি কি বসবেন বারান্দায়? চেয়ার এনে দেব?

: না বসব না। দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে।

: চা খাবেন? চা এনে দেব?

: দিতে পারেন।

বীথি নেমে গেল। তাঁর আবার মনে হল এই মেয়েটি এ বাড়িতে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে। আশ্রিত মানুষ কখনো এত সহজ হয় না। তাদের চোখে–মুখে সবসময় একটা বিনীত ভাব ফুটে থাকে।

: ভাইয়া তুমি কখন এসেছ?

মিলি বের হয়েছে তার ঘর থেকে। দীর্ঘ ঘুমের জন্য তার চোখ–মুখ ফোলা ফোলা।

: তুই অসময়ে ঘুমুচ্ছিলি ব্যাপার কি?

: রাতে তো আমার ঘুম হয় না,এই জন্যে দিনে ঘুমাই।

: রাতে ঘুম হয় না নাকি?

: না।

: কেন?

: এমনি হয় না। ভাইয়া, বাবা আজ আমার সঙ্গে খুব রাগারাগি করেছে।

: তাই নাকি?

: একটা বাইরের মেয়ের সামনে আমাকে অপমান করেছে।

: বাইরের মেয়েটা কে? বীথি?

: হ্যাঁ। ওর কান্ডকারখানা দেখেও অবাক হয়েছি। এমন ভাব করছে যেন সবকিছু তার। এ বাড়ির সব আলমারীর চাবি তার কাছে থাকে।

: থাকুক না। তাতে অসুবিধা কি?

: বাইরের একটা মেয়ের কাছে আলমারীর চাবি থাকবে? বলছ কি তুমি?

: নিজের ছেলেমেয়েরা যখন কাছে নেই তখন এছাড়া আর কি করবেন। ও নিয়ে তুই কিছু বলতে যাবি না।

: বলব না কেন? একশ বার বলব। তুমি যে ঘরটিতে থাকতে সে ঘরটিতে এখন সে থাকে। অথচ নিচে এতগুলি ঘর খালি পড়ে আছে।

: আমি তো আর এখানে থাকি না। কাজেই কোন অসুবিধা নেই।

: যথেষ্ট অসুবিধা আছে। এ বাড়িতে আমাদের ঘরগুলি ঠিক আগের মত থাকবে। যখন ইচ্ছা আমরা আসব। যতদিন ইচ্ছা থাকব। নিজেদের ঘরগুলিতেই থাকব।

: তুই থাকিস। তোর ঘর তো খালিই আছে।

মিলি মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে রইল। বীথিকে ট্রেতে করে চা নিয়ে আসতে দেখে তাঁর মুখ আরো অন্ধকার হয়ে গেল। সে চাপা স্বরে বলল, আপনি ভাইয়ার ঘর দখল করে আছেন কেন? ভাইয়া খুব বিরক্ত হয়েছে। সে প্রায়ই নিজের ঘরে এসে থাকে। আপনি আসার পর সে একবারও আসে নি।

বীথি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওসমান সাহেব কি বলবেন ভেবে পেলেন না এমন অপ্রস্তুত করতে পারে মিলি।

কিন্তু বীথি মেয়েটি বেশ শক্ত, সে সহজেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। অন্য কোন মেয়ে হলে সামলাতে পারত না। কেঁদে টেদে ফেলত।

বীথি বলল, স্যার আপনাকে ডাকছেন। চা খেয়েই যান। চিনি হয়েছে?

: হ্যাঁ হয়েছে।

: বাবা আপনার শরীর কেমন? ফয়সল সাহেব ছেলের প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হাত উঁচিয়ে দেয়ালে টানানো প্রশ্নোত্তরগুলি দেখিয়ে দিলেন। ওসমান সাহেব মৃদু হাসলেন। বৃদ্ধ মানুষের মধ্যে শিশুর ব্যাপার গুলি দেখা দিতে থাকে কথাটা মিথ্যা নয়।

: হাসছিল কেন? কাজটা হাস্যকর?

: হ্যাঁ। এর উদ্দেশ্য যদি কথা কম বলা হত তাহলে হাস্যকর হত না। কিন্তু আপনি কথা কম বলছেন না। বরং আগের চেয়ে বেশী বলছেন।

: ঘরে ঢুকেই সেটা বুঝে গেলি? বড় সাহিত্যিক হয়ে গেছিস মনে হয়। শুদ্ধ করে তো তিনপাতা বাংলা লিখতে পারিস না।

ওসমান সাহেব একটা চেয়ার টেনে বাবার পাশে বসলেন। মৃদু স্বরে বললেন,

www.BDeBooks.Com

রাগ করার মত কিছু তো বলি নি, রাগ করছেন কেন? এই শরীরে রাগ করাটা ঠিক হবে না।

: রাগ করতে হলে দুধ–দৈ খেয়ে শরীর ঠিক করতে হবে? কি, চুপ করে আছিস কেন? বল শুনে ফেলি।

ওসমান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, আমাকে দেখে আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন, আমি বরং যাই। পরে আসব। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

: বোস তুই, কথা আছে।

তিনি বসলেন। ফয়সল সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে থাকলেন ছেলের দিকে।

: কি বলবেন বলুন।

: কেন তোর রাজকার্য পড়ে আছে নাকি? না কোন মহাকাব্য লেখার কথা?

: আমার লেখালেখি আপনার পছন্দ নয়?

: এই সব নাকি কান্না আমার পছন্দ হবার কথা না। আমার বয়স হয়েছে। আমি বার বছরের খুকী না।

ফয়সল সাহেব বালিশের নিচ থেকে সিগারেট বের করলেন। তাঁর হয়ত ধারণা ছিল ওসমান নিষেধ করবে। কিন্তু ওসমান সাহেব কিছুই বললেন না।

: তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে।

: বলুন, আমি শুনছি।

: ঠিক ঠিক জবাব দিবি।

তিনি বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবা কি বলবেন আঁচ করতে চেষ্টা করছেন।

: শুনলাম বৌমা নাকি আলম নামের কোন এক ছেলেকে বিয়ে করছে, কথাটা সত্যি?

: কার কাছ থেকে শুনেছেন?

: কার কাছ থেকে শুনেছি সেটা জরুরী নয়। ঘটনাটা সত্যি কি না বল।

: আমি ঠিক জানি না।

: কিছুই জানিস না। কিছুই শুনিস নি?

ওসমান সাহেব চুপ করে রইলেন।

: বেকুবের মত চুপ করে থাকিস না, কথার জবাব দে।

: আমিও শুনেছি।

: ঘটনা সত্যি?

: সত্যি হতেও পারে। ও আমাকে একটা শিক্ষা দেবার জন্যে এটা করবে। ঐ ছেলেটির প্রতি তার আলাদা কোন মমতা আছে বলে মনে হয় না।

: তুই একটা মহাবেকুব। তুই বেকুব, তোর বোন বেকুব। দুইজনই বেকুব।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। মৃদু স্বরে বললেন, এটাই কি আপনার জরুরী কথা?

: না, এটা জরুরী কথা হবে না কেন? তোদের কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তোদের ব্যাপার। আই ডোন্ট থিংক আই কেয়ার।

: জরুরী কথা কি বলুন শুনে যাই।

: এখন বলতে ইচ্ছে করছে না।

: ঠিক আছে আমি পরে আসব।

: আসার কোন দরকার নেই। যে সব বেকুবদের বৌ অন্য লোকের সঙ্গে ভেগে যায় তাদের সাথে দেখা–সাক্ষাৎ হওয়ার আমার কোন প্রয়োজন নেই।

: আপনি ব্যাপারটা যেভাবে দেখছেন আসলে এটা সেরকম নয়। আমরা আলাদা হয়েছিলাম। এই অবস্থায় তার যদি কোন একটি ছেলেকে পছন্দ হয় এবং সে তাকে বিয়ে করে তাতে দোষের তো কিছু নেই।

ফয়সল সাহেব বাড়ি কাঁপিয়ে ধমকে উঠলেন–'শাট আপ।' মিলি এবং বীথি দু'জনেই ছুটে এলো। মিলির কোলে তার বাচ্চাটি কাঁদছে। ওসমান সাহেব নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। বসার ঘরে অনেকেই তখনো বসে আছে। একজন বলল, চললেন? তিনি জবাব দিলেন না।

গেট খুলে বাইরে পা ফেলা মাত্র মিলি বলল, ভাইয়া বাবা ডাকছে। তিনি ফিরে এলেন। ফয়সল সাহেব বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক। বিছানায় বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। ছেলেকে ঢুকতে দেখে পা দোলানো বাড়িয়ে দিলেন।

: ডেকেছেন নাকি বাবা?

: হুঁ বস। জরুরী কথাটা বলেই ফেলি।

তিনি কিছু বললেন না। বাবার মুখোমুখি বসলেন। ফয়সল সাহেব গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বললেন, একটা বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। অল্প বয়সী একটা মেয়ে।

: অল্প বয়সী একটা মেয়ে আপনাকে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন?

: রাজি হয় টাকার লোভে। পৃথিবীতে পুরুষ মানুষ হয় তো দু'একটা পাওয়া যাবে যাদের টাকার লোভ নেই। কিন্তু মেয়ে মানুষ পাওয়া যাবে না। এ বাড়িটা মেয়েটির নামে লিখে দিলেই সুড়সুড় করে রাজি হবে।

: মেয়েদের সম্পর্কে আপনার বড় খারাপ ধারণা।

: তোর তো খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তার ফল তো হাতে হাতে দেখলি। তোকে লাথি মেরে চলে গেল।

তিনি কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। যেন বাবাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

: বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করাই ভাল। এতে বেঁচে থাকার আগ্রহ জন্মে। কি বলিস তুই? সাহিত্যিক মানুষ তোর ধারণাটা শুনি।

তিনি জবাব দিলেন না। একবার ভাবলেন, জিজ্ঞেস করেন মেয়েটি কে? জিজ্ঞেস করা হল না। সব প্রশ্ন সবসময় করা যায় না।

: বাবা আজ যাই।

: ঠিক আছে যা।

ফয়সল সাহেব পা দোলাতে লাগলেন। তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

ওসমান সাহেব উদ্দেশ্যহীনভাবে অনেকক্ষণ রাস্তায় হাঁটলেন। বেশ শীত পড়েছে। শীতের রাতে হাঁটতে ভালই লাগে। তাঁর মাথায় ক্রমাগত বাজছে– যাবার সময় হল বিহঙ্গের। তাড়ানো যাচ্ছে না এটাকে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন রাত দশটায়। নবী তখনও আছে। বসার ঘরে আরামের ভঙ্গি করে সিগারেট টানছে। চা কফি– টেবিলের উপর রাখা।

: কোথায় ছিলেন সারাদিন? আমি সেই সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করছি। আপনার কোন ট্রেস নেই। কলেজেও ফোন করেছিলাম। তারাও কিছু জানে না।

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না।

: সায়েন্স ফিকশানটা নামিয়ে দিয়েছি। বসে আছি আপনাকে পড়াবার জন্যে।

তিনি ক্লান্ত স্বরে বললেন, আজ থাক, অন্য একদিন পড়ব। আজ আমার শরীরটা ভাল না।

: না না আজই পড়বেন। গরম গরম। যান, হাত–মুখ ধুয়ে আসুন। আকবরের মা, চা কর আমাদের জন্যে। তুরন্ত।

নবী শীষ দিতে লাগল। একজন সুখী ও পরিতৃপ্ত মানুষ। হাসিমুখে বলল।

আইডিয়াটা জমিয়ে ফেলেছি। অতটা ভাল হবে বুঝতে পারি নি। আপনি গিয়েছিলেন কোথায়? মনিকার ওখানে নাকি?

ওসমান সাহেব হ্যাঁ না কিছুই বলেন না। তাঁর খুব ইচ্ছা হতে লাগল বাবার মত চেঁচিয়ে উঠতে– শাট আপ। কিন্তু তিনি তা করলেন না। চাদর পায়ে দিয়ে বসলেন সোফায়। মৃদু স্বরে বললেন, পড়ুন।

নবী পড়তে শুরু করল। গল্প জমে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই ওসমান সাহেব এক সময় মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। চমৎকার লেখা।

১৩

রানুর বড় খালা সুরমা কয়েকদিন ধরে একটি ব্যাপারে নিয়ে ভাবছেন। যতই ভাবছেন ততই তাঁর মেজাজ খারাপ হচ্ছে। মেজাজ খারাপ হলে তাঁর কিছু শারীরিক অসুবিধা হয়–ক্ষুধা হয় না, বুকে ধরফর করে। ক'দিন ধরে তাই হচ্ছে। এসব ঝামেলা থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না।

রানুকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বললে সব সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু তা বলার জন্যে যে সাহস দরকার তা তাঁর নেই। রানুকে বিচিত্র কারণে তিনি ভয় করেন। সে যেদিন প্রথম এসে বলল, খালা আমি কয়েকদিন তোমার এখানে থাকব। তোমার আপত্তি আছে?

তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ছিল তবু তিনি বললেন, আপত্তি কিসের? ঘর তো খালিই পড়ে আছে। থাক যতদিন ইচ্ছা। তিনি কল্পনাও করেননি এই কথার উপর ভর করে রানু তার ছেলেকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে উঠে পড়বে। এবং কিছু দিন যেতে না যেতে অপলা এসে জুটবে তার সঙ্গে।

অপলা মেয়েটিকে তিনি সহ্যই করতে পারেন না। প্রথম দিন এসেই সে বলল খালা, ছাদের চাবিটি আমাদের কাছে দিন। আমি ছাদে খুব হাঁটাহাঁটি করি। আপনি ছাদ বন্ধ করে রাখেন কেন?

তিনি ছাদ বন্ধ করে রাখেন কারণ ভাড়াটের ছেলে–মেয়েরা ছাদে উঠে বড় বিরক্ত করে। ছাদ হচ্ছে প্রেমের বৃন্দাবন। সামনের বাড়ির ছাদে তো বিরাট এক কেলেঙ্কারীই হল। এমন কেলেঙ্কারী যে কাউকে বলার উপায় নেই। অপলাকেও

বললেন না। শুধু শুকনো মুখে জানালেন চাবিটি পাচ্ছেন না। তার কিছুক্ষণ পরই নূরীর মা এসে বলল, অপলা ছাদে। সে নাকি তার ঢুকিয়ে কিভাবে তালা খুলে ফেলেছে। তালা খুলে চোর হ্যাঁচর, অপলা ভদ্রলোকের মেয়ে। তার এ কি কাণ্ড!

রানুকে থাকতে দিয়ে তিনি যে কি ভুল করেছেন তা মর্মে মর্মে এখন বুঝছেন। কিন্তু উপায় কি? তিনি যে সমস্ত ব্যাপারটাই এখন অপছন্দ করছেন তা আকারে–ইঙ্গিতে এখন বুঝাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু রানু বোধ হয় বুঝেও বুঝতে চাইছে না।

সেদিন হঠাৎ কথায় কথায় বললেন, আমার টেলিফোন নাম্বার তুমি কাউকে দিও না। অচেনা মানুষদের ফোন কল আমার ধরতে ভাল লাগে না। আমি আমার ভারাটেদেরও নাম্বার দেই না।

রানু সহজভাবেই বলেছে,–এ নিয়ে চিন্তা করবেন না খালা, টেলিফোনে কথা বলার লোক নেই আমার। এক কথাটা ঠিক। এখন পর্যন্তও কেউ রানুকে টেলিফোন করেনি। রানু গত তিন মাসে চার বার টেলিফোন করেছে। এটাও খারাপ না। তার প্রশংসাই করতে হয়।

সুরমা শীকার করেন প্রশংসা করবার মত এই মেয়ের অনেক কিছুই আছে, কিন্তু তাই বলে তিনি তাকে খামোকা পুষবেন কেন?

রানু চাকরি পাবার পর বাড়ি ভাড়া হিসেবে এক হাজার টাকা করে দিতে চাইল, তিনি নেন নি। একবার নিতে শুরু করলে ওদের এখান থেকে সরানো মুশকিল হবে। তাছাড়া নিজের বোনের মেয়ের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নেয়াটাও বাণাপ দেখায়। বিশেষ করে সবাই যখন জানে রানু বিপদে পড়েছে।

সুরমা নানাভাবে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। ভাবতে চান মা বাপ মরা একটি মেয়েকে সাহায্য করছেন এবং তা বেশী দিন করতেও হবে না। সে ফিরে যাবে তার স্বামীর কাছে। একা একা কোন মেয়ে থাকতে পারে? বিশেষ করে সেই মেয়ের যখন একটি ছেলে আছে। ছেলের কারণেই তাকে যেতে হবে। আজ হোক আর কাল হোক। জামাইকে তাঁর কাছে খানিকটা 'ভোন্দা' ধরনের বলে মনে হয়। মিন মিন স্বভাব। চুলের মুঠি ধরে একটা চড় দিলে এই সব মেয়ে জলের মত ঠিক হয়ে যায়– তা করবে না, সব সময় পুতু পুতু করবে। পুরুষ মানুষকে হতে হয় পুরুষ মানুষের মত। মাদী মার্কা পুরুষগুলির জন্যেই এত ঝামেলা।

সুরমা রোদে এসে বসলেন। মাঘ মাস শেষ হয়নি। এখনো কয়েকটা দিন আছে কিন্তু চিড়বিড়ে গরম পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ রোদে বসেই তিনি বিরক্ত হয়ে পড়লেন। উঠে গেলেন না। রোদের মধ্যে নাকি কি সব ভাইটামিন আছে। শরীরে যত বেশী লাগানো যায় ততই ভাল। কষ্ট হলেও লাগাতে হবে।

: খালা কড়া রোদে বসে আছেন যে?

: সুরমা ঘাড় ঘুড়িয়ে রানুকে দেখলেন। কোন জবাব দিলেন না।

: আজ একটু টগরকে রাখবেন খালা? অল্প কিছুক্ষণের জন্যে।

: অফিসে যাবে?

: না আজ অফিস নেই। একটু কেনাকাটা করব।

: অপলা কোথায়? অপলার কাছে রেখে যাও। এইসব পুলাপান বড় বিরক্ত

www.BDeBooks.Com

করে। এটা ধরে, ওটা ধরে।

: টগর বিরক্ত করবে না।

: না গো মা—হাগামুতা আছে। তুমি সাথে করে নিয়ে যাও।

রানু শান্ত গলায় বলল,—আপনাকে বেশী বিরক্ত করব না খালা—বাড়ি ভাড়া করব। অফিসের কাছে একটা বাড়ি নেব।

: ভালই তো। স্বাধীন মহিলা হওয়াটাই তো ভাল। আমরা পরাধীন ছিলাম—স্বাধীনতার মর্ম বুঝি না। তোমরা বোঝ।

: এসব কেন বলছেন খালা? ঝগড়া করতে চান নাকি?

: নিজের বোনঝির সঙ্গে কি ঝগড়া করব?

: ঝগড়া করতে না চাইলে টগরকে কিছুক্ষণ দেখেন। বাইরে ঘুরাঘুরি করলেই ওর শরীর খারাপ করে। টগর নানুকে বিরক্ত করবে না।

সুরমা কিছু না বলে রোদ থেকে উঠে এলেন। মনে মনে রানুর প্রশংসা করলেন। অন্য কোন মেয়ে হলে এই অবস্থায় ছেলেকে ফেলে বাজারে যেত না। সে গেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে টগরকে রেখে যাওয়ায় তিনি খুশীই হলেন। এই বিশাল এক তলাটায় তাঁর খুব একা একা লাগে। নিজের মেয়েরা বিয়ের পর কোথায় কোথায় চলে গেছে। কেউ ভুলেও খোঁজ করে না। তিনি এই শূন্যপুরী পাহারা দেন। ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। প্রতি মাসের তিন তারিখে নিজে ব্যাংকে গিয়ে পাঁচ হাজার টাকা জমা দেন। তাঁর কাজ বলতে এইটুকুই। টগর মাঝে মধ্যে এলে তাঁর ভালই লাগে। যদিও এটা কাউকে বুঝতে দেন না।

টগর সরু চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি হাত ইশারা করে টগরকে ডাকলেন।

: পিয়াস লাগছে নাকি রে?

টগর ভেবে পেল না হঠাৎ করে তার পিয়াস লাগবে কেন? সে মাথা নাড়ল।

: পিয়াস লাগলে বল ফান্টা এনে দেবে।

: লাগে নাই।

: লেগেছে। মুখ শুকনা।

সুরমা দু'টি ফান্টার বোতল আনালেন। তাঁদের দু'জনের জন্যে দু'টি। তারপর শুরু করলেন ডাকাতের গল্প। খুব ছোট বেলায় নৌকা করে যাচ্ছিলেন হঠাৎ একটা ডিঙ্গি নৌকা তাদের নৌকার কাছাকাছি এসে বলল,— আগুন আছে? বিড়ি ধরানির আগুন?

গল্প শুনে টগর মুগ্ধ হয়ে গেল। সে মৃদু স্বরে বলল,—আরেকটা বলেন। সুরমা তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। এই গল্পটি প্রথমটির চেয়েও ভাল—সাপের গল্প।

মিলি নিউমার্কেটে একটি বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রানু অবাক হয়ে বলল,—তুমি এখানে কি করছ?

মিলি হাসি মুখে বলল, বেড়াচ্ছি।

: বেড়াচ্ছি মানে—এটা বেড়াবার জায়গা নাকি? কখন এসেছ?

: অনেকক্ষণ আগে।

মিলি রানুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। তার উৎসাহের সীমা নেই। এক সময় রানু বলল, এসো তোমাকে একটা শাড়ি কিনে দেই।

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, কেন আমাকে শাড়ি কেনে দেবে কেন?

: বেতন পেয়েছি আজ। এসো তুমি পছন্দ কর। পাঁচশ টাকার মধ্যে। মিলি কোন রকম আপত্তি না করে শাড়ির দোকানে ঢুকে পড়ল। প্রায় ঘন্টাখানিক লাগিয়ে শাড়ি কিনল।

: ভাবী, এখন একটা আইসক্রিম খাব।

: এখন আইসক্রিম খাবে কেন? চল বাসায় চল, ভাত খাবে। ক্ষিধে লাগেনি?

: লেগেছে। কিন্তু আইক্রিম খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

তারা আইসক্রিমের দোকানে ঢুকল। রানুর মনে হল,—মিলি ঠিক সুস্থ নয়। তার কথাবার্তা, আচার—আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। তবু কোথায় যেন কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। রানু বলল, তোমার শরীর এখন কেমন মিলি?

: ভাল।

: তোমার বাচ্চা কেমন আছে?

: জানি না।

: জানি না মানে?

: আমার শাশুড়ি তাঁকে নিয়ে গেছেন।

: কোথায় নিয়ে গেছেন?

: ময়মনসিংহ। ওদের বাড়িতে।

: তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মিলি। মিথ্যা কথা বলছ। ঠিক না?

মিলি হেসে ফেলল।

: কেন এত মিথ্যা বল?

: জানি না কেন বলি। চল ভাবী উঠি। বাসায় চলে যাব। ঘুম পাচ্ছে।

: আমার সঙ্গে যাবে না?

: উঁ হুঁ। ভাবী, বাবা যে বিয়ে করছে তুমি শুনেছ?

রানু কিছুই বলল না। মিলির কোন কথার গুরুত্ব দেবার কোন প্রয়োজন নেই। ওর যা মনে আসে তাই বলে।

: আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না ভাবী?

: ঠিকই ধরেছ। করছি না।

: এবার কিন্তু সত্যি কথাই বলছি। বাবা তার সেক্রেটারীকে বিয়ে করছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে একশ টাকা বাজী রাখতে পার।

রানু চুপ করে রইল। দেড়টা বাজে। মাথা ধরে গেছে। এত সময় হাঁটাহাঁটি করা ঠিক হয় নি। মিলি গেটের কাছে এসেই বলল—ভাবী, শাড়ির রঙটা এখন আর আমার পছন্দ হচ্ছে না। পাঁচ মিনিটের জন্যে আসবে শাড়িটা বদলে নেব। প্লীজ ভাবী তোমার পায়ে পড়ি।

১৪

ওসমান সাহেব দূর থেকে একটি চমৎকার দৃশ্য দেখলেন। গেটের বাইরে অপলা ও টগর।

অপলা হাসছে। অপলার কোলে হাসছে টগর।

তিনি মুগ্ধ চোখে তাকালেন। কিছু কিছু দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে মানুষকে অন্য রকম করে ফেলে। অন্ধকার দূর করে দেয়। মনের কোন একটা স্যাঁত স্যাঁতে জায়গায় হঠাৎ খানিকটা আলো এসে পড়ে।

তাঁর মন হাল্কা হয়ে গেল। দীর্ঘদিন তিনি কিছু লিখতে পারছেন না। একটি লাইনও নয়। না লেখার মত কষ্টও যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তিনি হাসলেন। একজনের কান্না অন্য জনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু হাসি করে।

অপলা চেঁচাল–দুলাভাই। দুলাভাই। সে আজ এত উল্লসিত কেন? ওসমান সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, কি খবর অপলা?

: আমাদের ভাল খবর। আপনার খবর কি?

: আমার কোন খবর নেই। এত খুশী কেন?

অপলা ঘাড় কাত করে বলল,–খুব ভাল সময়ে এসেছেন।

: ভাল সময় কেন?

: তা বলব না।

অপলা হাসছে। টগর হাসছে। হাসছেন ওসমান সাহেব। রানু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখল। এমন আনন্দিত হবার মত কি ঘটেছে? টগর বাবার কোলে যাবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। এটাও একটা নতুন দৃশ্য। টগর তার বাবা–মা'র প্রতি আলাদা কোন আবেগ দেখায় না।

ওসমান সাহেব ছেলেকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন। টগর বলল, আজ কি বুধবার?

: না আজ বুধবার না। অন্য একবারে এসে দেখলাম কেমন লাগে। তুমি খুশী হয়েছ টগর?

: হ্যাঁ।

: বেশী খুশী? না অল্প খুশী?

টগর দাঁত বের করে হাসল। অপলা বলল,–চলুন উপরে যাই। ওসমান সাহেবের কেন জানি দোতলায় উঠতে ইচ্ছা হল না। তাঁর মনে হল দোতলায় উঠলেই চমৎকার বিকালটা অন্য রকম হয়ে যাবে। রানু এসে কঠিন মুখে দু' একটা কথা জিজ্ঞেস করবে। আজ কারোর কঠিন মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না।

তিনি বললেন,–অপলা চল রাস্তার মোড়ে যাই। টগরকে চকলেট কিনে দেই। আজ ওর জন্যে কিছু আনা হয়নি।

: বৃষ্টি আসবে তো দুলাভাই।

: না আসবে না।

: কি করে বুঝলেন?

: দেখছ না একটা বেড়াল হাঁটছে?

: তাতে কি হয়েছে?

: বৃষ্টি আসার আগে বেড়ালরা কখনো ঘর থেকে বের হয় না। পশুপাখিরা প্রকৃতির ব্যাপারগুলি আগে আগে টের পায়।

: সত্যি?

: হ্যাঁ, সত্যি।

অপলা কি বলতে গিয়েও বলল না। অপলা না হয়ে রানু হলে তীক্ষ্ণ স্বরে বলত, তুমি পৃথিবীর সব রহস্য জেনে বসে আছ? অপলা, রানু নয়। অপলা না হয়ে অন্য কোন মেয়ে হলে বলতো, ওমা আপনি এতকিছু কি ভাবে জানেন? প্রতিটি মানুষ আলাদা, একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোন মিল নেই।

: দুলাভাই!

: বল।

: টগরকে আমার কাছে দিন। আপনার কষ্ট হচ্ছে।

: তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

: না, আমার অভ্যাস আছে।

মোড়ের দোকানটির কাছাকাছি আসতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। অপলা অবাক হয়ে বলল,–কি আশ্চর্য বৃষ্টি পড়ছে কেন? যেন বৃষ্টি পড়াটা উচিত নয়। তিনি হেসে ফেললেন।

: আপনি হাসছেন কেন?

: তুমি আমার কথাটা এমন ভাবে বিশ্বাস করেছ দেখে হাসছি। লেখকদের কথা চট করে বিশ্বাস করতে নেই।

: আপনি এত আস্তে আস্তে হাঁটছেন কেন? দৌড়ে গিয়ে ঐ বারান্দায় ওঠেন। টগর ভিজে যাচ্ছে যে।

তিনি সত্যি সত্যি দৌড়ালেন। তার গলা জড়িয়ে টগর খিল খিল করে হেসে উঠল। সে খুব মজা পেয়েছে। ওসমান সাহেব হালকা গলায় বললেন, এই বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকবে না। এক্ষুনি থেমে যাবে।

: আপনার কোন কথা আমি এখন আরবিশ্বাস করি না।

: বিশ্বাস কর আর না কর বৃষ্টি থামবেই। যে বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয় সে বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকে না।

: আপনি এমনভাবে কথা বলেন যে মনে হয় সত্যি কথা বলছেন।

: একজন লেখকের গুণ হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কথা বলা।

ওসমান সাহেবের বৃষ্টির কথাগুলি মিলে গেল। চট করে বৃষ্টি থেমে গেল। দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলি মুহূর্তের মধ্যে নেমে গেল রাস্তায়। দারুণ ব্যস্ত সবাই। এ রকম একটা মেঘলা সন্ধ্যায় কারোরই তেমন কোন কাজ থাকার কথা নয়। অথচ সবাই এমন ব্যস্ত যেন এই মুহূর্তে ছুটে না গেলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।

অপলা বলল, ইস, টগর ভিজে একেবারে কাই হয়ে গেছে। চকলেট নিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি বাসায় যাই।

'ভিজে কাই হয়ে গেছে" একটা নতুন ধরনের এক্সপ্রেশন। আগে কখনো শোনা যায়নি। তিনি মনে মনে নোট করে ফেললেন। কখনো না কখনো ব্যবহার করা যাবে।

কিন্তু সত্যি কি ব্যবহার করা যাবে? কোন দিন তিনি লিখতে পারবেন কিছু? আজকাল তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কাল রাতে দীর্ঘ সময় লেখার টেবিলে বসেছিলেন। বসে থাকাই হয়েছে। অন্য সময় কাগজে আঁকা বুকি করেন। একটি দুটি লাইনও লেখা হয় কাল তাও হয়নি। ঘুমুতে যাবার সময় মনে হয়েছে,

www.BDeBooks.Com

এভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না।

: দুলাভাই কি ভাবছেন?

: কিছু ভাবছি না।

: চলুন ফিরে যাই। কি কিনবেন কিনে নেন। টগরের ঠান্ডা লাগবে। দেখুন কাঁপছে।

টগর বলল, আমি যাব না। তিনি তাকালেন ছেলের দিকে। টগরের চোখ–মুখ উজ্জ্বল। তিনি বললেন, বাসায় যাবে না?

: না।

: না কেন? কোথায় যেতে চাও।

: তোমার সঙ্গে যাব।

তিনি তাকালেন অপলার দিকে। সে আবার বলল, বাসায় চলুন তো। আপা খুব রাগ করবে। নির্ঘাৎ টগরের ঠান্ডা লাগবে– দেখুন ওর দাঁত কির কির করছে।

রাস্তায় নেমেই ওসমান সাহেবের মনে হল রানুর কাছে ফিরে যাবার কোন অর্থ হয় না। রানুর কাছে না গিয়ে তিনি বরং রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবেন। এককালে এ রকম করতেন। বিয়ের পর রানুকে নিয়ে কিছুদিন হেঁটেছেন। রানু বিরক্ত হয়েছে। চোখ–মুখ কুঁচকে বলেছে,–এ কি বিশ্রী অভ্যাস। বিনা কারণে হাঁটছ কেন?

: তোমার ভাল লাগছে না।

: এর মধ্যে ভাল লাগার কি আছে?

রানুর স্বভাবই হচ্ছে প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়া। শিশুদের স্বভাব। শিশুরাই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করে। তার পেছনে থাকে শিশুর সরলতা। কাজেই তাঁদের প্রশ্ন শুনতে ভাল লাগে। বয়স্কদের বেলায় সেটা হয় না।

অপলা বলল,–এ রকম গম্ভীর হয়ে কি ভাবছেন?

: কিছু ভাবছি না।

: আচ্ছা দুলাভাই, আপনি কি রানু আপা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তার বিয়ের প্রসঙ্গে কিছু?

তিনি কিছু বললেন না। অপলা অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, নিশ্চয়ই আপনার কানেও গিয়েছে।

: ওর বিয়ের কথা বলছ?

: হ্যাঁ, আলম ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের গুজব।

: শুনেছি।

: এটা ঠিক না। আমি আপাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ওসমান সাহেবের কোন ভাবান্তর হল না। যেন তাঁর কিছুই যায়–আসে না। অথচ তার খুশী হওয়া উচিৎ। উচিত নয় কি?

অপলা মৃদু স্বরে বলল,–আমার মনে হয় আপা একদিন না একদিন আপনার কাছে ফিরে যাবে।

: তাহলে তুমি খুব খুশী হবে?

: হ্যাঁ।

: কেন বল তো?

অপলা এক মুহূর্ত ও না ভেবে বলল, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে দুলাভাই।

তিনি চমকে তাকালেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। অপলার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর খুব ইচ্ছে হল অপলার মুখের রেখাগুলি দেখতে। তিনি তার কোন এক উপন্যাসে লিখেছিলেন–একমাত্র কিশোরীরাই ভালবাসার কথা সরাসরি বলতে পারে। কোন বইতে বলেছিলেন? এমন নয় যে তিনি অসংখ্য উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তবু কেমন যেন ঝামেলা হচ্ছে। কিছুই আজকাল আর মনে করতে পারেন না। সব জট পাকিয়ে যায়। সব কিছুই কি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে?

রানু বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। সে তার শাড়ি বদলেছে। সামান্য কিছু সাজগোজও করেছে। কেন করেছে সে নিজেও জানে না। ওদের আসতে দেখে সে ভেতরে চলে গেল।

ওসমান সাহেব গেটের সামনে এসে বললেন, অপলা, আজ আর ভেতরে যাব না।

: কেন?

: যেতে ইচ্ছে করছে না। অন্য একদিন আসব।

: না না, এসব কি, চলুন। আপা অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।

: আমার জন্যে অপেক্ষা করছে না। নাও, টগরকে কোলে নাও। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

অপলা টগরকে কোলে নিল।

: ওর শরীর মনে হয় পুরোপুরি সারেনি। কেমন চটকরে ঘুমিয়ে পড়ল।

: ও কোলে উঠলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

তিনি বললেন, অপলা আমি যাচ্ছি। অপলা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার কি হয়েছে দুলাভাই?

: কিছু হয় নি। আমি লিখতে পারছি না।

: লিখতে না পারা কি খুব কষ্টের?

: হ্যাঁ, খুব কষ্টের। আচ্ছা যাই।

: দুলাভাই, প্লীজ আপনি রানু আপার সঙ্গে দেখা করে যান। আপনার পায়ে পড়ি। আমার একটা কথা রাখুন।

তিনি বড়ই অবাক হলেন। মেয়েটির গলায় এত কাতরতা কেন?

: আসুন দুলাভাই।

তিনি সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে শুরু করলেন। হঠাৎ তার বড় ক্লান্তি লাগলো। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কখনোই কিছু করতে পারেন না। মনের উপর অসম্ভব চাপ পড়ে।

রানু বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবেই কথা–টথা বলল। ওসমান সাহেব জানতে পারলেন সে শিগগীরই এ বাড়ি ছেড়ে দেবে। অফিসের কাছাকাছি একটি ফ্ল্যাট নেবে।

: তুমি দেখো তো,তোমার চোখে কোন খালি বাড়ি পড়ে কি না। তুমি তো হেঁটেই বেড়াও। নাকি এখন আর হাঁট না?

: হাঁটি। এখনো হাঁটি। বাড়ি চোখে পড়লে তোমাকে বলব।

তিনি উঠে পড়লেন। রানু সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে হঠাৎ করে বলল, মিলিকে একজন ভাল ডাক্তার-টাক্তার দেখানো উচিত। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

: আমার মনে হয় ও অসুস্থ।

: কি রকম অসুস্থ?

: বুঝতে পারছি না। ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও। ওর স্বামীর সঙ্গে কথা বল।

: বলব।

: তুমি তো যাও না ওদের বাসায়। যাও একদিন। ওর স্বামীকে বুঝিয়ে বল।

ওসমান সাহেবের বেশ মন খারাপ হল। রিকশায় উঠে তিনি মিলির মেয়েটির জন্যে তিন অক্ষরের একটি নাম ভাবতে লাগলেন। যার শুরু হবে ম দিয়ে। এবং এমন একটি নাম যা আগে কেউ রাখে নি।

প্রথমেই যে নামটি মনে হল সেটা হচ্ছে–ময়ূর। ময়ূর নাম কেউ কি আগে রেখেছে? পাখিদের নামে প্রচুর নাম আছে– দোয়েল, ময়না কিন্তু ময়ূরের নাম কেউ রাখেনি। অথচ কি চমৎকার একটি পাখি। নাম রাখার ব্যাপারে খুব সুক্ষভাবে হলেও কোন এক ধরনের সাইকোলজী কাজ করে। ফলের নামে আমরা নাম রাখি–আপেল, বেদানা, কমলা কিন্তু আম দিয়ে কারুর নাম নেই। এর কারণ কি? ওসমান সাহেব শব্দ করে হেসে উঠলেন। রিকশা-ওয়ালা চমকে পেছন ফিরে তাকাল। বোধ হয় তাঁকে পাগল ভাবছে। মিলির কাছে এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। কাল যাওয়া যাবে।

১৫

সকাল ন'টা।

এ সময় সাধারণত সবাইকেই ঘরে পাওয়া যায়।

মিলি বাসায় ছিল না। মিলির বর মতিয়ুর রহমান ছিল। এই ছেলেটিকে ওসমান সাহেব পছন্দ করেন। অথচ সে ঠিক পছন্দ করার মত মানুষ নয়। উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ। হিসেবী ও বৈষয়িক। তবু তাকে ভাল লাগে। কেন? চেহারার জন্যে নিশ্চয়ই নয়। মতিয়ুর রহমানের চেহারা ভাল নয়। গ্রাম্যভাব আছে। ওসমান সাহেবকে দেখে মতিয়ুর রহমান খুবই অবাক হল। অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

: ভাই সাহেব কেমন আছেন?

: ভাল।

: হঠাৎ এদিকে?

: এমনি এলাম। তেমন কোন কারণ নেই। মিলি কোথায়?

: মিলি ডাক্তারের কাছে গেছে। এখনি চলে আসবে।

: ঠিক আছে, আমি বসছি। মিলির সঙ্গে দেখা হয় না। অনেক দিন। ও আছে কেমন?

: ভালই আছে। অবশ্যি সব সময় কমপ্লেইন করে ঘুম হয় না। আমি কিন্তু

দেখি ঠিকই ঘুমুচ্ছে।

: ওষুধ খেয়ে ঘুমায়?

: না এমনিতেই ঘুমায়।

: একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখালে কেমন হয়?

; সাইকিয়াট্রিস্ট?

: হ্যাঁ। ও বোধ হয় ঠিক সুস্থ না।

মতিয়ুর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলল,

: ভাই সাহেব, আপনি কি আজ দুপুরে আমাদের সঙ্গে চারটা ডাল-ভাত খাবেন।

: খাব। আমি বিকেল পর্যন্ত থাকব এখানে। মিলি আসবে কখন?

: আমি ওকে আনার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি।

: লোক পাঠানোর দরকার নেই। ও আসুক ধীরে-সুস্থে।

: ডাক্তারের কাছে অন্য সময়ও যেতে পারবে। এখন এসে আপনার জন্যে নিজের হাতে রান্না-বান্না করুক। খুব খুশী হবে। আপনি কি হাত-মুখ ধোবেন?

: না। তুমি তোমার কাজ কর। আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। একা বসে থাকতে আমার খারাপ লাগে না। ভালই লাগে।

: আপনি বসে চা খান, আমি আধ-ঘন্টার মধ্যে আসছি।

: বাজারে যাচ্ছ নাকি?

: না মিলিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।

তিনি এদের এই বাড়িতে অনেক দিন পর এসেছেন। বাড়ির অনেক রকম পরিবর্তন হয়েছে। নতুন ঘর উঠেছে কয়েকটি। মিলিদের এই বাড়ি কিনে নেবার কথা ছিল, কিনে নিয়েছে কিনা কে জানে। সওদাগরদের বাড়ির মত বিশাল এক বাড়ি। আসবাবপত্র ঠাসা। এদের প্রচুর পয়সা হয়েছে মনে হয়। আগে এত সচ্ছলতা ছিল না।

মিলি বাড়িতে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কল কল করে বলল,

: তুমি আমার এখানে আসবে এটা আগে বললে না কেন?

: আগে বললে কি হত?

: কত কিছু করতাম।

: তোর মেয়ের নাম ঠিক করেছিস?

: হ্যাঁ মিনতি। নামটা কেমন ভাইয়া?

: সুন্দর নাম। আমি আসতে আসতে তোর মেয়ের জন্যে নাম ভাবছিলাম। তিন অক্ষরের 'ম' দিয়ে শুরু।

: কি নাম?

: ময়ূর।

: মিলি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

: ময়ূর?

: হ্যাঁ।

: ময়ূর কখনো নাম হয়? তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে না কি

www.BDeBooks.Com

ভাইয়া?

: বোধ হয় হচ্ছে।

মিলি খুব হাসতে লাগল। যেন অনেক দিন পর সে মজার একটা কথা শুনল। হাসির ভঙ্গিও অস্বাভাবিক। ওসমান সাহেব মনে মনে ভাবলেন–মিলি কি সত্যি অসুস্থ? মতিয়ুর রাগী চোখে তাকিয়ে আছে। হাসি থামলেই সে হয়ত কিছু বলবে। মিলি হাসি থামাল। তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। মতিয়ুর বলল, তুমি যাও রান্না–বান্না শুরু কর। বারটা বাজে।

: আমার রাঁধতে ইচ্ছা হচ্ছে না। অন্য কেউ রাঁধুক।

: তুমি কি করবে?

: আমি ভাইয়ার সঙ্গে গল্প করব। তুমি কাউকে বল। কিংবা হোটেল থেকে কিছু আনিয়ে নাও।

মতিয়ুর চলে গেল। তার মুখ থম থম করছে। ঘরে রান্না–বান্না করার কেউ হয়ত নেই। খুব সহজেই মিলি হোটেলের প্রসঙ্গ এনেছে–তার মানে এরা প্রায়ই হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নেয়। কিন্তু ওর শাশুড়ি তো এখানে থাকেন। তিনি থাকতে হোটেলের খাবার আসবে এ বাড়িতে?

: ভাইয়া তুমি কি মাকে কখনো স্বপ্নে দেখ।

ওসমান সাহেব ভেবে পেলেন না হঠাৎ মা'র প্রসঙ্গ কেন এল। মিলি কি এলোমেলোভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছে। তিনি মিলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। মিলি হালকাভাবে বলল,

: আমি প্রায়ই দেখি। রোজ রাতে দেখি। কালও দেখেছি।

: কি দেখিস।

: দেখি মা খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে আমার কাছে এসে দাঁড়ান। অস্পষ্ট স্বরে বলেন, ভুল হয়ে গেছে মিলি, কিছু মনে করিস না। তখন আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করি।

: কি নিয়ে ঝগড়া?

: জানি না কি নিয়ে। মা এত ভাল মানুষ ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমি ঝগড়ার স্বপ্ন কেন দেখব?

: স্বপ্ন স্বপ্নই।

: না, স্বপ্ন স্বপ্ন না। স্বপ্নের অনেক মানে আছে।

মিলি কাঁদতে শুরু করল। তিনি কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

: কান্না থামা মিলি।

: মিলি সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামাল। ওসমান সাহেব বলবেন, আমি কিছুদিন আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকব।

: কেন?

: এমনি। কোন বিশেষ কারণ নেই।

: আমিও তোমার সঙ্গে যাব ভাইয়া।

: একা থাকার জন্য যাচ্ছি। দলবল এসে গেলে তো আর একা থাকা যাবে না।

: এখানে তো একাই থাকতে।

: তা ঠিক।

: গ্রাম এবং শহরে বেশ–কমটা কি হচ্ছে?

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, অনেক দিন থেকে কিছু লিখতে পারছি না। পরিবেশ বদলে দেখতে চাই লাভ হয় কি না।

: তোমার রান্না–বান্না করে দেবে কে?

: লোকজন পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

: যাবে কবে?

: কাল।

: রানু ভাবী জানে?

: না।

মিলি খানিকক্ষণ ইতস্তত: করে বলল, গতকাল রানু ভাবী আর আলম ছেলেটিকে দেখলাম রিকশা করে যাচ্ছে। হাত ধরাধরি করে দু'জন বসে আছে। ওসমান সাহেব হেসে ফেললেন। মিলি বিরক্তি স্বরে বলল, হাসছ কেন?

: এমি হাসছি।

মিলির কোন ভাবান্তর হলো না। ওসমান সাহেব বললেন, কাউকে দিয়ে সিগারেট আনিয়ে দে। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। মিলি উঠল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল। যেন সে তাঁর কথা শুনতে পায় নি।

: মিলি।

: বল।

: মতিয়ুরের সঙ্গে কথা বলছিলাম– সে তোকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চায়।

: জানি, পাগলের ডাক্তার। তোমার কি মনে হয় আমি পাগল?

: না, পাগল হবি কেন?

: আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলছ–আসলে তোমার নিজেরও ধারণা আমি পাগল। তা না হলে ডাক্তারের কথা তুলতে না।

: তুই এত সুন্দর লজিক বের করেছিস। এরপরও তোকে পাগল বলবে কে?

: বলে, সবাই বলে। আমার শাশুড়ি এখন আমাকে দেখে এমন ভয় পান, আমি ঘরে ঢুকলেই চমকে উঠেন। পাগলকে মানুষ যেমন ভয় পায় সে রকম আর কি।

বলতে বলতে মিলি খিল খিল করে হাসতে শুরু করল। সে হাসি আর কিছুতেই থামে না। ওসমান সাহেব অবাক হয়ে মিলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতস্থ একজন মানুষের হাসি। মতিয়ুর ঘরে ঢুকে ধমক দিল, আবার কি শুরু করেছ? মিলির হাসি থেমে গেল। সে থমথমে গলায় বলল, আমি হাসতেও পারব না?

: তুমি রান্না ঘরে যাও তো মিলি।

: না, আমি রান্না ঘরে যাব না। এখানেই থাকব। এবং ভাইয়াকে সব কথা বলে দেব আমি। ভাইয়া শোন ও এখন আমাকে ঘর থেকে বেরুতে দেয় না। গেটে তালা দিয়ে রাখে। কাউকে টেলিফোনও করতে দেয় না। টেলিফোনের মাউথ পিস খুলে রেখেছে। সে যখন কাউকে টেলিফোন করতে চায় তখন মাউথ পিস লাগায়।

: মিলি তুমি রান্না ঘরে যাও তো।

BDeBooks.com

: না, আমি যাব না। কি করবে তুমি? মারবে আমাকে? বেশ তো মার।

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ক্ষিধে লেগেছে মিলি, খাওয়ার ব্যবস্থা কর। মিলি শান্ত মেয়ের মত সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। হাসি মুখে বলল, দশ মিনিটের মধ্যে খাবার দেব। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওসমান সাহেব মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন, আর সামনে মতিয়ুর রহমান বসে আছে। দুজনের কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

মিলিদের বাড়ি থেকে তিনি বের হলেন সন্ধ্যার পর। রিকশা ওয়ালাকে বললেন, আমি কোথাও যাব না। শহরেই খানিকটা ঘুরব। তোমার যে দিকে যেতে ইচ্ছা করে সেদিকে যাও।

রিকশাওয়ালা ইতস্তত: করছে। মন ঠিক নেই এমন কাউকে রিকশায় তুলতে তার হয়ত দ্বিধা আছে।

১৬

আজকাল ফয়সল সাহেবের ঘুমের রুটিনে অদল-বদল হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। বেশ গাঢ় ঘুম। সেই ঘুমের স্থায়িত্ব কম। জেগে উঠেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এবং জেগেই নিজের উপর রেগে যান। ভয়ঙ্কর রাগ। কেন দীর্ঘদিনের এই ক্রীতদাস শরীর তার কথা শুনবে না মৃত্যু কি এসে যাচ্ছে? সে কি অপেক্ষা করছে বাইরে। দেখতে সে কেমন? ফয়সল সাহেবের মনে হল সে দেখতে অন্ধ ভিখারীদের মত। নোংরা পূতিগন্ধময় তার পোষাক। হাতে লম্বা লম্বা কালো নখ। সমস্ত গায়ে কুষ্ঠ-রোগীর ঘা। সেই ঘা থেকে লালাভ রস ঝরছে।

আজও ফয়সল সাহেব নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে জেগে উঠলেন। ঘড়ি দেখলেন-সন্ধ্যা ছ' টা। হঠাৎ তাঁর খটকা লাগল সন্ধ্যা না সকাল? তাঁর মাথা দুলতে লাগল। সময়ের জ্ঞান কি চলে যাচ্ছে? এ কেমন কথা? তিনি ভয় পাওয়া গলায় ডাকলেন, বীথি বীথি!

বীথি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল। সাদা একটা শাড়ি তার গায়ে। লাল একটা শাল ছড়িয়ে দিয়েছে শাড়ির উপর। শালের উপর মাথার ঘন কালো চুল এলিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য এই সব দৃশ্য তিনি আর বেশী দিন দেখবেন না। একজন অচেনা-অজানা যুবক এই মেয়েটির হাত ধরে ছাদে হাঁটাহাঁটি করবে। অসহ্য। ফয়সল সাহেবের মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়ল।

তিনি মুখ কুঁচকে ফেললেন। বীথি ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার আমাকে ডেকেছেন?

: হুঁ।

: কি জন্যে?

: এখন সকাল না সন্ধ্যা?

: বীথি বিস্মিত হয়ে বলল, সন্ধ্যা।

: সন্ধ্যা হলে কোথাও আলো নেই কেন?

: বারান্দার বাতিটা জ্বালিয়ে দেব?

: দরকার নেই, তুমি বস আমার পাশে।

বীথি বসল।

: এত দূরে বসছ কেন? নাকি বুড়ো মানুষদের কাছে বসতে ভাল লাগে না? চেয়ারটা টেনে আরো কাছে নিয়ে এসো।

বীথি চেয়ার টানল। ফয়সল সাহেব বীথির ডান হাতের উপর নিজের হাত রাখলেন। বীথির কোন রকম ভাবান্তর হল না। যে ভাবে বসেছিল ঠিক সে ভাবেই বসে রইল।

: বীথি!

: জ্বি।

: আমি এই বাড়িটা তোমার নামে লিখে দিয়ে যাব।

বীথি কিছু বলল না। ফয়সল সাহেব বললেন,

: বার কাঠা জমির উপর বাড়ি। জমির ভ্যালুয়েশনই হবে তোমার বিশ লাখ টাকা। বাড়ির দাম আর ধরলাম না। কি কথা বলছ না কেন?

বীথি শান্ত স্বরে বলল, চা খাবেন স্যার? চা নিয়ে আসি?

: না, চা আনতে হবে না। বসে থাক চুপচাপ। হাত ধরে আছি বলে কি তোমার খারাপ লাগছে?

: জ্বি না স্যার।

ফয়সল সাহেব বীথির ফর্সা হাতের দিকে তাকালেন। কি ফর্সা হাত! কি নরম! এই কোমল পেলব হাতের উপর তাঁর হাতটাকে কি কুৎসিত দেখাচ্ছে। তাঁর বুকের ভেতর একটি নিঃশ্বাস পাক খেতে লাগল। ভোগ করবার কত কি আছে পৃথিবীতে কিন্তু সময় এত অল্প। কিছুই ভোগ করা যায় না। সময় এত কম।

: বীথি!

: জ্বি স্যার।

বাড়ি টা তোমাকে দান করে যাব। বুঝতে পারছ?

: অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, বাতি জ্বেলে দেই?

: দাও।

: বীথি উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাল। এই মেয়েটি আরো সুন্দর হয়েছে। ঘন কালো চোখ। এত কালো চোখ হয় মেয়েদের?

: বীথি!

: জ্বি!

: চোখে কাজল দিয়েছ নাকি?

: জ্বি না।

: তুমি যাচ্ছ কোথায়?

: আপনার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।

: কিছু আনতে হবে না। যেখানে বসেছিলে সেখানে বসে থাক।

বীথি এসে বসল। ফয়সল সাহেব আবার তাঁর হাত তুলে নিলেন। সময় ফুরিয়ে আসছে। নখদন্ত নিয়ে অপেক্ষা করছে কুৎসিত মৃত্যু! সে তার অন্ধ চোখে তাকিয়ে আছে বারান্দার দিকে।

ফয়সল সাহেবের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। "বৃক্ষ বার বার তার

www.BDeBooks.Com

যৌবন ফিরে পায়। প্রতি বসন্তে নতুন পাতা আসে তার গায়ে কিন্তু মানুষের যৌবন আসে একবার।" কোথায় পড়েছেন এটা? কার লেখা? ওসমানের কোন বইতেই কি পড়েছেন? এমন একটি চমৎকার কথা তার অপদার্থ ছেলে কি করে লিখবে? নিশ্চয়ই অন্য কেউ লিখেছে। আজকাল কিছু মনে থাকে না।

: বীথি।

: জ্বি।

: ওসমানকে একটা টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করতো–"বৃক্ষ বার বার তার যৌবন ফিরে পায়" এই কথাটা সে তার কোন বইয়ে লিখেছে কি না।

: লিখেছেন। বইটির নাম হচ্ছে...

: থাক নামের দরকার নেই। তুমি যাও বাতিটা নিভিয়ে দাও। আলো চোখে লাগছে।

: বীথি আলো নিভিয়ে দিল।

১৭

রানু আজ একটু সকাল সকাল অফিস থেকে এসেছে। টগরকে নিয়ে এক বার ডাক্তারের কাছে যাবে। দিন দিন এমন রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন সে? ভিটামিন টিটামিন কিছু খাওয়ানো দরকার।

বাসায় ঢুকতে গিয়ে সে চমকে গেল। বসার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। সিগারেটের গন্ধ আসছে। অথচ ঘর তালাবন্ধ থাকার কথা। অপলা কলেজ থেকে ফিরবে পাঁচটায়। টগর খালার কাছে। অসময়ে তালা খুলে ঘরে বসে থাকবে কে?

আলম বসেছিল। রানুকে দেখে সে ফ্যাকাশেভাবে হাসল। রানু বলল, ঘরে ঢুকলে কি ভাবে?

: নিচ থেকে চাবি এনে খুলেছি।

: ভাল করেছ। কেমন আছ তুমি?

আলম জবাব দিল না। তার ফর্সা গাল ঈষৎ লাল হয়ে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাকে নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ বলা যাবে না। কিন্তু আজ তাকে নার্ভাস লাগছে। রানু অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। একজন নার্ভাস মানুষ হঠাৎ অস্বাভাবিক কিছু করে বসতে পারে। রানু বেশ সহজভাবেই বলল, তুমি বস, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।

আলম কিছু বলল না। আরেকটি সিগারেট ধরাল। রানু বলল, চা-টা কিছু খাবে?

: না। পানি খাব। এক গ্লাস পানি দাও।

রানু পানি দিয়ে গেল। আলম একটি চুমুক দিয়েই গ্লাস নামিয়ে রাখল। বিস্বাদ কিছু মুখে দিলে মানুষের চোখ-মুখ যেভাবে বিকৃত হয় তার চোখ মুখও সে রকম হয়েছে। আলম বলল, একটু তাড়াতাড়ি আসবে রানু।

: তোমার কি কোন তাড়া আছে?

: না।

: তাহলে বস। আমার দেরী হবে না।

রানু দেরী করতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে আলমের সামনে বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সব সময় সব কিছু ভাল লাগে না। আলম একটি চমৎকার ছেলে। তার সঙ্গে গল্প করতে রানুর ভাল লাগে। কিন্তু আজ কেন জানি ইচ্ছা করছে না।

রানু অনেকখানি সময় নিয়ে গোসল করল। বালতিতে ভেজা কাপড় ছিল সেগুলি ধুয়ে ফেলল। কাজটা উল্টা করা হল। কাপড়গুলি আগে ধোয়া উচিত ছিল। সে দ্বিতীয়বার গায়ে পানি ঢালতে লাগল। তার মধ্যে কি শুচি বায়ুর কোন লক্ষণ দেখা দিচ্ছে? সম্ভবত দিচ্ছে। বাইরে কোথাও গেলেই সমস্ত শরীর নোংরা মনে হয়। এসব আগে ছিল না। নতুন দেখা দিয়েছে।

আলম গম্ভীর মুখে বসে আছে চেয়ারে। বসার ভঙ্গি রাগী রাগী। রানু ঘরে ঢুকেই বলল, দেরী করে ফেললাম তাই না?

: হ্যাঁ তা করেছ। ঠিক এক ঘন্টা ছ'মিনিট দেরী করেছ।

: আই এ্যাম সরি।

আলম শীতল স্বরে বলল, তুমি ইচ্ছা করে এতটা দেরী করলে। আমার মনে হয় তুমি আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ।

: এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করব কেন?

: আমি জানি না কেন? কিন্তু তুমি করছ। এটা অবশ্যি নতুন না, প্রায়ই তুমি এরকম কর। কর না? বল কর, কি কর না?

: আমরা সবাই কখনো কখনো প্রিয়জনদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। আমি যেমন করি তুমিও তেমন কর। ঠিক না?

আলম জবাব দিল না। রুমাল বের করে মুখ মুছল। এটা তার বিদায় নেবার লক্ষণ। উঠবার সময় হলেই সে রুমাল বের করে মুখ মোছে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নেয়। অভ্যাসটা মেয়েলী। পুরুষ মানুষদের চেহারা সম্পর্কে এতটা সচেতন হওয়া ঠিক না।

: আলম বলল, আমি উঠছি।

: এখনই উঠবে কি? বস, চা খাও।

সে হ্যাঁ না কিছুই বলল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল।

রানু চা বানাতে চলে গেল। অপলা এসে ঢুকল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পাঁচটা বেজে গেছে নাকি? অপলা আসে পাঁচটার দিকে।

: আলম ভাই কেমন আছেন?

: ভাল।

: এমন মুখ কাল করে রেখেছেন কেন? আপার সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি?

: না।

: দারুণ একটা খবর আছে–দাঁড়ান বলছি। ভেরী এ্যাকসাইটিং। অপলা রান্না ঘরে চলে গেল।

: তোমার অফিস কেমন হলো আপা?

: ভাল।

: টগর ফেরে নি এখনো?

: না।

: দারুণ একটা ব্যাপার হয়েছে আপা।

রানু কোন রকম উৎসাহ দেখাল না। অপলা প্রায়ই দারুণ খবর বলে। যে সব খবর বলে সেগুলি খুবই হালকা ব্যাপার।

আজ আমাদের কলেজে নবীন বরণ উৎসব হল। দু'জন বিখ্যাত লেখককে আনা হয়েছিল। একজন হচ্ছেন....আন্দাজ করত কে?

: রানু জবাব দিল না।

: দুলাভাই। চমৎকার একটা বক্তৃতা দিলেন। এমন সব হাসির কথা বলতে লাগলেন–আমরা হাসতে হাসতে বাঁচি না। দুলাভাই যে এমন হাসাতে পারেন জানতাম না। সাধারণ সব গল্প এমন অন্য রকম করে বলতে লাগলেন–একটা গল্প হচ্ছে একজন ভূতের গল্পের লেখককে নিয়ে। ভদ্রলোক একদিন দুপুরবেলা গল্প লিখতে বসেছেন....

: বলতে হবে না। গল্পটা আমি জানি। তুই বসার ঘরে চা-টা দিয়ে আয়।

: গল্পটা শেষ করে যাই এক মিনিট লাগবে।

: শেষ করার দরকার নেই।

অপলা থেমে থেমে বলল, দুলাভাই লোকটিকে তুমি পছন্দ না করতে পার কিন্তু তার গল্পগুলি তো ভাল। গল্প তো কোন দোষ করেনি?

রানু উত্তর না দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অপলা চা দিতে গিয়ে গল্প শুরু করেছে। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে–

বুঝলাম আলম ভাই, আমিতো ভাবিনি দুলাভাইকে দেখব। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম। বহু কষ্টে সামলেছি। অনুষ্ঠান শেষে অটোগ্রাফ নেবার জন্য ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। আমিও অচেনা মেয়ের মত খাতাটা বাড়িয়ে দিয়েছি। তারপর কি হয়েছে শুনেন....

আলমের কোন কথা শোনা যাচ্ছে না। সে নিশ্চয়ই থমথমে মুখে বসে আছে।

বাড়ির সামনে রিকশা এসে থেমেছে। একজন অপরিচিত লোক টগরকে কোলে করে নামছে রিকশা থেকে। কার না কার হাতে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বাবা। রানু টগরের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। টগর তাকাল। হাসল না, হাত নাড়ল না, কিছুই করল না। কি যে অদ্ভুত হচ্ছে ছেলেটা। সমস্ত দিন মা'কে দেখেনি কিন্তু সে নির্বিকার। যেন মাকে সারাদিন দেখতে না পাওয়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

বসার ঘরে অপলা একাই কথা বলে যাচ্ছে। আর তার উচ্ছ্বাস এবং আবেগ দুইই খুব উঁচু তারে বাঁধা। দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে এটাই কি উচ্ছ্বাসের মূল কারণ?

: আলম ভাই এই গল্পটা শোনেন। একজন লেখক শুধু ভূতের গল্প লেখেন। একদিন দুপুর বেলায়...

: অপলা তোমার গল্পটা অন্যদিন শুনব। আজ আমার একটা কাজ আছে আমি উঠব।

: এক মিনিট লাগবে। বসুন না।

: প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। অন্য একদিন শুনব।

: বসুন আপাকে ডাকি।

: না থাক, ওকে ডাকতে হবে না।

: আলম ভাই আপনাদের কি রাগারাগি হয়েছে?

: না না কিছুই হয় নি।

আলম ঘর থেকে বের হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টগর ঢুকল। অপলা ব্যস্ত হয়ে পড়ল টগরকে নিয়ে।

: এই টগর আজ কি হয়েছে বলত?

: কি হয়েছে।

: আমাদের ফাংশনে একজন বিখ্যাত লোক এসেছিলেন। সেই লোকটি লম্বা। চোখে কাল চশমা। বল তো লোকটি কে?

: বাবা?

: হুঁ। যা কাণ্ড হয়েছে না।

: কি হয়েছে?

রানু বসার ঘরে ঢুকে দেখল–টগর অপলার কোলে বসে আছে। মাকে ঢুকতে দেখে লাজুক ভঙ্গিতে হাসল।

: কেমন ছিলে সারাদিন, টগর?

: ভাল।

: সারাদিন বাসাতেই ছিলে না অন্য কোথাও গিয়েছিলে?

টগর সে কথার জবাব দিল না। মুখটিপে হাসল। যেন এটি একটি অপ্রয়োজনীয় কথা, এর জবাব দেবার দরকার নেই। বাবার কিছু কিছু স্বভাব সে পেয়ে যাচ্ছে। যে সব প্রশ্নের জবাব দেবার সে কোন প্রয়োজন মনে করবে না সে সব প্রশ্নের সে জবাব দেবে না। রানু সব সময় ভাবত টগরের বাবা এটা অন্যদের ভাগিয়ে দেবার জন্যে করে থাকে। এখন মনে হয় না। এখন মনে হয়, এটা তার স্বভাব। রানু বলল,

: টগর, দুপুরে কি দিয়ে ভাত খেয়েছ?

টগর এই প্রশ্নটিরও জবাব দিল না। সম্ভবত এটাও তার কাছে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন। সে অপলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বলল। রানু শীতল স্বরে জিজ্ঞেস করল, কি বলছ টগর? টগর চুপ করে রইল। অপলা হাসি মুখে বলল, দুলাভাই আমাদের ফাংশনে কি বললেন তাই জানতে চাচ্ছে।

: এটা ফিস ফিস করে বলার দরকার কি?

: হয়ত ভাবছে তুমি রেগে যাবে।

: আমি রেগে যাব কেন?

: না রাগলেও বিরক্ত হবে। তার কথা উঠলেই তুমি নীরব হও। হও না?

রানু লক্ষ্য করল অপলা কাটা কাটা জবাব দিচ্ছে। তার গলার স্বর তীক্ষ্ণ। যেন সে একটা ঝগড়া বাঁধাতে চায়। রাগিয়ে দিতে চায় রানুকে। টগর অপলার গলা জড়িয়ে ধরে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। রানু সহজ স্বরে বলল, যাও টগর, হাত-মুখ ধুয়ে আস। আমি তোমাকে নিয়ে হাঁটতে যাব।

: কোথায়?

: রাস্তায় হাঁটব। শিশু পার্কের দিকেও যেতে পারি। যাবে?

www.BDeBooks.Com

টগর মাথা নাড়ল। সে যাবে কিন্তু তার মধ্যে তেমন কোন উৎসাহ দেখা গেল না। যেন নেহায়েত মাকে খুশী করবার জন্যে রাজি হওয়া।

রাতে ঘুমুতে যাবার আগে রানু উঁকি দিল অপলার ঘরে। সে গভীর মনযোগে খাতা খুলে দেখছে। রানুকে ঢুকতে দেখেই সে খাতা বন্ধ করে ফ্যাকাসে ভাবে হাসল। রানু লক্ষ্য করল অপলার মুখ লালচে হয়ে আছে।

: তোর এখানে একটু বসি অপলা?

: বস। আমার এখানে বসতে হলে আবার অনুমতি লাগবে নাকি?

অপলা নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। রানু বলল, তোর ঐ খাতায় তোর দুলাভাই কি অটোগ্রাফ দিয়েছে?

: হুঁ।

: দেখতে পারি?

: অপলা খাতা বের করল। দু'লাইনের একটি লেখা–'হায় সখী, এত স্বর্গপুরী নয়। পুষ্পে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়'। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা দেখতে ভাল লাগে।

অপলা ভয়ে ভয়ে বলল, যারা অটোগ্রাফের জন্যে গিয়েছে দুলাভাই তাদের সবার খাতাতেই এ রকম সুন্দর সুন্দর লাইন লিখে দিয়েছেন।

: জানি। এ রকম অসংখ্য লাইন তার মুখস্ত।

: তুমি রাগ কর নি তো আপা?

: রাগ করব কেন?

অপলা মাথা নিচু করে বসে রইল। রানু বলল, কিন্তু তুই এমন ভাব করছিস যেন তোকে একটা প্রেমপত্র লিখে দিয়েছে। তুই এই লেখাটা কম করেও এক লক্ষ বার পড়েছিস। পড়িস নি।

: তুমি শুধু শুধু রাগ করছ আপা।

: না রাগ করছি না। একজন লেখক তার ভক্ত পাঠিকাকে সুন্দর একটা কবিতার লাইন লিখে দিয়েছে এতে রাগ করার কিছু নেই। কিন্তু সেই পাঠিকা যদি মনে করে এই লাইনটি তার জন্যেই লেখা তাহলেই মুশকিল।

: কি মুশকিল?

রানু বলল, তোকে একটা গল্প বলি শোন–আমার বিয়ের পর পর একবার একটি মেয়ে তাকে চিঠি লিখল। বিবাহিতা মেয়ে। বিয়েতে ওর কিছু বই পেয়েছিল। সেই বই পড়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে লেখা চিঠি। ও চিঠির জবাব দিল। মেয়েটি আবার লিখল–চমৎকার চিঠি। তারপর একদিন এল দেখা করতে। মেয়েটি দেখতে ভাল নয়। কালো বেঁটে অসম্ভব রোগা। তোর দুলাভাই মেয়েটিকে দেখেই রেগে গেল। মুখ কালো করে বলল,–আমি এখন লিখছি, এখন কথা বলতে পারব না। অথচ এই মেয়েটিকে সে সুন্দর চিঠি লিখেছে, বই পাঠিয়েছে।

: তারপর?

: তারপর আবার কি। তোর দুলাভাই চলে গেল অন্য ঘরে। মেয়েটি ঘন্টাখানিক বসে রইল। আমি দু'–একটা কথা–টথা বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে নি।

দুলাভাই আর কথা বললেন না?

: না। তবে মেয়েটি যদি সুন্দরী হত সে তার সামনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা সাহিত্য নিয়ে আলাপ করত। আগ্রহ নিয়ে বলত জীবন কি, জীবনের মানে কি? মেয়েটি আবার ঘুরে ঘুরে আসত।

অপলা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। রানু বলল, লোকটির মধ্যে কোন কিছুর প্রতি কোন মমতা নেই। মানুষের প্রতি যার মমতা নেই সে লেখক হতে পারে না। লেখকরা মানুষের কথা লেখেন। মমতা ছাড়া তাদের কথা লেখা যায় না।

: কিন্তু তিনি তো লিখছেন।

: ঐ সব ট্রাস। ডাস্টবিনে ফেলে দেবার জিনিস। যে কবিতার লাইন তোর খাতায় লিখেছে তার পেছনেও কোন সত্য নেই। অন্যের ধার করা লাইন। তার গল্প উপন্যাসও সে রকম। তুই ঐ পাতাটি ছিঁড়ে ফেলে দে।

অপলা অবাক হয়ে বলল, কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি, ছিঁড়ে ফেল।

: না, ওটা আমি ছিঁড়ব না।

: দে পাতাটা আমার কাছে।

অপলা খাতা দিল না। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। রানু খাতাটা হাতে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলল।

: আপা তুমি এ রকম করলে কেন?

: ঠিকই করেছি।

: না, তুমি ঠিক করনি। এটা আমার জিনিস। আমার জন্যে লেখা। এটা তুমি ছিঁড়তে পার না। তোমার নিজের যা আছে সে সব ছিঁড়ে ফেল। আমারগুলি কেন?

অপলা কেঁদে ফেলল। রানু বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল অপলার দিকে। সে নিজেও নিজের আচরণে খুব অবাক হয়েছে। সে কেন এরকম করল? সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছে আলমের জন্যে। আলম আজ না এলে এটা হত না। তার আসার কারণেই রানু অস্থিরতায় ভুগছিল। খাতা ছিঁড়ে ফেলার পেছনে অন্য কোন যুক্তি নেই : এমন ছেলেমানুষি একটি কান্ড রানু করতে পারে না।

: অপলা, আই এ্যাম সরি। কি মনে করিস না।

অপলা টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছে। রানু তার পিঠে হাত রাখল। হঠাৎ তার মনে হল–অপলার মত একটি মেয়ের সঙ্গে ওসমানের বিয়ে হলে বেশ হত। এই কথাটি তার কেন মনে হল কে জানে।

ওসমান সাহেব বাথরুমে হাত–মুখ ধুচ্ছিলেন। কাল রাতে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। চোখ লাল হয়ে আছে। মাথা ভার ভার। এই অবস্থাতেই তাঁকে বেরুতে হবে। আজ অনেকগুলি কথা বলবেন। কলেজে যাবেন। প্রিন্সিপ্যালকে বলবেন–মাষ্টারী আর করব না। আমি অসুস্থ। মাষ্টারীতে মন বসছে না। রানুর কাছে যাবেন। রানুকে বলবেন বেশ কিছু দিনের জন্য তিনি গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন। নবীর কাছে যেতে হবে। নবী খবর পাঠিয়েছে খুব দরকার।

ওসমান সাহেব বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখলেন–রানু এসেছে। সকাল সাতটায় হঠাৎ তার আসার কোন কারণ নেই।

: কি ব্যাপার রানু?

রানু সহজ স্বরে বলল, তুমি একটা কাগজে লিখে দাও—হায় সখা এত স্বর্গপুরি নয়। পুষ্পে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়। তারপর নাম সই কর।

: কেন?

: দরকার আছে। এই নাও কাগজ।

ওসমান সাহেব লিখতে বসলেন।

লিখতে লিখতে বললেন, তুমি কেমন আছ রানু? রানু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, বাবার শরীর খারাপ হয়েছে। বেশ খারাপ।

: তাতে তো তোমার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। অন্যের অসুখ-বিসুখে তোমার কিছু যায় আসে না। তোমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সুখে থাকলেই হল। ওরা সুখে আছে তো?

তিনি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন বস। কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে আমার ভাল লাগে না। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা ঝগড়ার আর বসার ভঙ্গিটা হচ্ছে সন্ধির।

: বসলেই সন্ধি হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে? কেন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে আমাকে ভুলাতে চাইছ? আমি অপলা নই।

ওসমান সাহেব কাগজ এগিয়ে দিলেন। রানু দেখল শুধু দুটি লাইনই নয় বেশ ক'টি লাইন সেখানে লেখা। 'বিদায় অভিশাপ' পুরো কবিতাটি তার মুখস্ত। বিয়ের রাতে কি মনে করে যেন সে কবিতাটি শুনিয়েছিল। হয় তো রানুকে অভিভূত করতে চেয়েছিল। রানু কি অভিভূত হয়েছিল। রানুর মনে পড়ল না।

১৮

মিলি বসে আছে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

মিলির বর এতটা আশা করেনি। তার ধারণা ছিল ডাক্তারের কাছে যাবার কথা শুনে সে রেগে উঠবে। হৈ চৈ করবে। ইদানীং সে খুব হৈ চৈ করছে। কিন্তু আজ সে বেশ শান্ত। সহজ সুরে পাশে বসা মহিলার সঙ্গে কথা বলছে। মহিলা পান খাচ্ছেন। তিনি নিশ্চয়ই পেসেন্ট নন। কোন রোগী ডাক্তারের কাছে এসে এমন আরাম করে পান চিবোয় না। মিলি তার বরকে হাত ইশারা করে ডাকলো। মতিয়ুর নড়ল না। কাছে গেলেই মিলি হয়ত চট করে রেগে যাবে। সহজ স্বাভাবিক ভাব মুহূর্তের মধ্যে মাটি হবে। মিলি নিজেই এগিয়ে এল। হাসি মুখে বলল, আমাকে একটা পান এনে দেবে? পান খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ডাক্তারের কাছেও সে বেশ স্বাভাবিক রইল। মাথা নিচু করে শান্ত গলায় বলল, পান খাচ্ছি বলে রাগ করছেন না তো? ডাক্তার সাহেব হাসলেন।

: না, রাগ করব কেন?

: আমার বড় ভাই খুব রাগ করেন।

: তাই বুঝি?

: হুঁ। কাউকে পান খেতে দেখলেই তার নাকি গরুর জাবর কাটার কথা মনে হয়। ভাইয়া এমনিতে খুব গম্ভীর। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব মজার কথা বলে! আপনি তোমার আমার ভাইকে চেনেন তো?

: হ্যাঁ নামে চিনি। টিভিতে একবার দেখেছিলাম কি একটা প্রোগ্রামে যেন এসেছিলেন। টিভিতে খুব লাজুক মনে হচ্ছিল।

: উনার কোন বই পড়েছেন?

: গল্পের বই পড়ার অভ্যাস আমার খুব কম।

: আমারো কম। ভাইয়া আমাকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছে, সেটি শেষ করতেও আমার এক মাস লেগেছে। আপনি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

: বিশ্বাস করব না কেন?

: কেউ বিশ্বাস করে না।

মিলি হাই তুলল। সন্ধ্যাবেলার দিকে তার একবার প্রচণ্ড ঘুম পায়। তারপর বাকি রাতটা কাটে জেগে। কি কষ্ট! কি কষ্ট!

: আপনার ভাইকে আপনি খুব পছন্দ করেন?

: হুঁ।

: আর কাকে পছন্দ করেন?

: আর কাউকে না।

: কাউকে না?

: না।

: না। আমার এই কথাটিও আপনি বিশ্বাস করছেন না, তাই না?

: বিশ্বাস করব না কেন?

: আমার কেন জানি শুধু মনে হয় কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। আমি অবশ্যি খুব মিথ্যা কথা বলি।

: সে তো আমরা সবাই বলি। আমিও বলি।

মিলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ডাক্তার সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিলি বলল,

: আপনি আমার সব কথাতেই সায় দিচ্ছেন কারণ আপনার ধারণা আমি পাগল তাই আমাকে না রাগাবার চেষ্টা করছেন।

: আপনার ধারণা ঠিক নয়। আপনি একজন সুস্থ মানুষ। আপনার কথায় সুন্দর লজিক আছে। একজন মানসিক রোগীর কথা-বার্তায় কোন লজিক থাকে না। প্রায়ই ওরা বুদ্ধিমানের মত কনভারসেসন চালিয়ে যেতে পারে কিন্তু লজিকে এসে আটকে যায়।

: আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই পাগল।

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেললেন। মিলিও হাসল। এই ডাক্তারটিকে তার পছন্দ হয়েছে।

ক্লিনিক থেকে বেরিয়েই মিলি বলল, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে পারছি না। মতিয়ুর বলল, বাসায় যাচ্ছি। বাসায় গিয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। সে তার স্ত্রীর হাত ধরল। অনেক দিন পর সে স্ত্রীর প্রতি অন্য এক ধরনের মমতা অনুভব করছে। অসহায় শিশুর জন্য যে ধরনের মমতা অনুভব করা হয় সে ধরনের মমতা।

মিলি বলল, আমার বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না।

www.BDeBooks.Com

: বাসায় না গেলে কোথায় যাবে? রাস্তায় ঘুরবে খানিকক্ষণ?

: না। আমাকে ভাবীর বাসায় নিয়ে চল। অনেকদিন ভাবীকে দেখি না। তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

: কাল সকালে গেলে হয় না?

: সকালে উনাকে পাওয়া যাবে না। অফিসে চলে যান। তা ছাড়া এখন আমার যেতে ইচ্ছা করছে, সকালে হয়ত যেতে ইচ্ছা করবে না। ভাবীর সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে।

: কি কথা?

মিলি জবাব দিল না। তার ঘুম পাচ্ছে। গাড়িতে উঠেই সে চোখ বন্ধ করে এলিয়ে পড়ল। কে জানে আজ রাতে হয়ত তার গাঢ় ঘুম হবে। জেগে জেগে রাত কাটাতে আর ভাল লাগছে না।

মতিয়ুর নরম গলায় বলল, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে তোমার কি কথা হল?

: তেমন কোন কথা হয়নি। আমি পান খাচ্ছিলাম তো তাই দেখে উনি খুব রেগে গেলেন।

: রাগলেন কেন?

: ভাইয়ার মত স্বভাব। ভাইয়াও তো রাগত।

বলেই মিলি হাসল। মতিয়ুর আর কিছু বলল না।

মিলিকে দেখে রানু খুবই অবাক হল।

: একি অবস্থা তোমার মিলি। শরীরের এ রকম হাল কেন?

: আমি পাগল হয়ে গেছি ভাবী।

: কি বলছ আবোল-তাবোল। আস, তুমি বিছানায় শুয়ে থাক। তোমার এতটা শরীর খারাপ হয়েছে আমি জানতামই না।

টগর চোখ বড় বড় করে দেখছে মিলিকে। অপলক তাকিয়ে আছে। মিলি বলল, ভাবী ওকে বল চলে যেতে, আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে ঘুমাব। বলেই সে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। এই কথাটি সে দীর্ঘদিন পরে বলল। তার বিয়ের পরও সে বেশ অনেকবার অসময়ে চলে এসেছে রানুর কাছে। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলেছে, ভাবী আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমাব। রানু হেসে বলল, ঝগড়া কিছু করেছ?

: না, ঝগড়া না। এমনি। ভাইয়াকে বল অন্য ঘরে ঘুমুতে। আজ সারা রাত গল্প করব আমরা দু'জন। কেমন ভাবী?

: হ্যাঁ করব।

গল্প অবশ্যি করা হত না। শোয়া মাত্রই মিলি ঘুমিয়ে পড়ত। নিশ্চিন্ত ঘুম। আজ অনেক দিন পর মিলির আবার হয়তো পুরানো শখ জেগে উঠেছে। সারারাত গল্প করার কথা বলবে কিন্তু বিছানায় যাওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়বে।

মতিয়ুর মিলিকে রেখে যেতে রাজি হল না। নিচু গলায় বলল, ওর শরীর খুবই খারপ। ও যে কি পরিমাণ বিরক্ত করে ধারণাও করতে পারবেন না। রাতে একজন ডাক্তার এসে থাকেন। আজ সে অনেক ভাল। কতক্ষণ এরকম ভাল থাকবে বলা মুশকিল।

: হঠাৎ করে এ রকম হল কেন?

: হঠাৎ করে হয়নি। ধীরে ধীরে হয়েছে। আপনি অনেক দিন পর দেখছেন

বলে আপনার কাছে এ রকম লাগছে।

: ডাক্তার কি বলছেন?

: তেমন কিছু বলছেন না। বলার মত হয়ত কিছু নেই। আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি, ঘন্টাখানিক বা ঘন্টা দু'এক পর পাঠিয়ে দেবেন।

মিলি বিছানায় শুয়ে ছিল। অপলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। টগর অনেক দূরে বসে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মিলি টগরের প্রতি কোন রকম উৎসাহ দেখাল না। যেন সে টগরকে চিনতে পারছে না।

রানু বলল, তুমি কিছু খাবে মিলি?

: আমি কিছুই খাব না। তুমি আমার পাশে বস।

: তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে আমাকে কিছু বল নি কেন।

: বললে তুমি কি করতে?

মিলি ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। থেমে থেমে বলল, আমার জন্যে কেউ কখনো কিছু করে না। আমার মা করে নি, আমার বাবা করেনি, তুমি কেন করবে? তুমি তো বাইরের মেয়ে। রানু কিছু বলল না। চেয়ার টেনে মিলির পাশে এসে বসল।

: আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি। তখন একদিন বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। কারণ খুব সামান্য। মা'র একটা শাড়ি পরে ছাদে হাঁটছিলাম। বাবার ধারণা হল পাশের বাসার একটা ছেলের সঙ্গে খাতির জমানোর চেষ্টা করছি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ তো ভাবী?

: করছি।

: আমি অবশ্যি প্রচুর মিথ্যা কথা বলি, তবে মাঝে মাঝে সত্যি কথাও বলি। আমারই হয়ত লেখক হওয়া উচিত ছিল কিন্তু লেখক হয়ে গেল ভাইয়া। যে তার সারা জীবনে কোন মিথ্যা কথা বলেনি। মজার ব্যাপার, তাই না ভাবী?

মিলি তাকালো রানুর দিকে। সে হয়ত মনে মনে ভেবেছে এই জায়গাতে রানু আপত্তি করবে। কিন্তু রানু কিছু বলল না। মিলি বলল, ভাইয়া প্রসঙ্গে এই কথাটা কি আমি ঠিক বললাম ভাবী?

: বোধ হয় ঠিক।

তবে আমার কি মনে হয় জান ভাবী, আমার মনে হয় সব মানুষের মিথ্যা বলার অভ্যেস থাকা উচিত। এতে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ভাইয়ার যদি মিথ্যা বলার অভ্যাস থাকতো তাহলে আর তোমাদের এই ঝামেলা হত না।

রানু ঠান্ডা গলায় বলল, তোমার তো মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে। তোমাদের খুব ঝামেলা হয় না?

: হয়।

: মিথ্যা কথা বলা না বলার উপর কোন সম্পর্ক নির্ভর করে না।

মিলি একটি নিঃশ্বাস ফেলল। অপলা বলল, আপনার বাবা আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন তারপর কি হল সেটা বলুন, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। রানু বিরক্ত স্বরে বলল, ঐসব শুনে কি হবে?

: আমার শুনতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আপা।

মিলি হাসি মুখে বলল, ব্যাপারটা খুব কষ্টের কিন্তু এখন কেন জানি আমার হাসি লাগছে। বাবা আমাকে ছাদ থেকে ডেকে আনলেন, তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, যে ছেলেটিকে ভুলাবার জন্যে তুমি এত সাজসজ্জা করে ছাদে হাঁটাহাটি করছ তার সঙ্গে চলে যাও। এই বলেই দারোয়ানকে গেট বন্ধ করে দিতে বললেন। আমি গেটের বাইরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গায়ে ঝলমলে একটা শাড়ি। কিন্তু পায়ে কিছু নেই। খালি পায়ে ছাদে হাঁটছিলাম তো।

: তার পর?

: তার পরটা শুনে কি হবে? বাদ দাও। বাবার স্বভাবই ছিল এ রকম। আমাদের দুই ভাই বোনকে কি পরিমাণ কষ্ট যে দিয়েছেন। ভাইয়ার প্রথম বই যখন বের হল খুব হৈ চৈ হল। অল্প দিনের মধ্যেই ভাইয়া বিখ্যাত হয়ে গেল। তখন বাবা ইংরেজীতে একটা বিশাল প্রবন্ধ লিখলেন এবং সেই প্রবন্ধে প্রমাণ করলেন যে বইটা কোন এক ফরাসী বিখ্যাত উপন্যাসের দুর্বল অনুকরণ। মিলি শব্দ করে হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। রানুর এই প্রথমবারের মত মনে হল মিলি বেশ অসুস্থ।

: বুঝলে ভাবী, আমরা দু'জন খুব কষ্ট করেছি।

রানু কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, তোমার মেয়ে কেমন আছে?

: জানি না কেমন আছে। বোধ হয় ভালই আছে।

: জান না মানে?

: ওতো আমার সঙ্গে থাকে না। এককে সময় এককে জনের সঙ্গে থাকে। এখন আছে তার এক ফুপুর সঙ্গে। আমার তো মাথার ঠিক নেই–আমার সঙ্গে রাখতে ভরসা পায় না। কখন কি করে বসি। কয়েকদিন আগে আমার কাছে এনেছিল, আমি এমন ভান করলাম যেন চিনতে পারছি না। আমি মাঝে মাঝে পাগলের ভান করি এবং বেশ ভালই করি।

মিলি আবার উঁচু স্বরে হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতেই বলল, ভাবী আমি উঠব।

: এখনই উঠবে?

: হ্যাঁ, এসো তুমি আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দাও।

রানু বলল, টগরকে আদর করলে না? সব সময় তো আদর করতে।

: এখন আমার আর ছোট বাচ্চাকাচ্চা ভাল লাগে না ভাবী। টগর যাই? অপলা যাচ্ছি কেমন?

: আবার এসো।

: না, আমি আর আসব না।

: কেন?

মিলি হাসতে হাসতে বলল, আর আসতে ইচ্ছা করবে না। অপলা হেসে ফেলল। মিলি বলল, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না, তাই না? মাঝে মাঝে আমি কিন্তু সত্যি কথা বলি।

রানু মিলিকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামল। মিলি বলল, আমি নিজে নিজেই নামতে পারব। আমাকে যতটা দুর্বল দেখাচ্ছে তত দুর্বল আমি না। আমি বেশ শক্ত। মাঝে মাঝে দুর্বল হবার ভান করি।

: কেন কর?

: যাতে ও আমাকে ভালবাসে।

মিলি আবার হেসে ফেলল। আদুরে গলায় বলল, আমার শুধু ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে।

রানু বলল, সে তো সবারই করে। মিলি শান্ত স্বরে বলল, না সবার করে না। যেমন তুমি, তোমার কি করে?

রানু জবাব দিল না।

: ভাবী, এখন বিদেয় হচ্ছি। বক বক করে সবার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি। পাগল মানুষ, কি করব বল?

১৯

রাত তিনটায় ফয়সল সাহেব একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। তার ইদানীং কালের স্বপ্নগুলি অস্পষ্ট কিন্তু আজ রাতের স্বপ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি দেখলেন একটা প্রকান্ড নেকড়ের মত জন্তু তাকে কামড়াচ্ছে। বাঁ পায়ে কামড় দিয়ে একটুকরা মাংস সে ছিঁড়ে নিল। তিনি জেগে উঠলেন বাঁ পায়ে তীব্র ব্যথা নিয়ে। জেগে উঠে ও তাঁর মনে হল সত্যি সত্যি তাঁর পা থেকে নেকড়েটা বোধ হয় মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন ও সত্যের সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি ভয় পাওয়া গলায় বীথিকে ডাকতে লাগলেন।

বীথি এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। নরম স্বরে বলল, কি হয়েছে স্যার?

: স্বপ্ন দেখেছি।

: কি স্বপ্ন?

: কি স্বপ্ন মনে নেই। তুমি ওসমানকে টেলিফোনে ধর দেখি।

: এখন অনেক রাত স্যার।

: সেটা কি আমি জানি না? তোমাকে যা করতে বলেছি কর।

বীথি টেলিফোন সেট শোবার ঘরে নিয়ে এল। ওসমান সাহেবকে পেতে দেরী হল না। বীথি অস্পষ্ট স্বরে বলল, আপনি স্যারের সঙ্গে কথা বলুন।

: হ্যালো ওসমান?

: জ্বি। কি ব্যাপার বাবা?

: ব্যাপার কিছু না। তুই কি করছিলি?

: ঘুমাচ্ছিলাম। রাত তিনটা বাজে।

: রাত তিনটা বাজলেই ঘুমাতে হবে এমন কোন কথা নেই। রাত তিনটার সময়ও অনেকে জেগে থাকে।

: তা থাকে। আপনি কিছু বলবেন?

: হ্যাঁ বলব। আমি এই বাড়িটা বীথির নামে দানপত্র করতে চাই।

: করতে চান করুন।

: তা তো করবই। তোর অনুমতি লাগবে নাকি? আমি করেই রেখেছি। আলমারীতে দলিল আছে। তোকে টেলিফোন করলাম এই জন্য যাতে পরে কোন ঝামেলা না হয়।

www.BDeBooks.Com

: কি ঝামেলা হবে?

: তোরা যদি মনে করে বসিস যে আমার মাথার ঠিক ছিল না। কোর্ট-কাছারি করা শুরু করিস।

: এ সব কিছুই করব না। আপনার শরীর কি ঠিক আছে?

ফয়সল সাহেব কিছু না বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। বীথিকে বললেন, আমার মধ্যে যে সব খারাপ জিনিস আছে তার কোনটাই আমার ছেলের মধ্যে নেই। ও ছোট বেলা থেকে আমাকে দেখে দেখে নিজেকে ঠিক করেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মানুষ উল্টোটা করে। খারাপটাই শেখে।

বীথি বলল, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

হুঁ লাগছে। তুমি একটা টেলিফোন কর এম্বুলেন্সের জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যাও। চেষ্টা করে দেখ আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পার কি না।

ফয়সল সাহেব চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে বসলেন। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্ধ ভিখারীর ছবিটি তাঁর সামনে ভেসে উঠল। ভিখিরীটির সঙ্গে এবার একটি নেকড়ে আছে। নেকড়েটির মুখ হাসি হাসি। পশুরা হাসতে পারে না কথাটা ঠিক না। ছোটবেলায় ভালুকের খেলা দেখাতে একটি লোক এসেছিল। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে ভালুকটা তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য। তিনি প্রায় রাতেই এই ভালুকটাকে স্বপ্নে দেখতেন।

ফয়সল সাহেব চোখ মেললেন। বীথি টেলিফোন করছে। কি সুন্দর লাগছে। কি চমৎকার একটি দৃশ্য।

: বীথি।

: জ্বি স্যার।

: পাওয়া গেছে কাউকে?

: এম্বুলেন্স আসছে স্যার।

: কাউকে খবর দেয়ার দরকার নেই। তুমি একাই আমাকে নিয়ে যাও।

বীথি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

ফয়সল সাহেব মারা গেলেন এম্বুলেন্সে। নিঃশব্দ মৃত্যু। বীথি তাঁর হাত ধরে বসেছিল। সে পর্যন্ত বুঝতে পারল না। যেমন হাত ধরে ছিল তেমনি ধরে থাকল।

২০

মিলি একাই কাঁদছে।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন বাবার মৃত্যু তাকে তেমন অভিভূত করতে পারছে না। অস্বস্তি লাগছে এই পর্যন্তই। তার মনে হল, এখন যদি কেউ বলে- আপনার এখানে থাকার দরকার নেই আপনি চলে যান, তাহলে তিনি খুশীই হবেন। তাঁর প্রচণ্ড চায়ের পিপাসা হচ্ছে।

ফয়সল সাহেবের শরীর সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। সাদা চাদর এখানে একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে।আড়াল মানেই রহস্যময়তা। গোল্ড রীমের চশমা পরা একজন ডাক্তার এসে বলল, আপনারা সবাই এখানে ভিড় করছেন কেন? বাইরে অপেক্ষা করেন। ডেডবডি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।

মিলি চেঁচিয়ে কাঁদছে। গ্রাম্য ধরনের কান্না। বিরক্তিকর। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, চুপ কর মিলি। মিলি চোখ বড় বড় করে বলল, কেন চুপ করব, কেন?

: সবাইকে বিরক্ত করছিস।

: বেশ করছি।

ওসমান সাহেব ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গেলেন। যেন ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, আমরা এক্ষুণি ডেডবডি নেবার ব্যবস্থা করব। আপনি কিছু মনে করবেন না। ডাক্তার তাকাল অবাক হয়ে।

: আপনি কে?

: যে মানুষটি মারা গেছেন আমি তাঁর বড় ছেলে।

ডাক্তার তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিস্ময়। ওসমান সাহেবের মনে হল শুধু বিস্ময় নয় অভিযোগও আছে। যেন সে বলছে তুমি মৃত ব্যক্তিটির ছেলে অথচ তোমার চোখ শুকনো, তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছ। তোমার বোনকে বলছ-কান্না বন্ধ করতে। এটা ঠিক না।

তিনি বারান্দায় চলে গেলেন। লম্বা বারান্দায় বহু লোকজন অপেক্ষা করছে। প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার মত খারাপ আর কিছুই নেই। এরা সবাই প্রতীক্ষা করছে। তিনি সিগারেট ধরালেন। ডেডবডি নেবার ব্যবস্থা তিনি না থাকলেও হবে। এবং ভালভাবেই হবে। এর মধ্যে তার আর থাকতে ইচ্ছা করছে না। থাকার প্রয়োজনও নেই। এ সমস্ত কাজের জন্যে প্রচুর উৎসাহী লোকজন আছে। এরা খুব আগ্রহ নিয়ে ছুটাছুটি করবে।

আচ্ছা তিনি কি তাঁর কোন উপন্যাসে মৃত্যু বর্ণনা করেছেন? তিনি মনে করতে পারলেন না। তবে দীর্ঘ বর্ণনা কোথাও নেই এটা প্রায় একশ ভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়। মৃত্যু ব্যাপারটি তিনি সব সময় এক দুই লাইনে সারতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণা তিনি একা নন মৃত্যুর বর্ণনা খুব কম লেখকই দিয়েছে। সবার মধ্যে একটা পাশ কাটানোর ভাব। প্রায় সবাই ফিলসফি করার চেষ্টা করেছেন। মূল বর্ণনা তেমন নেই।

শরৎচন্দ্রের দেবদাসেরও একই ব্যাপার। শরৎচন্দ্র পাঠককে বললেন-মরণে ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই সময় একটি সুখকর স্পর্শ কপালে আসিয়া পৌঁছে যেন একটি দয়ার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে জীবনের ইতি হয়।

: ওসমান সাহেব।

তিনি চমকে তাকালেন। বেঁটে মত লোকটিকে চিনতে পারলেন না। কিছু কিছু মুখ সব সময় অচেনা থাকে। দীর্ঘ পরিচয়েও তাদের কখনো চেনা মনে হয় না।

: আপনি এখানে কি করছেন?

: কিছু করছি না।

: সবাই আপনাকে খুঁজছে।

: কেন?

: ডেডবডি বের করতে হবে না?

: বের করুন। আমাকে দরকার কেন?

: বেঁটে লোকটি অবাক হয়ে বলল, সেকি আপনি ধরবেন না?

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

: সিগারেট নিন স্যার।

তিনি সিগারেট নিলেন। ধন্যবাদ জাতীয় কিছু বলা উচিত, বলতে পারলেন না। বলার বোধ হয় প্রয়োজনও নেই।

: নাজমুল সাহেব, যাই।

: স্যার আবার দেখা হবে।

: অন্য দিনের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ডাক্তার সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। ওসমান সাহেব থেমে থেমে বললেন, অনেক দিন পর আপনি আমার বড় বোনের কথা মনে করিয়ে দিলেন। থ্যাংকস।

ন'টার মধ্যে ফয়সল সাহেবের বাড়ি মানুষজনে ভরে গেল। ঢাকা শহরের পরিচিত অর্ধ পরিচিত সব আত্মীয় স্বজন চলে এসেছে। গেট দিয়ে ঢুকেছে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ মুখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। একদল ঘুরে বেড়াচ্ছে অলস ভঙ্গিতে, অন্য একদল দারুণ ব্যস্ত। যদিও এতটা ব্যস্ততার কোনই কারণ নেই। সবাইকে খবর দেয়া। পত্রিকার অফিসে নিউজ পাঠানো। ফটোগ্রাফার এনে ছবি তোলানো। অসংখ্য কাজ।

ওসমান সাহেব দোতালার বারান্দায় চাদর গায়ে দিয়ে বসেছিলেন। তাঁর একটু শীত শীত করছে। বীথি এসে বলল, আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন না। শীত লাগছে তো।

: না ঠিক আছে। মিলি কি করছে?

: ও শুয়ে আছে।

: জ্ঞান ফিরেছে?

: হ্যাঁ ডাক্তার সিডেটিভ দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি কিছু খাবেন? দু'পিস কেক এনে দেই?

: দিন।

বলেই তাঁর লজ্জা লাগলো। দু'ভাই বোনের একজন ঘন ঘন ফিট হচ্ছে। অন্যজন দিব্যি বসে আছে। কেক বিসকিট খাচ্ছে।

: আপনি একটু মিলিকে ডেকে দিন।

: ওকে এখন আর ডাকাডাকি করবেন না। ঘুমুতে দিন।

: মিলির হ্যাসবেন্ড কোথায়?

: উনি মিলির সঙ্গে আছেন। উনাকে ডেকে দেব?

: না থাক।

বীথি খানিকক্ষণ ইতস্তত: করে বলল, ডেডবডি তো গ্রামের বাড়িতে যাবে। আপনি যাচ্ছেন তো সঙ্গে?

: গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে নাকি?

: হ্যাঁ। স্যার সেরকম বলে গেছেন। আপনি কি যাচ্ছেন সঙ্গে।

: কখন যাবে?

: কাল ভোরে। ট্রাক ভাড়া করতে গেছে। আপনি একটু কিছু মুখে দিয়ে নিচে

গিয়ে বসুন। এভাবে বসে থাকা ভাল দেখায় না।

: নিচে গিয়ে আমি করবটা কি?

: কিছু করতে হবে না। বসে থাকবেন।

ওসমান সাহেব নিচে নেমে আসতেই নতুন একটা উদ্দীপনা দেখা দিল। খাটের চারপাশে কয়েকজন দোয়া–দরুদ পড়ছিলেন, তাঁদের গলার স্বর হঠাৎ অনেকখানি উঁচুতে উঠে গেল। ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন অনেকেই রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। সম্পূর্ণই শোক দেখানো ব্যাপার। তাঁর বাবা এমন কোন মানুষ ছিলেন না যাঁর মৃত্যুতে পরিচিত মানুষজন চোখের জল ফেলবে।

তিনি কঠিন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কাউকে কখনো নরম স্বরে কিছু বলেন নি। আশপাশের প্রতিটি মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এত লোকজন রুমালে চোখ মুছছে ব্যাপারটা হাস্যকর।

ধূপকাঠি এবং আতরের গন্ধে ওসমান সাহেবের মাথা ধরে গেল। তবু তিনি বসেই রইলেন। লম্বা এবং রোগা ধরনের একজন মওলানা সাহেব কোরান শরীফ পড়ছেন। তাঁর গলা অপূর্ব কোরান পাঠের মত একটি ব্যাপার এত সুন্দর হতে পারে তা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। পড়ার ভঙ্গিতে, গলার স্বরে কোথাও যেন একটা অপার্থিব কিছু আছে যা মন ছুঁয়ে যায়। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

ওসমান একটু শুনে যাও তো।

তিনি চোখ মেললেন। মগবাজারের সিদ্দিক সাহেব। তাঁর দূর সম্পর্কের চাচা।

: একটু বাইরে আস আমার সাথে।

তিনি বারান্দায় এলেন। সিদ্দিক সাহেব নিচু স্বরে বললেন, ঘরের আলমারীর সব চাবী নিজের কাছে নিয়ে যাও, নয়তো হরির লুট হয়ে যাবে।

: হরির লুট হওয়ার মত কিছু নেই।

: তুমি বললেই হল, নাই। কিছুই জান না তুমি। ক্যাশ টাকাই আছে দশ–বার হাজার।

: দেখি।

: না, দেখাদেখির কিছু নাই। আর শোন, এই বাড়ি ভর্তি ফালতু লোকজন। এদের সরাবার ব্যবস্থা কর।

: কেন?

: পরে আর সরাতে পারবে না। গ্যাট হয়ে বসবে। দান করে গেছেন। হেন তেন সতেরো কথা বলবে।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না।

: তোমার বলতে লজ্জা লাগে তো আমি বলে দেব।

: আপনার বলার দরকার নেই।

: খুব দরকার আছে। তুমি ব্যাপারটার গুরুত্বই বুঝতে পারছ না। তা ছাড়া শুনলাম বাড়ি ঘর সব নাকি ঐ মেয়েকে দিয়ে গেছেন?

: হ্যাঁ, দিয়ে গেছেন।

: একদম চেপে যাও। আমি দেখব ব্যাপারটা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

ওসমান সাহেব আবার দোতলায় চলে এলেন। মিলি ঘুমায় নি, খুন খুন করে কাঁদছে। সে কি বাবার মৃত্যুর জন্যেই এমন কাঁদছে না পরানো কোন দুঃখের কথা

www.BDeBooks.Com

ভেবে ভেবে কাঁদছে? জানার কোন উপায় নেই। নিজের মনকেই কখনো জানা যায় না অন্যের মন জানার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ওসমান সাহেব সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ক্ষিধে লেগেছে। কটা বেজেছে কে জানে? বীথি এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কেন জানি ওসমান সাহেবের ইচ্ছা হল বীথির মুখ ভাল করে লক্ষ্য করতে। গালে চোখের জলের কোন চিহ্ন আছে কি না। চোখ লাল হয়ে আছে কিনা। তিনি হাত ইশারা করে বীথিকে ডাকলেন।

বীথি এগিয়ে এল।

: কিছু বলবেন?

ওসমান সাহেব নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, অনেকদিক ধরে আমি কিছু লিখতে পারছি না। বীথি তাকিয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, মৃত্যু আমার কাছে খুব ছোট ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। আমার কষ্ট অনেক বেশী।

বীথি কোমল স্বরে বলল, আপনি রানু ভাবীকে নিয়ে আসুন। একটা গাড়ি নিয়ে চলে যান।

: ওকে এনে কি হবে?

বাবার মৃত্যু সংবাদ তো অন্তত তাঁকে দিন। দেয়া উচিত। টগরকেও আনুন। ওসমান সাহেব রানুকে খবর দিতে গেলেন অনেক রাতে।

রানু ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত রাতে তাঁকে আসতে দেখে সে খুব অবাক হল। চিন্তিত মুখে বলল, কি হয়েছে? বাবার মৃত্যু সংবাদ দেবার বদলে ওসমান সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, রানু আমি কিছু লিখতে পারছি না।

২১

রানু অবাক হয়ে বলল, রাত এগারটার সময় তুমি আমাকে এই খবরটা দিতে এলে?

ওসমান সাহেব চুপ করে রইলেন। রানুর পেছনে পেছনে অপলাও এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে মুখে কৌতূহল. সে বলল, কি ব্যাপার দুলাভাই? রানু কাটাকাটা গলায় বলল, তোর দুলাভাই ইদানীং লিখতে পারছে না এই খবরটা দিতে এসেছে।

: দুলাভাই ভেতরে এসে বসেন

ওসমান সাহেব বসবার ঘরে এসে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বসলেন সোফায়। চাপা গলায় বললেন, টগর কি ঘুমুচ্ছে? রানু বলল, হ্যাঁ।

: ওর শরীর ভাল আছে?

: ভালই আছে।

: এক কাপ চা খাওয়াতে পার রানু? প্রচণ্ড শীত বাইরে।

রানু কিছুই বলল না। অপলা বলল, আপনি আরাম করে বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি। আপা তুমি খাবে?

: না।

: খাও না একটু। তিন কাপ নিয়ে আসি। গল্প করতে করতে খাব।

রানু কড়া চোখে তাকাল অপলার দিকে। অপলা সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। দুলাভাইয়ের হঠাৎ করে এই রাতের বেলা উপস্থিত হওয়াটা তার খুব ভাল লাগছে। কেমন যেন উৎসব মনে হচ্ছে তার কাছে। সে হালকা পায়ে চা আনতে গেল।

ওসমান সাহেব বললেন, রানু এক গ্লাস পানি খাব। রানু বলল, তোমার কি হয়েছে?

: আমার কিছু হয়নি।

: তোমাকে আমি খুব ভালভাবে চিনি। অকারণে তুমি এত রাতে এখানে আসবে না। তোমার অহঙ্কারে লাগবে। কি হয়েছে, বল

: বাবা মারা গেছেন

: কখন?

: রাতে। ঠিক টাইমটা বলতে পারব না। খেয়াল করিনি।

রানু দীর্ঘ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওসমান সাহেব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে লাগলেন। এক সময় বললেন,

: হঠাৎ করে বেশ শীত পড়ে গেল, তাই না রানু? নাকি শুধু আমার একারই শীত লাগছে?

: শীত পড়েছে।

রানু উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। খোলা দরজায় ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে? বাবা, তোমাকে খুব পছন্দ করতেন। রানু ঠাণ্ডা গলায় বলল, একটা মৃত্যু সংবাদ দিতে এসে তুমি নিজের লিখতে না পারার খবরটা আগে দিলে। লেখাটা কি এতই জরুরী?

তিনি কিছু বললেন না। রানু তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, লেখকরা অন্য মানুষদের চেয়ে আলাদা এটা আর যেই বিশ্বাস করুক আমি করি না।

: আমি আলাদা এটা কখনো দাবী করিনি।

: দাবী করতে হবে কেন? আচার-আচারণ দিয়ে তুমি বুঝিয়ে দিতে চাও তুমি আলাদা।

: তাই কি?

: হ্যাঁ তাই। তোমার বাবা মারা গেলেন। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। অথচ তুমি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে এসে বললে, রানু, আমি লিখতে পারছি না। এর মানে কি?

: মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

: একজন লেখক লিখতে না পারলে বাংলা সাহিত্যের এমন কোন ক্ষতি হবে না।

: বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি নিয়ে আমি ভাবি না। আমি আমার নিজের কথাই ভাবি।

: এটা ঠিকই বলেছ। নিজেকে ছাড়া তুমি আর কিছুই ভাবতে পার না।

রানু উঠে দাঁড়াল। ওসমান সাহেব বললেন, চলে যাচ্ছ নাকি?

: কাপড় বদলে আসি। যেতে হবে না? তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?

: আছে। মিলির গাড়ি নিয়ে এসেছি।

: ওরা গাড়ি কিনেছে নাকি?

: জানি না কিনেছে কি না।

: তা জানবে কেন?

অপলা চায়ের কাপ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, দুলাভাই আমার খারাপ লাগছে। আমি বুঝতেই পারিনি আপনি একটা মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছেন।

তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, তোমাকে অন্য রকম লাগছে কেন অপলা?

: কি রকম?

: একটু যেন অচেনা লাগছে!

: শাল গায়ে দিয়েছি তো সেই জন্যে। আপনি আমাকে শাল গায়ে দেয়া অবস্থায় কখনো দেখেন নি।

: তোমরা কখন কোন পোশাক পরে কার সামনে গিয়েছ এটা কি মনে রাখ নাকি?

অপলা লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, হাসতে হাসতেই বলল, চা-টা ভাল হয়েছে দুলা ভাই?

: খুব ভাল হয়েছে। চমৎকার। বস অপলা।

অপলা বসল তাঁর সামনে। তার মুখ হাসি হাসি। চোখচিকমিক করছে। এর মানে হচ্ছে ওসমান সাহেবের চেহারায় কোন দুঃখের ছাপ নেই। ছাপ থাকলে অপলা এমন খুশী খুশীভাবে তাঁর সামনে এসে বসত না। একজনের দুঃখ অন্য জনের উপর ছায়া ফেলে। ওসমান সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল।

: অপলা তুমিও চল আমাদের সঙ্গে?

: কোথায়?

: আমাদের বাড়িতে। টগরকেও নিয়ে চল।

: আপনি রানু আপাকে বলুন। আপা রাজি না হলে তো যাওয়া হবে না।

রানুকে কিছু বলতে হল না। সেই এসে অপলাকে তৈরী হতে বলল। টগরকে ঘুম ভাঙ্গিতে কাপড়- জামা পরাতে বলল। টগর কিছুই বলল না। যেন রাত দুপুরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাপড়-জামা পরানোটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। শিশু সুলভ কোন কিছুই তার মধ্যে নেই। এ রকম হচ্ছে কেন ছেলেটা?

রানু বলল, টগর আমরা তোমার দাদার বাড়িতে যাচ্ছি।

: আচ্ছা।

: তোমার দাদা মারা গেছেন।

টগরকে এবার কৌতূহলী হতে দেখা গেল। সে চোখ বড় বড় করে তাকাল। রানু বলল, মানুষ যখন খুব বুড়ো হয় তখন তারা মারা যায়।

: বাচ্চারা মারা যায় না?

: না।

টগর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বাচ্চারাও মারা যায়। আমি দেখেছি।

: কোথায় দেখলে তুমি?

টগর কোন উত্তর দিল না। রানু তীক্ষ্ম স্বরে বলল, কোথায় দেখলে তুমি বল শুনি।

: বলব না।

: বলবে না কেন?

: বলতে ইচ্ছা করছে না।

তারা বাড়িতে পৌঁছল একটার দিকে। টগরের চোখে ঘুমের লেশ মাত্র নেই। সে অপলার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে দেখছে চারদিকে। মাঝে মাঝে ফিস ফিস করে অপলার কানে কানে কি যেন বলছে এবং অপলা বিরক্ত হচ্ছে।

লোকজন বাড়িতে অনেক কম। বেশীর ভাগ আত্মীয়-স্বজনই চলে গেছেন। যারা আছেন তাঁদের একটা বড় অংশ বসার ঘরে ঝিমুচ্ছে। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। আগের জমজমাট ভাব এখন আর নেই। চারদিক মোটামুটিভাবে নিঃশব্দ। শুধু মওলানা সাহেব এখনো ক্লান্তিহীন। তিনি আগের মতই সুরেলা গলায় কোরান শরীফ পড়ছেন। সারা রাতই হয় তো পড়বেন।

ওসমান সাহেবের মনে হল এই মওলানা সাহেব এর আগেও নিশ্চয়ই অনেক মৃত মানুষের পাশে বসে কোরান শরীফ পড়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটিতেই এখন তিনি অভ্যস্ত। এটা তার একটা রুটিন কাজ। অথচ মনে হচ্ছে কি গভীর আবেগ নিয়েই না তিনি কোরান শরীফের আয়াত পড়ে যাচ্ছেন, একটির পর একটি। লেখকরাও তো অনেকটা সে রকম। রুটিন মত লিখতে বসেন। পাঠকরা সে লেখা পড়ে মনে করে কি গভীর আগেব ও মমতা নিয়েই না লেখাগুলি লেখা হয়েছে। পাঠকরা হাসে ও কাঁদে।

ওদের ঢুকতে দেখে বীথি এগিয়ে এলো। টগরকে বলল, বাবু তুমি আমার কোলে আসবে? টগর দু'হাত বাড়িয়ে দিল। যেন এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। অথচ বীথির সঙ্গে তার পরিচয় নেই। বীথি রানুকে বলল, আপনি আসুন আমার সঙ্গে, বাবুকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। রাতটা নিশ্চয়ই থাকবেন?

: হ্যাঁ থাকব।

: আপনার জন্য একটা ঘর গুছিয়ে রেখেছি।

রানু বীথির সঙ্গে দোতলায় উঠে গেল। অপলা বলল, এই মেয়েটি কে দুলাভাই?

: আমার বাবার সেক্রেটারী। বীথি।

: আশ্চর্য এমন সুন্দর মানুষ হয়?

: খুব সুন্দর নাকি?

: হ্যাঁ।

অপলা খুব অবাক হয়েছে। ওসমান সাহেবের মনে হল সৌন্দর্য ব্যাপারটা পরিবেশ নির্ভর। গভীর রাতে অপলা একটি অপরিচিত বাড়িতে এসেছে। সে বাড়িতে একটি মৃতদেহ আছে। স্বভাবতই অপলার মনে ভয় এবং সংশয় ছিল। সে নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছিল এ বাড়িতে এসে সে দেখবে চারদিকে সবাই কাঁদছে। এ রকম কিছু সে দেখেনি। সে দেখেছে বীথিকে। যার মুখে অন্য ধরনের একটি স্নিগ্ধতা আছে। যার কাঁধে হালকা নীল রঙের চাদর। পরনের শাড়ি সাদা রঙের। ছবিটি সুন্দর। কাজেই অপলার মনে হয়েছে সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর

www.BDeBooks.Com

রমণীটিকে দেখেছে। দিনের আলোয় এ রকম মনে হবে না। কিংবা হয়তো হবে। মনের উপর প্রথম যে ছাপটি পড়ে তা দীর্ঘদিন থেকে যায়।

অপলা হাঁটতে লাগল ওসমান সাহেবের পিছু পিছু। একবার ক্ষীণ স্বরে বলল, বিরাট বাড়ি আপনাদেরই দুলাভাই। রাজপ্রাসাদের মত। এটাও একটা আপেক্ষিক কথা। রাতের জন্যে বাড়িটি প্রকান্ড মনে হচ্ছে। দিনের আলোয় আর সে রকম মনে হবে না।

: অপলা।

: বলুন।

: কাল আমি ডেডবডি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাব। ঐ বাড়িটিও খুব সুন্দর। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

অপলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ দুলাভাই আমি যাব। তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। মওলানা সাহেব এক মনে কোরান পাঠ করছেন। সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন এ বাড়িতে একটি মৃত্যু ঘটেছে।

টগরকে ঘুম পাড়িয়ে রানু নিচে আসছিল। সিঁড়ির গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল। বারান্দার রেলিং ধরে অপলা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পাশেই ওসমান। দু'জনের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে অন্যরকম কিছু একটা আছে। রানুর বুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা লাগল।

২২

দিন কি খুব দ্রুত কাটে?

কারোর কারো হয়ত কাটে। কিন্তু ওসমান সাহেবের ধারণা তাঁর দিন চলছে শামুকের মত। এবং কখনো একেবারে চলছেই না, থেমে আছে।

কিন্তু আজ বীথির কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। দ্বিতীয় বারের মত বললেন, বাবা মারা গেছেন এক বছর হয়েছে? বলেন কি?

বীথি হালকা স্বরে বলল, সময় খুব দ্রুত যায়। বলেই সে হাসল। সেই হাসি সে ধরে রাখল অনেকক্ষণ। কেউ কেউ দীর্ঘ সময় হাসি ধরে রাখে। কেউ কেউ ধরে রাখে বিষাদ। দুটিই কঠিন কাজ। বীথি বলল, আপনি আসবেন আজ সন্ধ্যায়?

: কি হবে সন্ধ্যায়?

: তেমন কিছু না। একটা মিলাদ পড়াবার ব্যবস্থা করেছি। অল্প কিছু লোকজনকে আসতে বলেছি।

: আমি যাব। আপনার সমিতি কেমন চলছে?

: ভালই, আপনি তো কোনদিন দেখতে এলেন না।

: আজই তো যাচ্ছি। আজ দেখব। সমিতির মেয়েরা সব ওখানেই থাকে তো?

: সবাই থাকে না। কেউ কেউ থাকে। আমার মত যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তারা থাকে।

বীথি আবার হাসল। ওসমান সাহেবের মনে হল এই মেয়েটিকে তিনি মোটেই জানেন না। কখনো ভাল ভাবে লক্ষ্য করেননি, কখনো ভাবেননি। এক ধরনের মানুষ থাকে যাদের দেখে মনে হয় এদের ভেতর তেমন কোন রহস্য

নেই। এদের লক্ষ্য করার কিছু নেই। বীথিকে কখনো সে দলে ফেলা যাবে না। একজন রূপবতী তরুণীকে কখনো সে দলে ফেলা যায় না। তবু তিনি বীথির প্রতি অনাগ্রহ বোধ করেছেন কেন? বাবার কারণে কি? বাবা যে জিনিষটা পছন্দ করবেন তাঁকে সেটি অপছন্দ করতে হবে এমন কিছু কি তাঁর মানসিকতায় ঢুকে গেছে?

বীথি বলল, কি ভাবছেন?

: কিছু ভাবছি না।

বীথি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনার কাছে আমার একটি ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপার আছে। অনেকবার ভেবেছি ক্ষমা চাইতে আসব। কখনো ঠিক সাহস হয়নি।

ওসমান সাহেব বিস্মিত চোখে তাকালেন। বীথি বলল, স্যার আমাকে বাড়িটা লিখে দিয়েছিলেন কিন্তু আমার ধারণা ছিল এটা আমি কখনো পাব না। আপনারা আপত্তি তুলবেন। কোর্টে গেলে আপনাদের আপত্তি টিকে যাবে। কিন্তু আপনি উল্টোটা করলেন। বাড়িটি পেতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেটা দেখলেন।

: উল্টোটা করলাম বলেই কি আপনি ক্ষমা চাইতে এসেছেন?

: না, সে জন্যে না। স্যার আমাকে বেশ কিছু নগদ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। এটা আপনাদের কাছে গোপন করেছিলাম। ক্ষমা চাচ্ছি সে কারণেই।

বীথি সত্যি সত্যি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করল। ওসমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর একটা নাটকীয়তা আছে। নাটকীয়তা তাঁর পছন্দ নয়। বীথি বলল, কত টাকা তাতো জিজ্ঞেস করলেন না? আমার ধারণা ছিল লেখকদের কৌতূহল অনেক বেশী হয়।

: আমি মিথ্যামিথ্যি লেখক। আমার কৌতূহল কম।

: টাকাটা আমার খুব কাজে লেগেছে। সমিতিটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। টাকা ছাড়া কিছুই করা যায় না। যেই টাকা হয়েছে অমি আমার স্বপ্নটা সত্যি করে ফেলেছি।

বীথি উঠে দাঁড়াল। আত্মবিশ্বাস ভরপুর একজন তরুণী। চেহারায় অবশ্য আগের কোমলতা নেই। একটা কাঠিন্য এসে গেছে কিন্তু তার জন্যে খারাপ লাগছে না। চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। ওসমান সাহেবের মনে হল সব কিছুই মানুষের চেহারার সঙ্গে মানিয়ে যায়। যখন কেউ নতুন চশমা নেয় সেই চশমা মানিয়ে যায়। যখন চুলে পাক ধরে সেই পাকা চুল ও মানিয়ে যায়।

বীথি বিদায় নেবার সময় আরেকবার বলল, আপনি কিন্তু আসবেন।

ন'টার সময় যাবার কথা। ওসমান সাহেব তাঁর আগেই উপস্থিত হলেন। তাঁর জন্যে বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তিনি নিজেদের পুরানো বাড়িটি চিনতে পারলেন না। সামনের বাগানে লম্বা গুদাম ঘরের মত একটা ঘর উঠেছে। দু'পাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা ছিল, সেখানেও টিনের শেড দেয়া একতলা দালান। তিনি হকচকিয়ে গেলেন। বীথি বলল, চিনতে পারছেন না, তাই না?

: না, পারছি না।

: গুদাম ঘরের মত যে লম্বা ঘরটি দেখছেন এটা আমাদের সিউইং সেকশন। তেত্রিশটা ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন আছে।

: বলেন কি?

: দোতলার পুরোবাড়িটা হ্যান্ডিক্রাফট সেকশন, মেয়েরা এখানে হাতের কাজ শেখে। আমাদের কিছু অবৈতনিক ইনস্ট্রাকটর আছেন। এখন একজন জাপানী ইনস্ট্রাকটর পেয়েছি, হিরোকো কাওইয়া। সুন্দর বাংলা বলেন।

: এতসব করলেন কিভাবে?

: অনেকে সাহায্য করেছে। বিদেশী অর্গানাইজেশনগুলি সাহায্য করেছে। একটা বড় এমাউন্টের সরকারী সাহায্য পাওয়ার কথা। ওটা পেলে আমরা মীরপুরের মেয়েদের একটা হোস্টেল করব।

ওসমান সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বীথি গভীর আগ্রহে তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাতে লাগল। সঙ্গে সমিতির কিছু মেয়েও আছে তাদের সবার বয়সই ত্রিশের নীচে। তারা ওসমান সাহেবকে দেখছে কৌতূহলের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে নিচু গলায়। সবাই বেশ হাসিখুশী।

মিলাদে যাদের আসবার কথা ছিল, তারা কেউ এল না। সাতটার দিকে মিলিকে নিয়ে এল মতিয়ুর। তারও কিছু পর এলেন মগবাজারের সিদ্দিক সাহেব।

যে মৌলানা মিলাদ পড়াবেন তিনি ধাঁধায় পড়ে গেলেন। তিন জন পুরুষ মানুষকে নিয়ে তিনি সম্ভবত এর আগে মৃত্যু বার্ষিকীর মিলাদ পড়াননি। তিনি বিরক্ত গলায় সুরা বলতে লাগলেন এবং ঘড়ি দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর পর বলতে লাগলেন, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? বীথি প্রতিবারই বলতে লাগল আর কিছুক্ষণ দেখি। অনেকেরই আসার কথা।

মিলিকে দেখে ওসমান সাহেব অবাক হলেন। ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে গেছে। মাথাটা অস্বাভাবিক বড় লাগছে সেই কারণেই। মাথায় বাহারি একটি রুমাল। ওসমান সাহেব বললেন, মাথায় রুমাল কেন রে?

মিলি হাসিমুখে বলল, মাথা কামিয়ে ফেলেছি তো, সেই জন্যে রুমাল।

: মাথা কামিয়ে ফেলেছি মানে?

: কি সব কবিরাজী ওষুধ দেবে। মাথা না কামিয়ে দেয়া যায় না। প্রথমে আমি রাজি হই না। পরে ভাবলাম আমি পাগল মানুষ, মাথায় চুল থাকলেই কি না থাকলেই বা কি?

মিলি মাথার রুমাল খুলে ফেলেবলল, কেমন লাগছে আমাকে বলতো?

: ভালই লাগছে। কোজাকের মত।

: তোমার যদি মাথায় হাত বুলাতে ইচ্ছা করে হাত বুলাও।

: হাত বুলাতে ইচ্ছা করবে কেন?

: ন্যাড়া মাথা দেখলে হাত বুলাতে ইচ্ছা করে না? মনে নাই পাশের বাসার খোকন যখন মাথা কামাল, তখন আমরা শুধু ওর মাথায় হাত বুলাতাম।

মিলি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। ওসমান সাহেব মন খারাপ করে তাকিয়ে রইলেন। নরম স্বরে বললেন, মিলি, আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকব। তুই যাবি আমার সাথে?

: যাব ভাইয়া।

: তোর মেয়েকেও সঙ্গে নিবি।

: ও খুব কাঁদবে তো। আমাকে চেনে না। ন্যাড়া মাথা দেখে ভয় পায়।

: ভয় কেটে যাবে। ও তোর সঙ্গে যাবে, তুই ভাল হয়ে যাবি।

: আমারও ভাল হতে ইচ্ছা করে। পাগল হয়ে থাকতে ভাল লাগে না।

ওসমান সাহেবের মনে হল এইসব কথাবার্তা তো পাগলের কথাবার্তা নয়। সুস্থ মানুষের কথাবার্তা। কিন্তু তবু সে সুস্থ নয়। এটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

মিলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই পাজী মেয়েটা ঘরবাড়ি কেমন বদলে ফেলেছে দেখেছ? গুদাম বানিয়ে ফেলেছে। বাড়ি দেখে আমি এমন অবাক হয়েছি, ইচ্ছা করছে মেয়েটিকে একটা চড় দিতে।

মিলি সারাক্ষণ বক বক করতে লাগল। একসময় মতিয়ুর এসে বলল, আর কত, চুপ কর তো। কনটিনিউয়াস কথা বলে যাচ্ছ।

মিলি করুণ মুখে বলল, পাগল মানুষ কি করব বল।

মতিয়ুর রাগী চোখে তাকিয়ে রইল।

ওসমান সাহেব খুবই মন খারাপ করে বাড়ি ফিরলেন। প্রায় সারা রাত তাঁর ঘুম হল না। শেষ রাতের দিকে ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন। তাঁর কেন জানি মনে হল তিনি নিজেও পাগল হয়ে যাবেন। জীবন এত জটিল কেন? অসংখ্যবার নিজেকে এই প্রশ্ন করলেন। তাঁর নিজের একটি উপন্যাসের এক ছেলেও এই একই প্রশ্ন করেছিল। সে তার উত্তরও পেয়েছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে উত্তরটা ঠিক না। বিরাট একটা ফাঁকি আছে উত্তরে।

২৩

রানুরা নতুন বাসায় উঠে এসেছে। অফিসের ফ্ল্যাট। দু'টি বেড রুম দু'টি বারান্দা, ডইং কাম ডাইনিং। একটি ছোট্ট স্টোর রুমের মত আছে। বাসায় ঢোকার সময় আনন্দে রানুর চোখে পানি এসে গেল।এটি তার নিজের বাসা, সম্পূর্ণ নিজের মত করে সাজানো যাবে। স্বাধীনভাবে থাকা যাবে। খালা খবরদারি করতে আসবে না। টগরের জন্যে সুন্দর করে একটা রুম সাজিয়ে দেয়া যাবে। তার নিজের থাকার একটি ঘর। অপলা নেই, এটি একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। অপলা থাকলে ঘর ভাগ করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো। কিছুদিন থেকে অপলার সঙ্গে সম্পর্কও খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। কেন জানি তাকে আর সহ্য হত না।

সে এখন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে সীট পেয়েছে। তার পড়ার খরচ যে মামা দিতেন তিনি এই বাড়তি খরচ কিভাবে দেবেন তা রানু জানে না। ওটা তাদের ব্যাপার। অপলাকে সে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, খরচ কি ভাবে চালাবি?

সে শান্ত গলায় বলেছে, ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। দরকার হলে প্রাইভেট ট্যুশনী করব। বেশ কিছুদিন তুমি আমাকে থাকতে দিয়েছ তার জন্যে মেনি থ্যাংকস।

: তুই এমন করে কথা বলছিস কেন?

: আমি একটা খারাপ মেয়ে আপা। কি করব বল। যা মনে আসে বলে ফেলি। ক্ষমা করে দাও।

রানু ভাবেনি সত্যি সত্যি অপলা শেষ পর্যন্ত হোস্টেলে যাবে। তার ধারণা ছিল, শেষ পর্যন্ত টগরের জন্যেই যাওয়া হবে না। টগর যখন বলবে, তুমি যেতে পারবে না খালামনি। তখন তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব হবে।

www.BDeBooks.Com

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার টগর কিছুই বলল না। অপলা চোখ মুছতে মুছতে যখন বলল, টগর যাচ্ছিরে। সে কিছুই বলল না। যেন চলে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। অপলা বলল, কাদিস না। ব্যাটা ছেলের কান্না খুব খারাপ।

টগর অবাক হয়ে বলল, কই কাঁদছি না তো। অপলা একাই কেঁদে বুক ভাসিয়ে রিকশায় গিয়ে উঠল। রানু একবার ভাবল বলবে, থাক যেতে হবে না। কিন্তু তা বলা হল না।

অপলার এভাবে থাকতে অসুবিধা হবে। সমস্যা হবে। সব সমস্যারই সমাধান আছে। এই সমস্যারও নিশ্চয়ই কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

একটি কাজের মেয়ে পাওয়া গেছে। সে টগরের দেখাশুনা করতে পারবে। তা ছাড়া খুব বেশী সময় দেখাশোনা করতেও হবে না। টগরের স্কুল ছুটি হবে বারটায়। দু'টোর সময় রানুর অফিস ছুটি হয়। দু-তিন ঘন্টার ব্যাপার। টগর কোন অবুঝ ছেলে নয়। কেউ না থাকলেও সে দু-তিন ঘন্টা সময় অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারবে। ঘুর-দুয়ার গুছিয়ে বসতে তার পাঁচ-ছ'দিন লাগল। নিজেই ঘুরে ঘুরে কিছু ফার্নিচার কিনল। একটা কার্পেট কেনার খুব শখ ছিল। কিন্তু কেনা গেল না। অনেকগুলি টাকা একসঙ্গে বেরিয়ে যায়।

রানুর নতুন বাড়িতে ঘন ঘন আসল শুধু আলম। যতবারই সে এল ততবারই রানু বিরক্ত হল। ততবারই মনে হল তার নিজের একটি সংসারে সে জোড় করে ঢুকে পড়তে চাইছে। একেকবার তার বলতে ইচ্ছা হল প্লীজ বার বার এসে আমাকে বিরক্ত করবে না, আমার ভাল লাগে না। একজন ডিভোর্স মহিলার কাছে একজন পুরুষ মানুষের বারবার আসা ভাল দেখায় না। লোকজন খারাপ চোখে দেখে।

মনের কথা প্রায় কোন সময়ই বলা যায় না। বলা গেলে সংসারের জটিলতা কমতো। কিন্তু সংসার জটিলতা পছন্দ করে। নয়তো অপলার সঙ্গে এই ঝামেলাটা হত না।

বুধবার, টগর খুব উৎকণ্ঠায় কাটাল। বাবা কি আসবে? তাদের নতুন বাসা সেকি চেনে? তার উৎকণ্ঠার কথা সে অবশ্যি মাকে বলল না। বেশীর ভাগ সময়ই বারান্দায় কাটাতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা একবার এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা এই বাসা চেনে?

রানু হালকা গলায় বলল, চেনে না। তবে ঠিকানা দিয়ে এসেছি, খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না।

টগর ইতস্তত করে বলল, বাবা আর খালামণি কি একসঙ্গে আসবে?

রানু চমকে উঠল। টগরের এ ধরনের কথা বলার মানে কি? ওদের দু'জনকে নিয়ে সে কি কোন কিছু কল্পনা করে?

: টগর।

: কি?

: ওরা দুজন একসঙ্গে আসবে, এটা তুমি কেন বলছ?

: টগর কিছু বলল না।

: তোমার খালামণি কি তোমাকে কিছু বলেছে?

টগর মাথা নাড়াল। কিছু বলেনি। প্রশ্নটি করে রানু নিজেও লজ্জিত হয়ে

পড়ল। এ জাতীয় প্রশ্ন টগরকে করার কোনই মানে হয় না। কেন সে করল?

ওসমান সাহেব বুধবার এলেন না। তবে তাঁর একটি চিঠি এল। নতুন বাসায় কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। প্রয়োজন মনে করলে আকবরের মাকে নিয়ে যেতে। বিশ্বাসী পুরালো মানুষ। ও কাছে থাকলে সুবিধা হবে। তিনি আসতে পারছেন না কারণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পুরানো অসুখ-অনিদ্রা।

ওসমান সাহেবের চিঠির সঙ্গে অপলারও একটি চিঠি এলো। দীর্ঘ চিঠি। সব মিলিয়ে এগারো পৃষ্ঠা। শুরু হয়েছে এ ভাবে–

আপা,

হোস্টেলে থাকতে আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু নিজে থেকে ফিরে আসতেও লজ্জা লাগছে। তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও। আর শোন আপা, আমাকে নিয়ে তুমি যে সন্দেহ করছ এটা ঠিক না। দুলাভাইকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি তাঁকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে আছি। অবশ্যি এটা ঠিক যে তাঁর মত কোন ছেলের সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় তাহলে....। আজ আমার লিখতে লজ্জা লাগছে। তা ছাড়া একটা কথা আপা, যদি দুলাভাইকে আমার খুব বেশী ভাল লাগে সেটা কি আমার অপরাধ? কেন তুমি আমার উপর ঐ দিন এত রাগ করলে? ঐদিন সকাল সকাল আমার কলেজ ছুটি হল। আমি ভাবলাম হঠাৎ করে দুলাভাইকে গিয়ে চমকে দেব। গিয়ে দেখি দুলাভাই নেই। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় তুমি উপস্থিত হলে, আমাকে দেখে ভাবলে, আমি রোজ এখানে এসে বসে থাকি। আমি কি ঠিক করেছিলাম জান? তোমার সঙ্গে বাসায় যাব। তারপর একা একা ছাদে উঠে ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।

আপা, তুমি দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখ আমি আর কোনদিন যাইনি। উনি তো মিথ্যা কথা বলেন না। তার এই গুণটি তো তুমি নিজেও স্বীকার কর। কর না?

গুটি গুটি করে লেখা চিঠি শেষ করতে রানুর আধঘন্টা লাগল। সেই দিনই বিকেলে গিয়ে অপলাকে নিয়ে এল। এই ক'দিনেই অপলা রোগা হয়ে গেছে। তাকে কেমন লম্বা লম্বা লাগছে।

২৪

মতিয়ুর অবাক হয়ে ওসমানের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওসমান সাহেবের কথার কোন অর্থ সে বুঝতে পারছে না। সে বিস্মিত গলায় বলল, মিলিকে আপনি গ্রামের বাড়িতে নিয়ে কিছুদিন রাখতে চান?

ওসমান সাহেব নিচু স্বরে বললেন, হ্যাঁ, যদি তোমার আপত্তি না থাকে। মতিয়ুর থমথমে গলায় বলল,

: আপত্তি অবশ্যই আছে। সে দারুণ অসুস্থ মেয়ে। আপনি কাছাকাছি থাকলে সে কিছুটা সংযত আচরণ করে। এম্নিতে তার আচারণ আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তা ছাড়া....

: তা ছাড়া কি?

: বোনের বিয়ে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন পাগল পুষতে হবে না।

: তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন?

মতিয়ুর চুপ করে গেল। ওসমান সাহেব বললেন,

: তুমি ওকে আমার সঙ্গে দিতে রাজি না?

: জ্বি না। আমি ওকে ইন্ডিয়া পাঠাব। রাচি মেন্টাল হসপিটেলে আমার বন্ধুর একজন পরিচিত ডাক্তার আছেন। প্রফেসর দেবশর্মা। উনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

: কবে নাগাদ পাঠাবে?

: এখনও কিছু জানি না। পাসপোর্ট ভিসা এইসব হাঙ্গামা আছে। আপনি দেশে কবে যাবেন?

: শিগগিরই যাব।

: এম্নি যাচ্ছেন, না কোন কারণ আছে?

: এম্নি যাচ্ছি।

মিলি ঘুমুচ্ছিল। ওসমান সাহেব অপেক্ষা করলেন না। দেখা না করেই চলে এলেন। মাঝে মাঝে কারো জন্যেই অপেক্ষা করতে ইচ্ছা করে না।

কোথাও যাবার আগে তিনি এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করেন।

ঢাকা শহরে তার শিকড় গজিয়ে গেছে। কোথাও যাওয়া মানেই শিকড় ছিঁড়ে যাওয়া। মানুষ কি আসলে এক ধরনের বৃক্ষ? এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি বারান্দায় হাঁটতে লাগলেন। রাত প্রায় এগারোটা। আকবরের মা তার ছেলের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলছে। ওসমান সাহেবের মনে হল তাঁর মনের উত্তেজনা ওদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। অন্য সময় এগারোটার অনেক আগেই রফিক ঘুমিয়ে পড়তো। আকবরের মা ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকত টিভির দিকে। টিভির শেষ অনুষ্ঠানটি না হওয়া পর্যন্ত সে উঠতো না। আজ টিভি চলছে না।

আকবরের মা বারান্দায় এসে বলল, চা দিমু?

: না, চা লাগবে না।

: গরম দুধ দিমু এক কাপ?

তিনি চমকালেন। দুধ দেবার কথা বলে সে কি একটু বাড়তি যত্নের চেষ্টা করছে? রানু এখানে থাকার সময় শোবার আগে তাকে এক কাপ বিস্বাদ গরম দুধ খেতে হত। আজ হঠাৎ আকবরের মার হয়তো পুরানো কথা মনে পড়েছে। তিনি বললেন, দাও এক কাপ।

আকবরের মা আগুন-গরম দুধ নিয়ে এল। এতটা গরম তিনি আন্দাজ করেননি। মুখে দিতেই মুখ পুড়ে গেল।

: চিনি দিমু?

: চিনি লাগবে না। তুমি ঘুমাতে যাও।

: আপনি কবে আইবেন?

: ঠিক নেই। তুমি ঘুমাতে যাও, আকবরের মা।

সে গেল না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রফিক এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল তার মা'র পাশে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কিছু বলবে আমাকে?

: জ্বি না।

: তোমাদের আমি রানুর বাসায় রেখে আসব। ও নতুন বাসা করেছে। বড় বাসা। অসুবিধা হবে না। এখানে যে বেতন পেতে ওখানেও তাই পাবে।

বলেই ওসমান সাহেবের মনে হল আকবরের মা কোন বেতন নেয় না। তার বেতন সব জমা থাকে। একদিন সবটা একসঙ্গে নেবে। প্রায় আট বছর সে আছে এখানে এই দীর্ঘ আট বছরে সে কোন টাকা পয়সা নেয়নি। রানুকে বলেছে– নিলেই তো খরচ কইরা ফেলামু আপা। আপনের কাছে থাউক।' বেতন কত কি তা নিয়েও তার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। একশ টাকা করে হলেও প্রায় দশ হাজার টাকা। অনেকগুলি টাকা। এত টাকা নিয়ে সে কি করবে?

ওসমান সাহেব বললেন, আকবরের মা, তুমি কি বেতনের টাকাটা চাও? অনেক টাকা জমেছে তোমার।

: টাকা নিয়ে আমি করমুটা কি? কারে দিমু?

: নিজের টাকা অন্যকে দিবে কি? নিজে খরচ করবে।

আকবরের মা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমরা আপনাদের সাথে যাইতে চাই ভাইজান।

: আমার সাথে কোথায় যাবে?

: দেশের বাড়িত। পাক–সাক করনের দরকার না? পাক–সাক কে করবে?

: না, তার দরকার নেই।

আকবরের মা ক্ষীণ স্বরে বলল, আমরা কাপড়–চোপড় ঠিক কইরা রাখছি।

তিনি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষ মায়াবদ্ধ জীব। তারা মায়ায় পড়ে গেছে। শুধু মানুষই মায়াবদ্ধ? সমস্ত জীব জগৎই কি মায়াবদ্ধ নয়? খুব ছোট বেলায় তিনি একটি কুকুর পুষেছিলেন। অত্যন্ত গোপনে বাড়ির গ্যারেজের পেছনে তার আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। কালে এটা কিং কংয়ের মত মহাবলশালী একটা কিছু হবে এই আশাতেই সম্ভবত তার নাম দেয়া হয়েছিল 'কিং কং'। এক মাসের মাথায় কুকুর সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফয়সল সাহেবের নির্দেশে একটা চটের বস্তায় তাকে মুড়ে পাঠিয়ে দেয়া হল সাত মাইল দূরে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে কিং কিং তৃতীয় দিনের মাথায় বাড়ি এসে উপস্থিত। গেটের ভেতর ঢুকেই সে খুব হৈ চৈ করে সে তার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। তাকে আবার বস্তাবন্দী করে ফেলে দিয়ে আসা হল আরো দূরে। বস্তায় ভরে দেয়া হল কর্পূর! যাতে কর্পূরের গন্ধে অন্য সব গন্ধ এলোমেলো হয়ে যায়। ঘ্রাণ নিয়ে নিয়ে সে আর ফিরে আসতে না পারে। কিন্তু সে ফিরে এল। দশ দিনের মাথায় কাহিল অবস্থায় সে উপস্থিত। এবার আর আগের মত হৈচৈ নেই, আনন্দ উল্লাস নেই। তার চোখে ভয়।

ফয়সল সাহেব রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বাগানের মালি কাশেম মিয়াকে বললেন, এবার এমন একটা কিছু কর যাতে সে ফিরে আসতে না পারে। যদি সে ফিরে আসে, তোমার চাকরি থাকবে না। কাশেম মিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, বস্তাত ভইরা পানিতে ডুবাইয়া দিমু?

: যা ইচ্ছা কর, শুধু মনে রাখবে সে এলে তোমার চাকরি নট।

কিং কং আর ফিরে আসেনি। তিনি দিনের পর দিন প্রতিক্ষা করছেন কিং কং

www.BDeBooks.Com

আবার আসবে। কত বার কাশেম মিয়াকে গোপনে জিজ্ঞেস করেছেন, সত্যি সত্যি পানিতে ফেলে দিয়েছেন কাশেম ভাই? কাশেম মিয়া চোখ কপালে তুলে বলেছে, তা কেমনে করি ছোড মিয়া? আমি মানুষ না? আমার নিজের পুলাপান আছে না?

: তা হলে আসে না কেন?

: আইব আইব। একটু দেরী হইতেছে আর কি?

বার বছর বয়সে তাঁর প্রথম রচনাটি কিং কং-কে নিয়ে লেখা। 'আমার পোষা প্রাণী' এই পর্যায়ে ক্লাস সেভেনে তিনি রচনা লিখলেন, বাংলা স্যার মনমোহন বাবু সেই লেখাটি স্কুলের প্রায় সব ক'টি ক্লাসে পড়ে শোনালেন। তিনিই ওসমান সাহেবের লেখার প্রথম মুগ্ধ পাঠক। মনোমোহান বাবু তাঁর বরিশালের উচ্চারণে লেখাটা পড়তে পড়তে হঠাৎ থেমে গিয়ে চোখ মুছতেন এবং ধরা গলায় বলতেন, 'পশু হয়ে জন্মানো বড় কষ্ট। অবলা প্রাণী, মুখে ভাষা নাই। মনের কথা কাউকে বলতে পারে না।'

ওসমান সাহেব বারান্দায় হাঁটতে লাগলেন। আকবরের মা তার ছেলেকে নিয়ে এখনো ফিস ফিস করছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে বোধ হয়। আকাশে বিশাল একটা চাঁদ উঠেছে। শহরে জ্যোৎস্না হয় না কথাটা ঠিক নয়। শহরের জ্যোৎস্নায় অন্য এক ধরনের বিষণ্ণতা আছে। শহরের জ্যোৎস্না পুরানো দুঃখের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

তিনি হাঁটতে হাঁটতে কিং কংয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। সমগ্র সৃষ্টির মূল কথা কি? বিষাদ? হয় তো বা। কিন্তু গাঢ় বিষাদ! তাঁর বেদনা তিনি কি কখনো বোধ করছেন? মোটা দাগের দুঃখ তাকে কখনো স্পর্শ করে নি। মার মৃত্যু, বাবার মৃত্যু। অথচ কিং কংয়ের কথা মনে হলে এখনো তাঁর বেদনা বোধ হয়। কেন হয়?

: ভাইজান আপনেরে ডাকে?

: কে ডাকে?

তিনি বিস্মিত হয়ে তাকালেন। এই দুপুর রাতে তাকে কে ডাকবে?

: টেলিফোন।

তিনি বিরক্ত মুখে বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। বারান্দায় হাঁটতে তাঁর ভালই লাগছিল। সুর কেটে গেছে। আবার ফিরে আসা যাবে না।

টেলিফোন করেছে নবী। দুপুর রাতে অকারণে মানুষকে বিরক্ত করা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।

: হ্যালো ওসমান সাহেব, কেমন আছেন?

: ভাল।

: গর্জিয়াস একটা চাঁদ উঠেছে বাইরে। আপনার লক্ষ্য করার কথা নয়। আপনার কাজ হচ্ছে মানুষ নিয়ে। প্রকৃতি নিয়ে নয়। হ্যালো, শুনতে পারছেন। আমার কথা?

: পারছি।

কিছুক্ষণ আগে একটা প্ল্যান করা হল, আমরা কয়েকজন মিলে লঞ্চে করে বুড়িগঙ্গায় ঘুরব। সঙ্গে থাকবে হাজির মোরগ পোলাও এবং বুঝতেই পারছেন

কি? জলযাত্রার ব্যবস্থা। ওসমান সাহেব।

: বলুন।

: আপনি তৈরি হয়ে থাকুন। আমি আপনাকে নিতে আসছি। আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন নিতীশ বাবু। চিনতে পারছেন তো?

: না।

: আপনিতো ভাই অবাক করলেন। নিতীশ শর্মা, কবি ও নাট্যকার। কোলকাতা থেকে এসেছেন। নিতীশ বাবু আমার পাশেই আছেন। কথা বলবেন তাঁর সাথে?

: জ্বি না। অপরিচিত কারোর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না।

: অপরিচিত হবে কেন। নিতীশ বাবুর লেখাতো পড়েছেন? স্বরবৃত্তে আসিনি কখনো, পড়েন নি?

: কবিতা পড়ি না। নবী সাহেব শোনুন, আমি যাচ্ছি না আপনাদের সঙ্গে।

: কেন?

: আমি এ জাতীয় ব্যাপারগুলি ঠিক এনজয় করি না।

: মনিকাও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। ওর ইচ্ছা আপনাকে সঙ্গে নেবার। আমি নিজে আপনার কোম্পানীর জন্যে তেমন উতলা নই। কি যাবেন?

: আমার শরীরটা ভাল নেই।

: আপনিতো এখানে ব্যায়াম করবার জন্যে আসছেন না। লঞ্চের রেলিং ধরে জ্যোৎস্না দেখবেন। আমরা চাঁদপুর যাব। তারপর ফিরে আসব। নদী বক্ষে রাত কাটাব। নিতীশ বাবুর স্ত্রীও যাচ্ছেন। কীর্তনের একজন নামী শিল্পী। তিনি সারা রাতই গানটান গাইবেন।

: কিছু মনে করবেন না নবী সাহেব, আমি যাব না।

নবী সাহেব খানিকক্ষণ কোন কথা বললেন না। ওসমান সাহেব ভেবে পেলেন না, হঠাৎ তাকে নেবার জন্যে নবী এত ব্যস্ত কেন? তারা তাঁর স্বভাব জানে। দল বেঁধে প্রকৃতি দেখা, সাহিত্য সভা করা, গানের আসর করা এসবে তাঁর কোন কালেই কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, নবী সাহেব, রেখে দেই।

: এখনি রাখবেন না- মনিকার সঙ্গে কথা বলুন।

ওসমান সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনিকা কি তাঁকে সঙ্গে যাবার জন্যে বলবে? সেই অনুরোধ না রাখার মত মনের জোর কি তাঁর আছে। বহুদিন পর মনিকার সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছে। তাঁর ধারণা ছিল মনিকার প্রতি তিনি এখন আর তেমন কোন আকর্ষণ অনুভব করছেন না। কিন্তু ধারণা ঠিক নয়। ওসমান সাহেব টেলিফোন হাতে নিয়ে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন। তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। কেউ কখনো হারায় না। মানুষের মনের মত বিচিত্র আর কি আছে। কাউকে সে হারাতে দেয় না। বিশাল এক অন্ধকার ঘরে সমস্তই সাজানো। যে কোন মুহূর্তে আলো ফেলে সে তুচ্ছতম বস্তুকেও আলোকিত করে।

মনিকা শান্ত স্বরে বলল, শরীর কি বেশি খারাপ?

: না খুব বেশি না।

: অনেক দিন দেখা হয় না তোমার সাথে। লেখাটেখাও কিছু চোখে পড়ে না।

: লিখতে পারছি না।

: কেন?

: জানি না নে। ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে বোধ হয়। কিংবা ক্ষমতা হয়ত কোনকালে ছিলই না।

: দুঃখবাদী কথাবার্তা বলছ কেন?

ওসমান সাহেব হাসলেন। নিঃশব্দ হাসি। মনিকা টের পেল না।

: এই গভীর রাতে তোমাকে টেলিফোন করার কারণটি জান?

: জানি। জ্যোৎস্না দেখা।

: না সেটা তেমন কোন কারণ নয়। জ্যোৎস্না দেখার জন্যে লঞ্চ ভাড়া করার দরকার নেই। ব্যবস্থা করা হল নবীর জন্যে। নবীর খবর জান নিশ্চয়ই।

: কি খবর?

: আজ রাত আটটায় খবরে তো বলেছে।

: খবর আমি শুনিনি।

: নবী স্বাধীনতা পদক পেয়েছে। সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্যে।

: খুব ভাল খবর। নবী নিশ্চয়ই উল্লসিত।

: না। সে গম্ভীর। বলছে, পদক ফদকের জন্যে আমি লিখি না। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। খবর শুনেই সে ছুটে এসেছে আমার কাছে। সেলিব্রেট করার জন্যে কি করা যায় সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা। শেষে নদী বক্ষে ভ্রমণ ঠিক করা হয়।

মনিকা হাসল। কি সুন্দর হাসি।

: তুমি আসতে পারছ না?

: শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া–

: তাছাড়া কি?

: কাল ভোরে আমি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি, কিছুদিন থাকব সেখানে।

: হঠাৎ গ্রামের বাড়িতে কেন?

: কোন কারণ নেই। এম্নি।

: আচ্ছা ঠিক আছে। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

মনিকা ফোন রেখে দিল। ওসমান সাহেব ঘুমুতে গেলেন। ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে বইটই পড়লে কেমন হয়। কিন্তু বাতি জ্বালাতেও ইচ্ছা করছে না। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন নবীর প্রতি তিনি কোন ঈর্ষাবোধ করছেন না। কেন করছেন না? সাহিত্যের আসর থেকে তিনি কি নিজেকে নির্বাসিত করেছেন? এ রকম হল কেন?

তার পুরানো বইগুলির এডিসন হচ্ছে না। প্রকাশকরা উৎসাহিত বোধ করছে না। কেউ বোধ হয় এসব বই আর চায় না। তারা এখন চাইবে নবীর মত লেখকদের লেখা। যেখানে ঝলমল করবে প্রাণ। নবীর শেষ বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোড়ন হয়েছে। একজন লেখকের জন্যে এরচে বড় পুরস্কার আর কি?

আচ্ছা তিনি কি আবার কোন দিন লিখতে পারবেন? পাঠককে আলোড়িত করবার মত না হোক সাধারণ একটি লেখা? মনে হয় না। লেখা হবে না আর কোন দিন। এখন তাঁর নির্বাসনের কাল। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। শেষ রাতে তন্দ্রার মত হল। সেই তন্দ্রার মধ্যেই স্বপ্নে দেখলেন, কিং কং ফিরে

এসেছে। কিন্তু তার চোখ দু'টি নষ্ট। সে গন্ধ শুঁকে শুঁকে পুরানো বন্ধুকে খুঁজে বের করতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না।

২৫

ওসমান সাহেব অপলাকে রানুর বাসায় দেখে অবাক হলেন। তাঁর ধারণা ছিল সে হোস্টেলে। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় হোস্টেলে যায়নি। তিনি ঐ প্রসঙ্গ তুললেন না। গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন, এই খবরটি দিলেন। অপলা বলল সত্যি যাচ্ছেন?

: হাঁ, কেন?

: এম্নি। কিছুদিন থাকব। শরীর ভাল লাগছে না।

: কতদিন থাকবেন?

: সেটা ঠিক করি নি।

: যাচ্ছেন কখন?

: এইত ঘন্টাখানেকের মধ্যে।

রানু এই খবরে বিশেষ বিচলিত হল না। তার অফিসে যাবার তাড়া। বেশী সময় দিতে পারছে না। সে বলল, টগর বড় খালার বাসায় আছে। তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?

: না। ওখানে গিয়েছে কেন?

: ওর সমবয়সী কিছু বন্ধু–বান্ধব আছে। কাল নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আর আসতে চায় না।

রানু মৃদু স্বরে বলল, আমাকে মনে হয় সে পছন্দ করে না। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। রানু বলল, তুমি যদি চাও তোমার সঙ্গে ওকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবে, তাহলে নিতে পার। টগর খুশিই হবে।

: তার কোন দরকার নেই

রানু বেশখানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, নির্বাসনে যাচ্ছ?

: নির্বাসনে যাব কেন?

: লেখক সুলভ একটা চাল দেবার জন্যে যাওয়া আর কি?

: উঠি রানু।

রানু বলল, আকবরের মা আর তার ছেলে, ওরা কোথায় থাকবে?

: ওদের বীথির সমিতিতে রেখে এসেছি।

অপলা তাঁকে এগিয়ে দিতে নেমে এল নীচ পর্যন্ত। মৃদু স্বরে প্রায় ফিস ফিস করে সে বলল, দুলাভাই আপনি কি আমাকে চিঠি লিখবেন?

: হাঁ লিখব। অপলা বলল, চোখ মুছতে মুছতে, লিখব আমিও।

অবাক হয়ে দৃশ্যটি ওসমান সাহেব দেখলেন।

২৬

রানু, কেমন আছ তোমরা?

কুশল জানতে চেয়ে চিঠি শুরু করা গেল। বিয়ের আগে যেসব চিঠি লিখতি

www.BDeBooks.Com

তার শুরু কেমন ছিল মনে করতে পারছি না। অনেক কিছুর সঙ্গে স্মৃতি শক্তিও আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। পুরানো কথা সহজে মনে পড়তে চায় না। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি বোধ হয়।

চিঠির শুরুটা ভাল হয় না। তোমার নিশ্চয়ই ভুরু কুঁচকে উঠেছে। তবে একটা মজার কথা কি জান? চিঠিতে এলেবেলে যাই লিখি না কেন তুমি মন দিয়ে পড়বে। রাগ দেখানোর জন্যে দু'তিন লাইন পড়েই চিঠি ছুড়ে ফেলবে না। কেন পড়বে না সেই কারণটিও বলি। কারণ, তুমি যে রাগ করে চিঠি ফেলে দিয়েছ এই দৃশ্যটি আমি দেখব না। যার উপর রাগ করলে সে যদি নাই জানল, তাহলে রাগ করার যৌক্তিকতাটা কোথায়? কাজেই আমার ধারণা তুমি খুব মন দিয়েই চিঠি পড়বে। ঠিক বলি নি?

এখানে এসে পৌঁছেছি গত পরশু। বিকেল চারটায় যে ট্রেন পৌঁছানোর কথা সেটা পৌঁছাল সন্ধ্যা ছ'টায়। আমার ধারণা ছিল দেখব সব বদলে গেছে সব অচেনা, শহরতলি শহরতলি ভাব চলে এসেছে গ্রামে। সে রকম কিছুই দেখলাম না। সব কিছু আগের মতই আছে। আগের মতই অনেক অপরিচিত মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করল,

: আপনার নাম?

: যাইবেন কই?

: কোন গেরাম?

: কার বাড়ি?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানার তাদের দরকার নেই। তবু এমন ভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন উত্তরগুলি জানা না থাকলে এদের খুব মুশকিল হয়ে যাবে। এবং মজার ব্যাপার হাচ্ছে এরা সবাই আগ্রহ করে বলল, আমাকে কি ভাবে যেতে হবে। জুমা-ঘরের ডান দিকের রাস্তা নিতে হবে না বাঁ দিকের রাস্তা নিতে হবে। যদিও তাদের কাছে আমি কিছুই জানতে চাই নি।

রানু, নিশ্চয়ই তুমি অবাক হয়ে ভাবছ এসব আমি লিখছি কেন? কারণ একটা আছে। আমি মূল কথা বলবার জন্যে আবহ তৈরি করছি। ভূতের গল্প বলার আগে যেমন বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। কথক গলার স্বর অনেক খানি নামিয়ে আনেন, যাতে গা ছমছমানো একটা ভাব তৈরি হয়। এ রকম আর কি!

এই পর্যন্ত লিখেই ওসমান সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। যা লিখতে চাচ্ছেন তা লিখতে পারছেন না। অবান্তর কথাবার্তা লেখা হচ্ছে। অবান্তর এবং অসত্য।

স্টেশন থেকে বাড়ি আসবার পথে কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। গ্রাম আগের মত আছে বলে যা লিখেছেন তাও সত্যি নয়। অনেকখানি বদলেছে। ইলেকট্রিসিটি এসেছে। কিছু কিছু বাড়িতে লম্বা বাঁশের মাথায় টিভি এন্টেনা। এ গ্রাম ভিন্ন ধরনের গ্রাম। আগের চেনা গ্রাম নয়। তিনি কি জেনে শুনেই সমস্ত অস্বীকার করতে চাইছেন? ভান করছেন সব আগের মতই আছে?

তাছাড়া-'মূল কথা বলবার জন্যে আবহ তৈরি করছি' এর মানেই কি? তাঁর কি মূল কথা সত্যি সত্যি কিছু আছে?

ওসমান সাহেব বিরক্ত গলায় ডাকলেন, আইনুদ্দিন, আইনুদ্দিন! আইনুদ্দিন

প্রায় ছুটে এল।

: কিছু কইছেন ভাইজান?

: ক'টা বাজে দেখতো।

আইনুদ্দিন বোকার মত তাকিয়ে রইল। বাড়িতে নিশ্চয়ই কোন ঘড়ি নেই। তিনি তাঁর রিষ্টওয়াচ ফেলে এসেছেন। লেখক সুলভ অন্যমনস্কতার কোন ব্যাপার নয়। ঘড়ি রেখে এসেছেন ইচ্ছা করেই। রওয়ানা হবার শেষ মুহূর্ত তার মনে হল ঘড়ি কলম কাগজ এসব না নিয়ে গেলে কেমন হয়? একজন নাগরিক মানুষের পুরোপুরি মুক্তির জন্যে এসব সরঞ্জাম না থাকা একটি পূর্ব শর্ত।

জর্জ ম্যারণ নামের এক আমেরিকান কবি বৎসরের একটি মাস নগর ছেড়ে অরণ্যে ঢুকে পড়তেন। কিছুই থাকত না তাঁর সঙ্গে। কাপড় পর্যন্ত নয়। খাদ্য সংগ্রহ করতেন বন থেকে।

তাতে অবশ্যি সাহিত্যের তেমন কোন লাভ হয়নি। জর্জ ম্যারণ নিম্নমানের কবিতাই লিখেছেন। বনবাসের ফল হিসেবে কোন মুক্ত মানুষের কবিতা লেখা হয়নি।

: আইনুদ্দিন!

: জ্বি আইনুদ্দিন।

: ঠিক আছে তুমি যাও।

: কয়টা বাজে জাইন্যা আইতাম?

: না, দরকার নেই কোন। তুমি যাও।

আইনুদ্দিন চিন্তিত মুখে বের হয়ে গেল। ওসমান সাহেব নিশ্চিত হলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটি ঘড়ি যোগাড় করবে। এখানে পৌঁছানোর একদিন পরই তিনি আইনুদ্দিনের কাছে কাগজ এবং কলম চেয়েছিলেন। আইনুদ্দিন বিব্রত ভঙ্গিতে বলেছিল কাগজ কলম তো ভাইজান নাই। আইন্যা দিমু?

: থাক দরকার নেই।

: ইস্টিশনের কাছে এক দোকানে পাওয়া যায়।

: লাগবে না।

আইনুদ্দিন চলে গেল। সন্ধ্যা বেলা তিনি দেখলেন তাঁর বিছানার পাশের টেলিবে কাগজ এবং দুটি বল পয়েন্ট কলম। একটি লাল এবং একটি কাল। দু'টি দু'কালির কলম কেন কিনল সে? ওসমান এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় ভাবলেন। মাঝে মাঝে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে তার ভাল লাগে। বিনা কারণে কেউ কিছু করে না। আইনুদ্দিনের দু'টি কলম কেনার পেছনেও নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে যা শুধু আইনুদ্দিনই জানে।

ওসমান সাহেব বারান্দায় চলে গেলেন। সূর্যের দিকে তাকিয়ে যদি সময় টের পাওয়া যায়। তাঁর কাছে মনে হল এগারোটার মত বাজে। উঠোনময় ধান শুকুতে দেয়া হচ্ছে। আইনুদ্দিনের মেয়ে কঞ্চি হাতে উঠোনে বসে আছে। মেয়েটির বয়স ছ-সাত। রোদের আঁচে তার ফর্সা গাল লাল হয়ে আছে। কাক এসে ধানে বসা মাত্রই সে তার কঞ্চি নাড়াচ্ছে এবং মুখে বলছে হুস। কাজটি সে করছে খুব আগ্রহ নিয়ে। ওসমান সাহেব অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখলেন। হঠাৎ করে তাঁর মনে হল শুধু কাক কেন ধান খেতে আসে? অন্য পাখিরা কেন আসে না? উঠোনে ধান

পড়ে থাকবে, রঙ-বেরঙের পাখিরা আসবে ধান খাবার জন্যে। দৃশ্যটি কল্পনা করতেই ভাল লাগে।

: এই মেয়ে তোমার নাম কি?

মেয়েটি গম্ভীর মুখে বলল, বাতাসী। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা বাতাসী শুধু কাক ধান খেতে আসে। অন্য পাখিরা কেন আসে না। এর কারণ তুমি জান?

: জানি।

: কেন আসে না।

: কাউয়া মাইনষেরে ডরায় না। পক্ষী ডরায়।

চমৎকার জবাব! তার চেয়েও চমৎকার হচ্ছে মেয়েটির তৎক্ষণাৎ জবাব দেবার ভঙ্গি। মেয়েটি জবাব দেবার পরও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি স্কুলে পড়?

মেয়েটি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, চড়ুই পাখি আয়। চড়ুই পাখি ধান খায়।

তিনি সত্যি সত্যি বিস্মিত হলেন। পাখি ধান খায় না কেন এই প্রশ্ন বাতাসীকে বিচলিত করেছে। সে ভাবতে শুরু করেছে।

: তুমি স্কুলে পড় না বাতাসী?

: না।

: কেন? স্কুল নেই এ দিকে?

: আছে।

: পড়তে ইচ্ছে করে না?

: না।

: ধান পাহারা দিতে ভাল লাগে?

মেয়েটি এই প্রশ্নের জবাব দিল না। ওসমান সাহেবের মনে হল জবাব না দেবার কারণ হচ্ছে সে ভাবতে শুরু করেছে। চট করে কিছু বলবে না। ভেবে চিন্তে বলবে। তিনি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে করতে তাঁর মনে হল সম্পূর্ণ কর্ম-শূন্য তৃতীয় দিনটি তার শুরু হয়েছে। খুব একটা খারাপতো লাগছে না।

এই ক'দিনে একবারও লেখালেখির কথা মনে হয় নি। কোন গল্পের প্লট নিয়ে মাথা ঘামান নি। বেশীর ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন বারান্দায় বসে। আইনুদ্দিনের ঘরসংসার লক্ষ্য করেছেন। লক্ষ্য করেছেন বলাটা ঠিক নয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন-আইনুদ্দিনের স্ত্রী ধান মেলে দিচ্ছে। ধান সিদ্ধ করবার জন্যে আগুন জ্বালাচ্ছে। আইনুদ্দিন গরুর জন্যে ভাতের ফ্যান নিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাগুলি ঘটছে চোখে সামনে। এ পর্যন্তই। একে লক্ষ্য করা বলা চলে না।

এই পরিবারটির দিকে তাকিয়ে থাকতে ওসমান সাহেবের ভাল লাগছে। কর্মব্যস্ত মানুষ দেখতে ভাল লাগে। একবার তিনি কল্যাণপুরের দিকে গিয়েছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গোটা পরিবার ইট ভাঙ্গতে বসেছে। মা, বাবা দু'টি ছোট ছোট ছেলে, একজন অতি বৃদ্ধা মহিলা। সবাই ইট ভাঙ্গছে মহা উৎসাহে। কঠিন পরিশ্রমের এই কাজে তারা একটা উৎসবের ভাব নিয়ে এসেছে। বৃদ্ধ মহিলাটি মাঝে মাঝে কি যেন বলছে- গোটা পরিবার হেসে উঠছে। মুগ্ধ করে দেবার মত একটি ছবি। ওসমান সাহেব আটকা পড়ে গেলেন। বেড়াচ্ছেন এ রকমের ভান করে এদের পাশ দিয়ে কয়েকবার হেঁটে গেলেন।

বাসায় ফিরে রানুকে খুব উৎসাহ নিয়ে ঘটনাটা বলতেই রানু বলল, ইট ভাঙ্গছিল বউটির বয়স কত?

: কেন?

: ঐ বউটির বয়স নিশ্চয় কম। দেখতেও সে রূপসী। ইট ভাঙ্গবার সময় তাঁর কাপড় নিশ্চয় এলো মেলো হয়ে যাচ্ছিল। এর জন্যই দৃশ্যটি তোমার কাছে স্বর্গীয় মনে হচ্ছিল। ইট ভাঙ্গা কোন স্বর্গীয় ব্যাপার নয়। কষ্টের ব্যাপার।

ওসমান সাহেব থমকে গিয়েছিলেন। কারণ ঐ বউটির সত্যি সত্যি মায়া কাড়া চেহারা ছিল। রানুর কথা উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। আজ যে আইনুদ্দিনের ঘর সংসার তাঁর ভাল লাগছে এর পেছনেও কি ফ্রয়েডীয় কিছু কাজ করছে? সম্ভবত নয়। আইনুদ্দিনের স্ত্রীকে তিনি দেখেন নি। সে কাজ করছে নতুন বৌয়ের মত লম্বা একটা ঘোমটা টেনে। তবে অনুমান করা যাচ্ছে বৌটি দেখতে ভাল, কারণ বাতাসী মেয়েটি সুন্দর দেখতে। মা'র মত হয়েছে নিশ্চয়ই।

তিনি সিগারেট ধরিয়ে বাতাসীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। মেয়েটি এখন নিজের মনে কথা বলছে। ছড়া টড়া কিংবা গ্রাম্য কোন বিয়ের গান। কারণ তার মাথা দুলছে। ছন্দের কোন ব্যাপার ছাড়া মাথা দুলবে না। কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পারলে হত। কিন্তু কাছে যাওয়া মাত্র এই মেয়ে চুপ করে যাবে। তাছাড়া মেয়েটির ব্যক্তিগত সংলাপে হঠাৎ উপস্থিত হওয়া কি ঠিক?

ওসমান সাহেব অন্যমনস্ক ভংগিতে এগিয়ে গেলেন। মেয়েটি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গানের মত গাইছে।

'ভাত খাইছে ধান খাইছে
কলাই খাইছে কে?'

গানের কলি এই একটিই। ঘুরে ফিরে তাই সে গাইছে। সুরও সম্ভবত তার নিজের। ওসমান সাহেব এক ধরনের বিষণ্ণতা অনুভব করলেন। যে গান একা একা গাওয়া হয়, সেই গান নৈসঙ্গের গান। তার সুর নিসঙ্গতা এনে দেবেই।

মেয়েটি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল কিন্তু গান বন্ধ করল না। সম্ভবত সে বুঝতে পারছে শহর থেকে আসা এই মানুষটি তার গান পছন্দ করছে। শিশুরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

২৭

মিলির চিঠি এসেছে।

দু'টি চিঠি। দু'টি চিঠিতে একই কথা লেখা। একই বক্তব্য। একটি শব্দও এদিক ওদিক নয়। দু'টি চিঠি পাঠানোর কারণ ওসমান সাহেব ধরতে পারলেন। একটি হারিয়ে গেলেও অন্যটি যাতে পৌঁছে সেই ব্যবস্থা। অদ্ভুত সব চিন্তা মিলির মাথাতেই খেলে।

চিঠির ভাষা গুরু গম্ভীর। এবং আপনি আপনি করে লেখা। যেন পরীক্ষার

www.BDeBooks.Com

খাতায় চিঠি লেখা হচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলে নম্বর কাটা যাবে।

শ্রদ্ধেয় ভাইয়া,

আমার সালাম জানবেন। আপনি বিগত এক সপ্তাহ যাবত বাইরে আছেন। আমরা সবাই অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত। এদিকে কয়েকদিন আগে আমি একটি পত্রিকায় পড়লাম এই মাস বৃশ্চিক রাশির জাতকের জন্যে খুব খারাপ মাস। আমি পত্রিকার লেখাটি আপনার জন্যে লিখে দিচ্ছি।

'বৃশ্চিক রাশির জাতকের উপর শনি এ মাসে পূর্ণ প্রভাব ফেলবে। দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্যহানী, আত্মীয় বিয়োগ প্রভৃতি ঘটার সম্ভাবনা। নতুন বন্ধু তৈরীতে বিরত থাকুন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।'

ভাইয়া আপনিতো এসব বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এগুলি সত্যি। প্রথম প্রথম আমিও বিশ্বাস করতাম না। একদিন পত্রিকায় দেখলাম ধনু রাশির জন্যে আজকের দিনটি অশুভ। দুর্ঘটনা যোগ আছে।

তবু আমি গেলাম। পরে কি হল তা তো আপনি জানেন। রিকশা একসিডেন্ট করে পা ভেঙ্গে এক মাস হাসপাতালে।

যাই হোক চিঠি পাওয়া মাত্র আপনি চলে আসবেন। টগর, আপনার জন্যে খুব কান্নাকাটি করছে। সেদিন গিয়েছিলাম ভাবীর কাছে নিউ পল্টন লাইনে। আপনার কথা উঠতেই টগর এমন কাঁদতে লাগল যে আমি নিজেও কাঁদলাম। তাছাড়া টগরের শরীরও খুব খারাপ। কয়েকদিন ধরে একশ তিন জ্বর চলছে। ডাক্তাররা আশংকা করছে হয়তবা টাইফয়েড।

পুনশ্চ দিয়ে লেখা, ভাইয়া, ও আমাকে একটুও ঘর থেকে বের হতে দেয় না। গেটে তালা বন্ধ করে রাখে।

ও ভাল কথা, আমি ইন্ডিয়া যাচ্ছি চিকিৎসার জন্যে। আপনার জন্যে কিছু আনতে হলে জানাবেন।

ওসমান সাহেব চিঠিটি বেশ কয়েকবার পড়লেন। মিলি, তার স্বভাবমত মিথ্যায় চিঠি ভরিয়ে দিয়েছে। পা ভাঙ্গার কোন ব্যাপার তার জীবনে ঘটেনি।

টগর, তার জন্যে কাঁদছিল এটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। টগরের মধ্যে এ জাতীয় আবেগ নেই। থাকলেও তা গোপনে, অন্য কেউ তার খোঁজ জানবে না। আর জ্বরের ব্যাপারটিতো শেষ মুহূর্তে বানানো হয়েছে। গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য লেখা হয়েছে–'ডাক্তাররা আশঙ্কা করছে হয়তবা টাইফয়েড।' ডাক্তাররা অর্থাৎ একজন ডাক্তার নয়। কয়েকজন ডাক্তার। খবরগুলি যে মিথ্যা তার সবচে বড় প্রমাণ হচ্ছে রানুরা এখন নিউ পল্টন লাইনে থাকে না।

তিনি নিজের মনেই খুব হাসলেন। মন ভাল করে দেবার মত চমৎকার একটি চিঠি। একজন কেউ বলছে– 'ফিরে এসো।' সেই বলার আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে প্রতিটি অক্ষরে। মানুষ বাঁধা পড়বার জীবন নয়। কিন্তু তাকে বাঁধবার আয়োজনই বোধ হয় সবচে প্রবল।

তিনি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন। চমৎকার একটি চিঠি লিখলেন, মিলিকে। সেখানে কিংকংয়ের কথা লেখা হল। ওসমান সাহেব লিখলেন, 'আমার কেন জানি মনে হয় আমি সারা জীবন একেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার ছায়া দেখতে চেয়েছি প্রিয়জনদের মধ্যে। একটা অলৌকিক বিশ্বাস লালন করেছি নিজের মধ্যে

যে একদিন না একদিন কিং কং ফিরে আসবে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া কেউ বোধ হয় কখনো ফেরে না।'

চিঠিটি পাঠানো হল না। তাঁর মনে হল মিলি এই চিঠির অর্থ বুঝতে পারবে না মনগড়া মানে দাঁড়া করিয়ে নিজের মনে কাঁদবে। মিলি বড় ভাল মেয়ে। তাকে কাঁদাতে ইচ্ছা করে না।

দোতালার ঘর, বারান্দা, বাড়ির পেছনের পুকুরঘাট এর মধ্যেই ওসমান সাহেবের জীবনযাত্রা চলতে লাগল। খারাপ লাগল না মোটেই। বরং ভালই লাগতে লাগল। কাক তাড়ানোর ব্যাপারে বাতাসীকে সাহায্য করবার জন্যেও তিনি বসতে শুরু করলেন। আইনুদ্দিন এবং তার স্ত্রী কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এই মানুষটিকে তারা ঠিক বুঝতে পারছে না। গ্রামের মানুষেরা রহস্যময়তা পছন্দ করে না।

আইনুদ্দিনের ধারণা ছোট সাহেবের মাথায় ছিট আছে। তার স্ত্রী তাঁকে ঠিক সমর্থন করেনি। কিন্তু গত রাতে তার মনেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ আইনুদ্দিনকে ডেকে ওসমান সাহেব বলেছেন, একটা কাল রঙের কুকুরের বাচ্চা জোগাড় করে দিতে পারো? আইনুদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়েছে। তিনি বলছেন, আমি একটা কুকুর পুষতে চাই। তবে কাল রঙ হতে হবে।

: ক্যান?

: কিং কংয়ের রঙ ছিল কাল।

আইনুদ্দিন এবার বলতে চাইল– কিং কং কে? সে বলল না। কুকুর–ছানা খুঁজে আমন একটি। তাকে দেখা মাত্র ওসমান সাহেব রেগে গেলেন।

: এক্ষুণি একে ফেলে দিয়ে এসো।

আইনুদ্দিন ফেলে দিয়ে এল। সে রাতে ওসমান সাহেব কিছু খেলেন না। অনবরত বারান্দায় পায়চারি করলেন। আইনুদ্দিন ও তার স্ত্রী দূর থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তিনি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। খিল খিল হাসির শব্দে ঘুম ভাঙ্গল। বাতাসী হাসছে। তার মানে রাত হয়নি। রাত বেশী হলে বাতাসী জেগে থাকত না। কিন্তু তাঁর কাছে মনে হচ্ছে অনেক রাত। আইনুদ্দিন ঘরে কোন আলো দিয়ে যায়নি। অবশ্যি তার দরকারও নেই। ঘরে প্রচুর আলো। আকাশ ভেঙ্গে জোছনা নেমেছে। কিংবা কে জানে আজ হয়তো হঠাৎ কোন কারণে দুটি চাঁদ উঠেছে।

ওসমান সাহেব উঠে বসলেন। বিছানার এক অংশ, পড়ার টেবিল এবং আলনায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সে আলো নদীর জলের মত কাঁপছে। এ রকম মনে হচ্ছে কেন? চোখের ভুল নাকি? তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন বিস্তীর্ণ মাঠে সত্যি সত্যি জোছনার ঢেউ। মাঝে মাঝেই ফুলে ফেঁপে উঠছে। তার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। তিনি কাঁপা গলায় ডাকলেন, আইনুদ্দিন, আইনুদ্দিন।

আইনুদ্দিন তাঁর ডাক শুনতে পেল না। সে উঠোনে বসে চাঁদের আলোয় দড়ি পাকাচ্ছে। লম্বা ঘোমটা দিয়ে তার বৌ বসে আছে তার পাশে। বাতাসী একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে উঠোনের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ছুটে ছুটে যাচ্ছে এবং অনবরত হাসছে। চমৎকার একটি ছবি। এত চমৎকার যে মনে হয় এ রকম কিছু

সত্যি সত্যি ঘটছে না। এ ছবিটি বিশুদ্ধ কল্পনা। ওসমান সাহেব দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন মাঠে। আবার তাঁর ভয় ভয় করতে লাগল। তিনি আবার ডাকলেন, আইনুদ্দিন, আইনুদ্দিন।

আইনুদ্দিন দড়ি ফেলে উঠে এল। তার বৌ মাথার ঘোমটা অনেকখানি টেনে দিল। বাতাসী হাতের কঞ্চি ফেলে তার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে বিজ বিজ করে কি সব বলতে লাগল। কোন গ্রাম্য ছড়া বোধ হয়। এই মেয়েটি প্রচুর ছড়া জানে। এক মুহূর্তের জন্যে না থেমেও সে অনবরত নতুন ছড়া বলতে পারে। তার মার কাছ থেকেই শিখেছে নিশ্চয়ই কারণ বাতাসীকে তিনি কখনো বাড়ির বাইরে যেতে দেখেননি। আইনুদ্দিন হাতে একটি হারিকেন নিয়ে বারান্দায় উঁকি দিল। নিচু গলায় বলল, ভাই জানের শইলটা এখন কেমুন?

: শরীর ভালই। ক'টা বাজে আইনুদ্দিন?

আইনুদ্দিন বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। এ বাড়ীতে কোন ঘড়ি নেই। আইনুদ্দিন কার কাছ থেকে ঘড়ি একটা নিয়ে এসেছিল। তিনি ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, বন্ধনহীন অবস্থায় সময়কে দেখতে ভালই লাগবে। গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গলে জানা যাবে না কটা বাজে, রাত কাটতে কত দেরী। সময়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ। কিন্তু আজ হঠাৎ করেই সময় জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

: আইনুদ্দিন।

: জ্বি।

: কটা বাজে জেনে আসতে পারবে?

: পারমু।

: যাও জেনে আস।

: চা খাইবেন ভাইজান?

: না চা–টা কিছু খাব না। আইনুদ্দিন আজ কি পূর্ণিমা?

: জ্বে না। কাইল। কাইল লক্ষ্মী পূজা।

ওসমান সাহেব খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মাঠের উপর চাঁদের আলো এমন উঠা–নামা করছে কেন? দেখতে পাচ্ছ আইনুদ্দিন? আইনুদ্দিন অবাক হয়ে তাকাল মাঠের দিকে। সে তেমন কিছু দেখতে পেল না।

: দেখতে পাচ্ছ না?

: বাতাসে ঘাস কাঁপতাছে হেই জন্যে এমুন মনে হয়। ভাইজান, আপনে ভিতরে গিয়া বসেন।

: কেন?

: আপনের শইলডা ভাল না।

: আজ কি বার?

: বুধবার।

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। বুধবার টগরকে দেখতে যাবার দিন। অনেক দিন তাকে দেখতে যাওয়া হয় না। টগর প্রতি বুধবারে তার জন্যে অপেক্ষা করে? কিছুদিন করবে তারপর আর করবে না। কোন একটি বিশেষ কিছুর জন্যে মানুষ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে পারে না। মানুষ প্রতিবারই নতুন কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে ভালবাসে।

: ভাইজান।

: বল।

: ডাক্তার সাবরে খবর দেই?

: কেন?

: আপনার শইলডা ভাল না।

: আমার শরীর ভালই আছে। আর শোন, ঘড়ি আনার দরকার নেই।

: রাইতে কি খাইবেন?

: কিছুই খাব না। হারিকেন রেখে তুমি নিচে চলে যাও।

আইনুদ্দিন চিন্তিত মুখে নেমে গেল। ওসমান সাহেব নিশ্চিত সে উঠোনে বসা তার স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গুজ গুজ করে কথা বলবে, তারপর রওনা হবে ডাক্তারের কাছে। সময় জেনে আসবে, এবং খুব সম্ভবত ডাক্তারকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে। ডাক্তার ভদ্রলোক এসে আর উঠতে চাইবেন না। অনবরত কথা বলবেন। এখানে তাঁর কথা বলার মত লোক নেই হয়ত।

গতকাল ভদ্রলোক প্রথম এসেছিলেন। বুড়ো ধরনের একজন মানুষ। এই গরমেও স্যুট পরা। স্যুটটি পুরানো এবং ময়লা কিন্তু গলার টাইটি ঝক ঝক করছে। সম্ভবত আজই ট্রাংক খুলে বের করা হয়েছে।

: আপনি যে এখানে আছেন জানতামই না। আইনুদ্দিনের কাছে শুনে অবাকই হলাম। আমার স্ত্রীকে বললাম সেও আসতে চাচ্ছিল। আমার ছেলে মেয়েরা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত। ওরা আবার খুব সাহিত্য পাগল; একজন কবিতা লিখে ছদ্মনামে। বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় লিখা বের হয়। আপনার চোখে পড়েছে বোধ হয়, সানজা করিম। একটা কবিতার বই বের করতে চায়। বহু খরচান্ত ব্যাপার। কি বলেন? এদিকে আবার বই না হলে কবি বলে কেউ স্বীকার করতে চায় না। ভাল লিখছে না খারাপ লিখছে এটা কেউ দেখতে চায় না। দেখতে চায় বই ক'টা আছে। কোয়ালিটি নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা নেই, সবাই চায় কোয়ান্টিটি। ঠিক বলছি কি না বলেন?

ভদ্রলোক অনবরত কথা বলতে লাগলেন। নিজেই প্রশ্ন করছেন নিজেই জবাব দিচ্ছেন। আবার প্রশ্ন করছেন আবার জবাব দিচ্ছেন। অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থা। আইনুদ্দিন কি মনে করে তাঁকে নিয়ে এসেছে কে জানে। ভদ্রলোকের সঙ্গে ডাক্তারী ব্যাগ। প্রেসার মাপার যন্ত্র। কাজেই দেখা সাক্ষাতের জন্য আসেন নি চিকিৎসার জন্যই এসেছেন।

: তাই এখন বলেন, আপনার কি অসুবিধা?

: আমার কোন অসুবিধা নেই।

: সে কি আইনুদ্দিন যে বলল...

: ও ঠিক বলেনি।

: ঘুম হচ্ছে না নাকি। সারারাত বারান্দায় হাঁটাহাটি করেন?

: আমি এমনিতেই রাত জাগি।

: তাতো জাগতেই হয়। লেখক মানুষ। আপনারা নাক ডাকিয়ে ঘুমুলে চলে না কি?

ওসমান সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আপনি অন্য একদিন আসুন। আজ

www.BDeBooks.Com

আমি একটু ব্যস্ত।

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন, প্রেসার মাপবেন না?

: জ্বি না।

টেবিলের উপর হারিকেন জ্বলছে। সুন্দর করে সাজানো টেবিল। কাগজ, কলম, পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাস। ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন দুটি পেনসিলও রাখা আছে। পেনসিল দু'টি কাল ছিল না। আজই আনা হয়েছে এবং আইনুদ্দিনের স্ত্রী এক ফাঁকে রেখে গেছে। তাঁর মনে হল এই টেবিলে কোথাও যেন মিলির ছোঁয়া আছে। ওসমান সাহেব বুঝতে পারলেন না হঠাৎ করে মিলির কথা কেন মনে হল। এ রকম মনে হবার কারণ কি পেনসিল দু'টি? মিলিও লেখার টেবিল গোছাবার সময় কলমের পাশাপাশি দু'টি পেনসিল রাখত। পেনসিল তিনি ব্যবহার করেন না। মিলিকে বলেছেন অনেকবার। লিখতে বসে প্রতিবারই তিনি পেনসিল দু'টি ড্রয়ারে রাখতেন। এবং প্রতিবারই মিলি তা বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখত। মজার ব্যাপার হচ্ছে মিলির আগ্রহ এই টেবিলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কি লেখা হল না হল তা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। বিয়ের পরও রোজ রানুকে টেলিফোন।

: হ্যালো ভাবী, ভাইয়ার টেবিল গোছানো হয়েছে?

: হ্যাঁ হয়েছে।

: টেবিল ক্লথ বদলে দিয়েছ তো? রোজ নতুন টেবিল ক্লথ না দিলে সে লিখতে পারে না। সাতটা টেবিল ক্লথ আছে তার জন্যে। কোণায় শনি, রবি লিখে দিয়েছি।

: আমি জানি তুমি আমাকে বলেছ অনেকবার।

: ভাবী দেখতো আজ কি সোমবার লেখা টেবিল ক্লথ আছে কিনা। না থাকলে ভাইয়া কিন্তু লিখতে পারবে না।

: শোন মিলি, লেখাটা তৈরী হয় মাথায়। টেবিল ক্লথের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

: তুমি কাইন্ডলি একটু দেখে আস না ভাবী এক মিনিটের ব্যাপার।

: ঠিক আছে যাচ্ছি।

: আরেকটা কথা ভাবী, উপন্যাসটা শুরু করেছিল সেটা ক'পৃষ্ঠা লিখেছে সেটাও আমাকে বলবে।

ঠিক আছে বলব। এখন টেলিফোন নামিয়ে রাখি?

: না ভাবী এখনই রাখবে না আরেকটু কথা বলি।

ওসমান সাহেব টেবিলের সামনে বসলেন। হারিকেনের আলো কমিয়ে দিলেন। এক চুমুক পানি খেলেন।

গ্লাসের নিচে রাখা রানুর চিঠিটি আবার পড়লেন। পাঁচ ছ লাইনে লিখেছে মিলিকে রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজটা ভাল হয়নি। সম্ভব হলে তুমি ওকে দেশে নিয়ে আসার চেষ্টা কর।

কি চেষ্টা তিনি করবেন? কার কাছে যাবেন। এবং ওরাই বা তার কথা কেন শুনবে।

বাতাসী এসে দাঁড়িয়েছে পর্দা ধরে। সে ভেতরে ঢোকে না। এ ঘরে ঢোকা

বোধ হয় নিষেধ আছে। ওসমান সাহেব বললেন,

: কি খবর বাতাসী?

বাতাসী হাসি মুখে বলল,

" ইল্লল বিল্লল চিরল পাতা
হাত্তীর মাথাত কলাপাতা।"

বলেই সে ছুটে নিমে গেল নীচে। মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গি–ছুটে পালাবার ভঙ্গির মাঝে কি মিলির কোন ছাপ আছে? সে কি ছেলেবেলায় এ রকম ছড়া বলত? কিছুই মনে পড়ছে না। কোন প্রিয়জন হঠাৎ করে অনেক দূরে চলে গেলে তার কথা বারবার মনে পড়ে। পুরনো সব স্মৃতি ভেসে ওঠে কথাটা কি ঠিক? বোধ হয় না। অনেক চেষ্টা করেও তিনি মিলি প্রসঙ্গে পুরোনো কিছু মনে করতে পারলেন না।

ওসমান সাহেব কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়লেন এবং অত্যন্ত দ্রুত লিখতে শুরু করলেন,

কল্যাণীয়াসু,

মিলি, আজ আমাদের গ্রামের বাড়ীতে অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়েছে। প্রচণ্ড জোছনা হয়েছে। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ জেগে দেখি ঘরে আলোর বন্যা। বন্যার জলের মতই থৈ থৈ করছে জোছনা। একবার ভাবলাম দু'টো চাঁদ উঠলো নাকি আকাশে। বারান্দায় গিয়ে দেখি আইনুদ্দিন তার স্ত্রীকে নিয়ে দড়ি পাকাচ্ছে। তাদের ছোট্ট মেয়েটি কঞ্চি হাতে ছোটাছুটি করছে। কি অপূর্ব একটি ছবি, এ ছবি এ ভুবনের নয় অন্য কোন ভুবনের। আনন্দে আমার চোখ ভিজে উঠল।

মিলি, সমগ্র জীবনে আমি এমন একজন মানুষ হতে চেয়েছিলাম, যার ভেতর কোন রকম ক্ষুদ্রতা থাকবে না। যে এ পৃথিবীর সুন্দর যা কিছু আছে তাকে স্পর্শ করবে.....

বাতাসী আবার এসে দাঁড়িয়েছে। আবার কি একটা ছড়া বলল। ওসমান সাহেব তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আবার লিখতে শুরু করলেন। বাতাসী তাকিয়ে আছে। সে ভেতরে এসে ঢুকল। এই অদ্ভুত মানুষটিকে তার বড় ভাল লাগে। আজ কেন জানি অন্য দিনের চেয়েও ভাল লাগছে।

২৮

ইদানীং রানুর ইনসমনিয়ার মত হচ্ছে।

গত রাত্রে তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিল। আজও ঘুম আসছে না। মাথার দু'পাশে দপ দপ করছে। একটু আগেই এক গ্লাস পানি খেয়েছে কিন্তু এখন আবার তৃষ্ণা হচ্ছে। রানু মশারীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

অপলা পড়ছে। এত পড়ার কোন মানে হয়? তার পড়ার ধরনও অদ্ভুত। কোলের কাছে বই নিয়ে হেঁটে হেঁটে পড়া। এরকম না করলে তার নাকি কিছু মনে থাকে না। রানু বারান্দায় যাবার জন্যে দরজা খুলতেই অপলা চেঁচিয়ে উঠল, কে কে? রানু জবাব দিল না। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চারদিক অন্ধকার। কোন

সারাশব্দ নেই। যাদের ঘুমিয়ে পড়ার তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

: রানু আপা?

: হুঁ।

: আজ ঘুম আসছে না?

: না।

: ঠাণ্ডা পানিতে মাথা ধুয়ে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শুয়ে থাক। চিৎ হয়ে শুবে এবং বড় বড় নিঃশ্বাস নেবে, যাতে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণটা বেশী থাকে।

রানু জবাব দিল না। অপলা কি আজকাল বেশী কথা বলছে? বোধ হয় বলছে। এত কথা আগে বলত না।

: আপা।

: বল।

: আনব দুধ গরম করে? তুমি খেলে আমিও খাব। আমারও ঘুমের ট্যাবল হচ্ছে। অবশ্যি আমার ঘুম হচ্ছে না পরীক্ষার টেনশনে।

অপলা বারান্দায় চলে এল। তার হাতে ডিকশনারী সাইজের একটা বই। অপলা হাসতে হাসতে বলল, আজকাল যেসব স্বপ্ন দেখছি সেগুলিও পরীক্ষা সংক্রান্ত। যেমন গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমাদের এনাটমির কোশ্চেন আউট হয়ে গেছে। সবাই সে কোশ্চেন পেয়েছে। বহু ছোটাছুটি করে আমিও কোশ্চেন জোগাড় করলাম। পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি এনাটমির বদলে সেদিন হচ্ছে বাংলা পরীক্ষা। কঠিন সব ব্যাকরণের প্রশ্ন হল, 'উপপদ তৎপুরুষ সমাস কাহাকে বলে?' বলতে বলতে অপলা হাসতে শুরু করল। রানু লক্ষ্য করল, হাসির দমকে ডিকশনারীর মত মোটা বইটি মেঝেতে ছিটকে পড়েছে। অপলার সেদিকে লক্ষ্যও নেই।

: অপলা!

: বল।

: রাত দুপুরে এরকম চেঁচিয়ে হাসা ঠিক না।

: সরি আপা। দুধ আনব তোমার জন্যে?

: তুই বোস। তোর সঙ্গে কথা আছে।

অপলা বারান্দার মেঝেতেই শিশুদের মত পা ছড়িয়ে বসল অথচ রানুর পাশেই একটা খালি চেয়ার আছে। রানু দেখল অপলা শাড়ির আঁচল মুখে গুঁজে হাসির বেগ সামলাবার চেষ্টা করছে।

: অপলা, গত কয়েক দিন ধরে একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করছি। অকারণেই তুই খুব হাসছিস। বেশ কথা বলছিস।

: পরীক্ষার টেনশনে এরকম হচ্ছে আপা। মেডিক্যাল টার্মে একে বলে ...

: মেডিক্যাল টার্মে যাই বলুক, আমার মনে হয় আমি কারণটা জানি। ভালই জানি।

: জানলে বল। অবশ্যি যদি বলতে চাও।

: তোর মত বয়েসী মেয়েরা যখন নিষিদ্ধ কিছু করে, তখন এরকম আচরণ করে। হঠাৎ খুব প্রগলভ্ হয়ে যায়। নিজেকে আড়াল করে রাখবার জন্যে কৃত্রিম

কিছু আচরণ করে। যেমন তুই করছিস।

অপলা গম্ভীর হয়ে বলল, নিষিদ্ধ কাজটা কি করলাম সেটাও বল শুনি। পরীক্ষা হয়ে যাক তুমি কত বড় ডিটেকটিভ।

: সেটা আমি জানি না তবে অনুমান করতে পারি। আমার ধারণা তুই তোর দুলাভাইকে খুব একটা আবেগের চিঠি লিখেছিস। চিঠিটা পোষ্ট করবার পর তোর মনে হয়েছে কাজটা ঠিক হয় নি, খুব অন্যায় হয়েছে। অপলা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুমি কি আমার চিঠি পড়েছ?

: না পড়ি নি। লুকিয়ে অন্যের চিঠি পড়বার অভ্যেস আমার নেই।

: না পড়লে চিঠির কথা তুমি জানতে পারতে না। এত বড় ডিটেকটিভ তুমি এখনো হও নি।

: অনুমান করে বলেছি। অনুমানটা ঠিক হয়েছে। সব অনুমানতো সব সময় ঠিক হয় না। অনেকবার ভুলও করেছি।

: সারা জীবনই তুমি ভুল করেছ। কেউ কেউ ভুল করবার জন্যে জন্মায়।

অপলা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। রানু কিছু বলবার আগেই ছুটে চলে গেল ভেতরে। রানু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, কি লেখা ছিল সেই চিঠিতে? প্রেমের চিঠি না তো?

অনেক দূরে কোথাও বিদ্যুৎ চকমকাচ্ছে। বর্ষা এসে গেল বোধ হয়। রানু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। শীত শীত করছে। বেশ বাতাস বারান্দায়। ভেতর থেকে একটা চাদর নিয়ে আসবে নাকি? আলসী লাগছে। একবার ভেতরে গেলে আর বারান্দায় আসা হবে না।

অপলা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কেঁদে-টেদে এসেছে বোধ হয়। কিংবা এক্ষুণি হয়ত কাঁদবে। রানু তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রাত কত হয়েছে কে জানে। নিশ্চয়ই অনেক রাত।

: রানু আপা।

: বল।

অপলা থেমে থেমে বলল, আমি তাঁকে আবেগের চিঠি লিখলেও তো তোমার কিছু যায় আসে না।

: তা ঠিক কিছুই যায় আসে না।

: কোন মেয়ে তাকে কি লিখছে, না লিখছে তাতে তোমার কি?

: বললাম তো একবার-আমার কিছুই না।

: এটা তুমি মুখে বলছ, কিন্তু মনে তা স্বীকার কর না। যদি স্বীকার করতে তা হলে আমার সামান্য চিঠি লেখা নিয়ে এতগুলি কথা বলতে না।

রানু হেসে ফেলল। কেমন পাগলের মত কথা বলছে অপলা। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলা। যেন ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছে। রানু শান্ত স্বরে বলল, আমি তোকে তেমন কিছুই বলি নি। তোর যদি ইচ্ছে হয় রোজ তাকে দুটো করে চিঠি লিখিস।

: হ্যাঁ আমি লিখব।

: বেশ তা লিখবি। ঢাকায় এলে হাত ধরাধরি করে বলধা গার্ডেনে যাবি। আমি কিছুই বলব না।

অপলা কাঁদতে শুরু করল। ব্যাপারটা ঘটল হঠাৎ। অপলা যে কেঁদে ফেলতে

www.BDeBooks.Com

পারে এটা সে ভাবে নি। রানু এগিয়ে এসে তাঁর হাত রাখল অপলার পিঠে। শান্ত গলায় বলল, আবেগ খুব মূল্যবান জিনিস এই কথাটা খেয়াল রাখবি। তোর দুলাভাইয়ের মধ্যে অন্য কিছু আছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু আবেগ যে নেই এটা আমি বলতে পারি। দীর্ঘদিন তার পাশে থেকে আমাকে শিখতে হয়েছে। চল ভেতরে চল। ঠান্ডা লাগছে।

: তুমি যাও।

: দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ব। আয়। আর শোন, কাঁদছিস কেন?

: আমি কাঁদলে তোমার কি অসুবিধা?

: আমার কোনই অসুবিধা নেই। যত ইচ্ছা কাঁদ। তবে কথায় কথায় কান্না একমাত্র শরৎচন্দ্রের নায়িকাদেরই মানায়, তোকে মানায় না।

তারা ঘুমুতে গেল রাত দু'টোর দিকে। রানু দেখল, টগর তার খাটে নেই। এক ফাঁকে উঠে চলে গেছে অপলার ঘরে। টগর কি তাকে পছন্দ করে না? কেন করে না? টগরের পরিস্থিতি অন্য কোন ছেলের হলে সে তার মাকেই আঁকড়ে ধরত। সেটাই স্বাভাবিক। রানু অপলার ঘরে উঁকি দিল। টগর অপলার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। দৃশ্যটি সুন্দর। কিন্তু মন খারাপ করে দেবার মত।

: অপলা, টগর কি জেগে আছে?

: হুঁ আছে।

: টগর! টগর!

: কি?

: আমার সঙ্গে ঘুমাবে না?

: ঘুমাব।

: তা হলে এসো।

: আসছি।

কিন্তু টগর উঠে এল না। যেন মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলা। রানু ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বলল, অপলা, তুই চিঠিতে কি লিখেছিস?

: তেমন কিছু না আপা। আসতে লিখেছি। এর বেশী কিছু না।

: খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা তাই না?

: হ্যাঁ।

: আচ্ছা ঘুমো।

: টগরকে নেবে না?

: না। ও তোর সঙ্গেই থাক।

রানুর একফোটাও ঘুম এলো না। হাতের কাছে টগর নেই। বিছানাটা সেই কারণেই কি বিশাল লাগছে? এক সময় তার মনে হল একটা বিশাল মাঠের মাঝখানে সে শুয়ে আছে। তার ভয় ভয় করতে লাগল। ওসমান সব সময় বলতো, জীবজগতে মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাণী, যে একা একা থাকতে পারে। অন্য কোন প্রাণী পারে না। তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনী প্রয়োজন, তবে মানুষ অসাধারণ কল্পনা-শক্তির অধিকারী বলেই সে নিঃসঙ্গ সময়টায় সঙ্গী কল্পনা করে নেয় এবং এক সময় একা থাকাটা তার অভ্যাস হয়ে যায়।

টগরের বাবার নিশ্চয়ই একা থাকাটা এতদিনের অভ্যাস হয়ে গেছে? রানু

এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। অপলা বাথরুম করাচ্ছে বাবুকে। খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে দু'জনে। কি এত কথা ওদের? গুজগুজ ফুসফুস। কান পাতলে হয়ত শোনা যাবে, কিন্তু কান পাততে ইচ্ছে করছে না। টগর হাসছে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে অপলা। ওদের দু'জনের একটি গোপন জগৎ আছে। রানুর সে জগতে প্রবেশের অধিকার নেই। জোর করে সে অধিকার আদায় করা কি সম্ভব? রানু কি এখন ডাকতে পারে টগরকে? শান্ত শীতল গলায় বলতে পারে,

: তোরা কি নিয়ে হাসছিস টগর? আমাকেও দলে নিয়ে নে। আমারও হাসতে ইচ্ছে করছে। আমিও হাসব।

কিন্তু কেউ তাকে দলে নিবে না। ' আমি ছিলাম সারাজীবন দল ছুট' । ক্লাস নাইনে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে চারজন করে গ্রুপিং হবে। একচল্লিশজন ছাত্রী ক্লাসে। দশটি গ্রুপ। সে বাদ পড়ল। তাকে নিয়ে ছাত্রীরা কেউ গ্রুপ করেনি। বদিউজ্জামান স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, কোন এক গ্রুপের সঙ্গে ঢুকে যা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কিন্তু ঢুকবে কার সঙ্গে? যাদের কাছেই গেছে তারাই বলেছে, তুমি ভাই অন্য গ্রুপে যাও। সে সময় তার বয়স কম ছিল। আবেগ ছিল প্রচুর। সেও শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মতই কাঁদতে শুরু করল। চোখ মুছতে মুছতে বদিউজ্জামান স্যারকে বলল, স্যার আমি সায়েন্স পড়ব না। স্যার অবাক হয়ে বললেন, কেউ তোকে গ্রুপে নিচ্ছে না এই জন্যে সায়েন্স পড়া ছেড়ে দিবি? রানু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, সে জন্যে না স্যার। সায়েন্স পড়তে আমার ভাল লাগে না।

: সায়েন্স কি পড়েছিস যে বুঝে ফেললি সায়েন্স পড়তে ভাল লাগে না? আর ফিচ ফিচ করে কাঁদছিস কেন?

: মাথাব্যথা করছে স্যার। এ জন্যে কাঁদছি।

: আবার মিথ্যা কথা? মাথা মুড়িয়ে দেব, বুঝলি?

বদিউজ্জামান স্যার কথায় কথায় বলতেন মাথা মুড়িয়ে দেব। কেউ অঙ্ক পারল না-স্যার হুংকার দিয়ে বললেন, কাল একটা ক্ষুর নিয়ে আসবি তোর মাথা মুড়িয়েদেব। কেউ ক্লাসে লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই পড়ছে-স্যারের চোখে পড়ল, স্যার বললেন, দপ্তরী কালিপদকে ডেকে নিয়ে আয়, ওকে দিয়ে একটা সেভেন ও ক্লক ব্লেড আনিয়ে তোর মাথা মুড়িয়ে দেব।

একজন মানুষ সমগ্র জীবনে অল্প কয়েকজন ভাল মানুষের সাক্ষাৎ পায় যারা তার উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে। বদিউজ্জামান স্যার সে রকম একজন মানুষ। ক্লাস নাইনের সেই প্রাকটিক্যাল ক্লাসে রানু লজ্জা ও অপমানে মরে যেতে বসেছিল। ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে কোন একটা চলন্ত গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। হয়ত করেও বসত সেরকম কিছু। বদিউজ্জামান স্যার তাকে দু'ঘন্টা তাঁর সামনের চেয়ারে বসিয়ে রাখলেন। যতবারই সে বলছে, স্যার উঠি? ততবারই স্যার বলেছেন, আহা বোস না। এত তাড়া কিসের? সে বসেছিল মাথা নিচু করে। শুধু সামনে বসে থাকা... কোন কথাবার্তা নেই। এক সময় তিনি বললেন, আচ্ছা যা এখন বাড়ি যা। একা তোর জন্যে একটা গ্রুপ করে দেব। ভালই হবে। কাজকর্ম ভাল শিখবি। আরেকটা কথা শোন ছোটখাট দুঃখ-কষ্টকে আমল দিতে

নাই। ক্লাসের মেয়েরা তোকে পছন্দ করছে না তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তো করছি। আমার তো মনে হয় তোর মত ভাল মেয়ে আমি আমার শিক্ষকতা জীবনে কম দেখেছি। ছত্রিশ বছর ধরে মাস্টারী করছি, কম দিন তো নয়। কি বলিস? তুই ভাল মেয়ে। খুব ভাল। এটা কখনো ভুলবি না।

এটা স্যারের একটা মিথ্যা কথা। ক্লাসের সব মেয়েকেই স্যার এই কথা কোন না কোন সময় বলেছেন। কিন্তু কত মধুর সেই মিথ্যাটি পৃথিবীতে মধুর মিথ্যার সংখ্যা এত কম কেন ভাবতে ভাবতে রানু চোখ মুছল।

বিয়ের পর সে গিয়েছিল স্যারের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি চিনতে পারলেন না। অবাক হয়ে বললেন, তুমি কোন বাচ্চের মা? কি যেন নাম তোমার? রানু মৃদু স্বরে বলেছিল, আপনি আমাকে একবার আশা ও আনন্দের কথা শুনিয়েছিলেন। সেই কথাগুলি আমি প্রায়ই ভাবি। আমার হাসব্যান্ডকে আপনার কথা বলেছিলাম। তিনি আপনাকে দাওয়াত করেছেন। আপনি কি একবার আসবেন আমাদের বাসায়?

: কি করেন তোমার স্বামী?

: তিনি একজন লেখক। আপনি হয়তো চিনবেন।

স্যার চিনলেন এবং উচ্ছ্বসিত হলেন।

: মা তোমার পরম সৌভাগ্য। তুমি এমন একজনের পাশে আছ যিনি একজন অত্যন্ত উঁচুদরের মানুষ। যিনি শোকে ও দুঃখে মানুষকে পথ দেখান, আশা ও আনন্দের কথা বলেন। এরা মানব জাতির বিবেক। এদের পাশে থাকা ভাগ্যের কথা। কিন্তু মা তার সঙ্গে দেখা করতে আমি যাব না। তাঁর সঙ্গে দেখা করার যোগ্যতা আমার নাই। আমি সামান্য মানুষ।

ভোর হচ্ছে।

একতলায় মোরগ ডাকছে। রানু উঠে পড়ল। উঁকি দিল পাশের ঘরে। টগরের মাথা বালিশ থেকে সরে গেছে। কিন্তু দু'হাতে সে অপলাকে জড়িয়ে ধরে আছে।

কত চমৎকার সব দৃশ্য চারদিকে। তবু কত অর্থহীন এই বেঁচে থাকা।

২৯

সারা বিকাল আকাশ মেঘলা ছিল। সন্ধ্যা বেলা চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। রানু অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল বৃষ্টির শব্দে। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাট আসছে। ঘরের ভিতর প্রচুর হাওয়া। রানু চোখ না মেলেই হাত বাড়াল, টগর নেই। তার সঙ্গেই শুয়েছিল। এক ফাঁকে উঠে চলে গেছে।

: টগর! টগর!

: কি মা?

: কি করছ তুমি?

: কিছু করছি না।

টগর কথা বলছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিতে ভিজছে নিশ্চই। রানু এসে দেখে সত্যি তাই। রেলিং ধরে টগর বসে আছে। গা মাথা ভিজে সপ সপ করছে। চুল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। দৃশ্যটি কেমন যেন অন্য রকম। যেন এই ছেলেটির

কেউ নেই। বারান্দায় বসে বসে কাঁদছে।

: বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক না টগর। ভেতরে আস।

: আসছি।

টগর এলো না। ঠিক আগের মতই বসে রইল। রানুর ইচ্ছা হল কড়া গলায় একটা ধমক দিতে। সে ধমক দিল না। নিজেকে চট করে সামলাল। ছোট বাচ্চাদের খানিকটা নিজের মত থাকতে দিতে হয়। কিছুক্ষণ ভিজলে এমন কি আর ক্ষতি হবে?

: টগর !

: কি মা?

: অপলা কোথায়? আসে নি এখনো?

: না।

: তুমি কি অপলার জন্যেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছ?

টগর জবাব দিল না, সম্ভবত সে অপলার জন্যেই অপেক্ষা করছে। অপলা খাতাপত্র কি সব কেনবার জন্যে নিউমার্কেটে গিয়েছে। এতক্ষণে চলে আসার কথা। আসছেনা কেন, কে জানে।

রানুর মনে হল অপলার অনেক সাহস হয়েছে। আগে একা একা কোথাও যেত না, এখন যাচ্ছে। গত সপ্তাহে কলেজ থেকে ফিরল সন্ধ্যা পার করে। তাদের কি নাকি ফাংশান ছিল। রানু দেখল ফর্সা মত রোগা একটি ছেলে এসেছে তার সঙ্গে। অনেক দিনের পরিচিত এমন ভঙ্গিতে ছেলেটি কথা বলছিল। অপলা বলল, চা খেয়ে যাও সিরাজ। ছেলেটি তার উত্তর দেয় নি। মাথা ঝাকিয়েছে। যার মানে হ্যাঁ কিংবা না দুই হতে পারে।

রানু একবার ভেবেছিল বলবে, রিকশায় একজন ছেলের সঙ্গে আসা ঠিক না। এ রকম আর কোন দিন আসিস না। রিকশায় দু'জন পাশাপাশি বসা মানেই গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসা। এভাবে বসলেই শরীর কথা বলতে শুরু করে।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য এসব কথা বলা হয় নি। কারণ কথাগুলি তার নিজের নয়। ওসমানের কথা। অন্যের কথা নিজের ভেবে বলার কোন অর্থ হয় না।

রানু বাতি জ্বালাতে গিয়ে দেখল ইলেকট্রিসিটি নেই। শহরের ইলেকট্রিসির এমন অবস্থা। একটু ঝড়বৃষ্টি হলেই কারেন্ট নেই। আর একবার নেই হলে সারা রাতের জন্যেই নেই। রানু হারিকেন জ্বালাল। হারিকেনে তেল নেই। কতক্ষণ জ্বলবে কে জানে। ড্রয়ারে মোমবাতি ছিল। কিন্তু এখন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সে চায়ের পানি চাপিয়ে আবার বারান্দায় এল। টগরের ঠান্ডা লাগছে। কিছুক্ষণ পর পরই কেঁপে উঠছে। নীল হয়ে আছে ঠোঁট। কতক্ষণ ধরে সে বৃষ্টিতে ভিজছে?

: টগর!

: কি মা?

: এসো মাথা মুছিয়ে দেই।

টগর উঠে এল। কোন আপত্তি করল না।

: চা খাবে বাবা? তোমাকে একটু আদা চা করে দেই?

www.BDeBooks.Com

টগর অবাক হয়ে বলল, আমি বড় হয়ে গেছি, না?

: হ্যাঁ তুমি বড় হয়েছ। অনেক বড়।

: এখন আমি রোজ চা খাব?

: হ্যাঁ খাবে।

রানু মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে হালকা গলায় বলল, শুধু চা না, চাইলে সিগারেট ও এনে দেব।

: দূর

রানু হেসে ফেলল। টগর উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। শীতে সে অল্প অল্প কাঁপছে। রানুর বড় মায়া লাগল। নির্বিরোধ শান্ত ছেলে হয়েছে টগর। কারো প্রতি তার কোন অভিযোগ নেই।

রানু পিরিচে চা ঢেলে দিল। টগর কেমন বিড়ালের বাচ্চার মত চুক চুক করে চা খাচ্ছে। একবার মুখ তুলে মাকে দেখল এবং হেসে ফেলল।

: আমাদের টগর সোনামনি আজ এত খুশি কেন?

: এম্নি।

: না এম্নি নয়। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

টগর লজ্জিত ভঙ্গিতে পকেটে হাত দিয়ে এক টুকরা কাগজ বের করল। নীল রংয়ের চিঠির কাগজ। সে কাগজটা মার দিকে বাড়াল না। টেবিলে রেখে মাথা নিচু করে হাসতে লাগল।

: কি এটা? চিঠি?

: হুঁ

: কার চিঠি? কে লিখেছে?

: আব্বা।

রানু কাগজ তুলে নিল। ওসমানের চিঠি নয়। চিঠিটা অপলার লেখা। বাবার চিঠি এসেছে এই বলে স নিশ্চয়ই টগরকে বুঝিয়েছে। মেয়েলী ধরনের একটা টিক। রানু অপ্রসন্ন মুখে চিঠিতে চোখ বোলাতে লাগল।

প্রিয় টগর সোনা,

তুমি কেমন আছগো? তোমার কথা খুব ভাবি। লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত তাই আসতে দেরী হচ্ছে। তুমি এক কাজ কর না কেন–চলে এসো এখানে। তুমি এলে খুব মজা হবে। আমরা খুব বেড়াব।

পুকুরে সাঁতার কাটব। আসবে না তুমি? না এলে আমি রাগ করব। আসবে, আসবে, আসবে।

রানু ভ্রু কুঁচকে দীর্ঘ সময় চিঠিটির দিকে তাকিয়ে রইল। এই নকল চিঠিটা কি উদ্দেশ্যমূলক নয়? অপলা কি এখানে সূক্ষ্ম একটা চাল দেয়ার চেষ্টা করছে না? সে নিশ্চয়ই ভেবেছে টগর চিঠি পেয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠবে বাবার কাছে যাবার জন্যে। টগর অবশ্যি সে রকম কিছু করছে না। রানু একবার ভাবল বলে, টগর, এটা একটা নকল চিঠি। এ চিঠি তোমার বাবার লেখা নয়। কিন্তু সে তা বলল না।

বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। অপলার দেখা নেই। কত দেরী করবে সে? রানুর মনে হল অপলাকে কিছু বলা দরকার। স্বাধীনতা মানে রাত করে বাড়ি ফেরা নয়। সে নিজে একজন স্বাধীন মহিলা কিন্তু সে কি রাত-বিরেতে বাড়ি ফিরে না?

অপলা ফিরল কাক ভিজা হয়ে। কাগজে কিনতে গিয়েছিল কিন্তু সঙ্গে কোন কাগজপত্র দেখা গেল না। সে গুন গুন করতে করতে বাথরুমে কাপড় বদলাতে গেল। বাথরুম থেকেই বলল, ক্যাটস এন্ড ডগস বৃষ্টি নেমে গেছে তাই না আপা? আমি আজ অবশ্যি ইচ্ছা করেই ভিজলাম। যখন খুব তেজে বৃষ্টি নামল তখন রিকশার হুড ফেলে দিলাম। রাস্তায় যারা ছিল সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আমাকে পাগল ভেবেছে বোধ হয়।

রানু তার কথার কোন জবাব দিল না। মেয়েটি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এটা ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করা মুশকিল। তাকে বললে কেমন হয়–অপলা তুই এরকম হয়ে যাচ্ছিস কেন?

অপলা খুঁজে মোমবাতি বের করল। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে পড়তে বসল। পড়া আগালো না। এক জায়গায় বসে সে পড়তে পারে না। ঘুরে ঘুরে পড়তে হয়। বই বন্ধ করে সে টগরের সঙ্গে গল্প করতে বসল। পাশেই রানু আছে। সে দিকে সে কিছুমাত্র লক্ষ্য করছে না। যেন এ ঘরে রানু নামের কেউ নেই।

:ভূতর গল্প শুনবি টগর?

: হুঁ।

: হুঁ কি? ভাল করে বল। বল, হ্যাঁ, শুনব।

: হ্যাঁ শুনব।

: ভয় পেয়ে কাঁদবি না তো?

: না কাঁদব না।

: সত্যি ভূতের গল্প শুনবি না মিথ্যা ভূতের গল্প?

: সত্যি ভূতের গল্প।

অপলা হারিকেনের আলো আরো খানিকটা কমিয়ে দিল। রানু লক্ষ্য করল টগর অপলার কোমড় জড়িয়ে কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে। অপলা টগরের মাথায় বিলি কাটতে কাটতে গল্প করছে। রানু কি ঈর্ষা বোধ করছে? করছে বোধ হয়। তার ইচ্ছা করছে টগরকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। এই সন্ধ্যাবেলা কিসের ভূতের গল্প।

বৃষ্টি কমে এসেছিল। রাত দশটার দিকে আবার প্রবল বেগে বর্ষণ শুরু হল। বাতাস বইতে লাগলো প্রচন্ড শব্দে। ঝড় শুরু হল নাকি? দূর থেকেই হৈ চৈ চিৎকারের শব্দ আসছে। বস্তীর কাঁচা ঘর বাড়ি কিছু উড়ে গেছে নিশ্চয়ই। অপলা বলল, কেমন ভয় ভয় লাগছে আপা। পুরুষ কেউ নেই।

: পুরুষ মানুষ থাকলে কি করত? ঝড় থামিয়ে দিত?

: তা দিত না, তবে সাহস পাওয়া যেত। ঘরে কোন পুরুষ মানুষ না থাকলে কেমন একা একা লাগে।

: এরকম মেয়েলী ধরনের কথা বলিস না তো, গা-জ্বালা করে।

: মেয়ে মানুষ মেয়েলী ধরনের কথাই তো বলব? তোমার নিজেরও কিন্তু আপা ভয় ভয় করছে, শুধু মুখে স্বীকার করছ না।

রানু ঘুমুতে ঘুমুতে গিয়ে দেখল টগর বিছানায় নেই। আবার অপলার কাছে চলে গিয়েছে। মশারী ফেলতে গিয়ে এক পলকের জন্যে মনে হল ঝড়-বৃষ্টির

রাতে একজন কেউ পাশে থাকলে ভালই হয়।

: আপা।

: কি?

তোমার তো একা একা ভয় লাগবে। সবাই মিলে আজ একসঙ্গে ঘুমুলে কেমন হয়?

: আমার এত ভয়-টয় নেই,তুই ঘুমুতে যা। আর শোন একটা কথা, বানিয়ে বানিয়ে টগরকে চিঠি লেখার দরকার নেই।

: বেচারা তার বাবার জন্যে মন খারাপ করে থাকো

: থাকতে থাকতে এক সময় অভ্যাস হবে। তখন আর খারাপ লাগবে না।

: অভ্যাস হবার দরকার কি? বাবার জন্যে মন খারাপ হওয়াটা কি খারাপ?

: গত তিন মাসে যে বাবার ছেলের কথা একবারের জন্যেও মনে হয় নি, তার জন্যে মন খারাপ হওয়া ঠিক না।

: একবারও ছেলের কথা মনে হয় নি সেটা তুমি কিভাবে বলছ? চিঠি লিখেন নি তার মানে এই নয় যে.....

: তোর কাছে মানে শুনতে চাই না।

: শোন আপা, আমি যদি টগরকে নিয়ে দুলাভাইয়ের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাই তোমার আপত্তি আছে? মেডিকেল কলেজ দু'দিন বন্ধ থাকবে। সোমবার এবং বুধবার। মঙ্গলবার মিস করলে তিন দিন ছুটি পাওয়া যায়। যাব?

: রানু অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। বলে কি এই মেয়ে!

: কি আপা যাব? যাওয়া কোন সমস্যা হবে না। ট্রেনে যাব তার পর...

: ছুটি হয়েছে , নিজের বাড়িতে যা।

: নিজের বাড়িতে আমার আছে কে বল? তা ছাড়া এক দু'দিনের জন্যে গিয়ে হবেটা কি। গরমের ছুটিতে তো এম্নিতেই যাব। যাব না?

অপলা রানুর পাশে বসল। সে কি আগের চেয়ে রূপবতী হয়েছে, না হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় তাকে সুন্দর লাগছে? এত লম্বা চুল ছিল অপলার তা আগে লক্ষ্য করা হয় নি। অপলা হালকা গলায় বলল, তোমার সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে আপা। তোমার কোথাও কেউ নেই, আমারো নেই। এটা এমন কোন হাসির কথা নয়,কিন্তু অপলা হাসল। রানু বলল, অনেক অমিলও আছে।

: তা আছে। স্বভাব-চরিত্র দু' জনের দু' রকম।

: তোর স্বভাব-চরিত্র অবশ্যি দ্রুত বদলাচ্ছে।

: তোমার ও বদলাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে তুমি ততই কঠিন হচ্ছ। এটা ঠিক না আপা। নিজে কষ্ট পাচ্ছ। অন্যকেও কষ্ট দিচ্ছ।

অপলা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। উঠে দাঁড়াল । রানু কিছুই বলল না। অপলা দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল এবং শান্ত স্বরে বলল, আমি ঠিক করেছি আমি যাব। টগরকে তুমি আমার সঙ্গে দিতে না চাও দিও না। আমি একাই যাব।

: হঠাৎ তোর এত আগ্রহের কারণ কি?

: আমি দুলাভাইয়ের একটি চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাকে যাবার জন্যে লিখেছেন।

: চিঠি কবে পেয়েছিস?

: গতকাল।

: সেখানে কি লেখা আছে টগরকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে?

: না নেই।

: তুই একাই যা। ওকে নেবার দরকার নেই।

: আপা, তুমি কি চিঠিটি পড়তে চাও?

: না আমি পড়তে চাই না। অন্যের চিঠি পড়ার অভ্যেস আমার নেই। ব্যক্তিগত চিঠি আমি পড়ি না।

: পড়তে চাইলে পড়তে পার। তোমার টেবিলের উপর রেখে এসেছি। টগরকে আমার সঙ্গে যেতে দাও আপা। প্লীজ!

অপলা ঘুমুতে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম এল না। সে খানিকক্ষণ কাঁদল। কত অদ্ভুদ দুঃখ কষ্ট আছে মানুষের। এরকম সুন্দর একটি রাতে কেউ কাঁদে? রানু হঠাৎ ঠিক করল টগরকে সে অপলার সঙ্গে যেতে দেবে।

রানু ভাবতেও পারেনি অপলা সত্যি সত্যি টগরকে নিয়ে রওনা হবে। এ জীবনে আমরা অনেক কিছুই করতে চাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে না। কল্পনাকে কাজে লাগানো কঠিন। রানু কলেজে উঠে একবার ঠিক করেছিল একা একা সোনারগাঁ যাবে, প্রাচীন রাজধানী ঘুরে ঘুরে দেখবে। এখনো তা করা হয়ে ওঠে নি। অথচ কত কাছে সোনারগাঁ।

রানু লক্ষ্য করল অপলা বেশ ঘটা করে তার স্যুটকেস ঠিকঠাক করছে। খুব উৎসাহ নিয়ে টগরের সঙ্গে আসন্ন ভ্রমণ প্রসঙ্গে আলোচনা করছে। উদ্দেশ্য অবশ্যি রানুকে শোনানো। কিন্তু রানু চুপচাপ। সে কোন রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অপলা যখন বলল, টগরের জন্যে কি গরম কাপড় নেব আপা? রানু হেসে বলল, এই গরমে গরম কাপড় কেন?

: তাহলে থাক। নেবার দরকার নেই। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কিনা কে জানে? হয়তো রাতে উঠে কাঁদতে শুরু করবে।

: কাঁদবে না।

: আমারও মনে হয় কাঁদবে না। আমার কি মনে হয় জান আপা? আমার মনে হয় বাবাকে ছেড়ে আসতেই চাইবে না।

: আসতে না চাইলে রেখে আসিস।

অপলা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল তা হলে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি রেখে আসব। রানু গম্ভীর হয়ে বলল, বললাম , তো রেখে আসিস।

: কিন্তু তুমি খুব কালো করে বলছ। এটা রাগের বলা। এই কথাটি তুমি কি হাসি মুখে বলতে পারবে? দেখি হাসতে হাসতে বল তো?

রানু কিছু বলে নি। বিরক্ত হয়েছে। ইদানীং অপলা তাকে বেশ বিরক্ত করছে। যা সে পছন্দ করে না তা করতে চেষ্টা করছে। ইচ্ছা করেই করছে বোধ হয় কেন সবাই এমন বৈরী হয়ে উঠছে?

অপলারা যাবে সকাল সাড়ে এগারোটায়। রানু অফিসে গেলো না। খুব ঘন ঘন অফিস কামাই হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এ নিয়ে কেউ তাকে কিছু বলছে না। কিন্তু এক সময় হয়তো বলবে। সিদ্দিক সাহেব মিষ্টি মিষ্টি গলায় খুব কড়া কড়া কিছু

www.BDeBooks.Com

কথা শুনিয়ে দেবেন। এই লোকটিও এখন তার পছন্দ হচ্ছে না। পছন্দ না হবার কোন কারণ নেই। সিদ্দিক সাহেব মানুষটি ভদ্র, কাজ বোঝেন এবং প্রচুর কাজ করেন। সমস্যাটি কোথায় তা হলে? এ রকম হচ্ছে কেন রানুর?

টগর সকাল থেকেই বেশ গম্ভীর। বারবার তার নিজের ছোট্ট স্যুটকেস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। রানু ভেবেছিল শেষ মুহূর্তে টগর মত বদলাবে। মাকে ছেড়ে যেতে চাইবে না। কিন্তু টগরের ভাবভঙ্গি সেরকম নয়। সে মাকে কিছুটা এড়িয়ে চলছে। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছে মা হঠাৎ বলবে, 'তোমার যাবার দরকার নেই, টগর। তুমি চলে গেলে আমি একলা হয়ে যাব। রাতে ভয় লাগবে। তুমি থেকে যাও।'

টগর অপলার পাশে পাশে ঘুরছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে মাকে। চোখে চোখ পড়া মাত্র মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে। যেন সে মাকে চিনতে পারছে না। ওরা রওনা হবার আগে আগে রানু টগরকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

: টগর খুব সাবধানে থাকবে কেমন? একা একা পুকুরে যাবে না। আচ্ছা?

: টগর মাথা নাড়ল। সে যাবে না।

: ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করবে।

: করব।

: বাবার জন্য কি নিয়ে যাচ্ছ টগর?

: টগর অবাক হয়ে তাকাল মার দিকে? ঠিক এই প্রশ্ন সে আশা করে নি।

: বাবার জন্যে কিছু একটা নিয়ে যাওয়া উচিত না? সে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে কি আনলে আমার জন্যে? তখন কি বলবে তুমি?

: কি নেব?

: তুমি ভেবে–টেবে বের কর কি নিতে চাও।

: তুমি বলে দাও।

: এমন কিছু নিতে হবে যাতে সে খুশী হয়। ভেবে–টেবে বের করতে হবে কি নিলে খুশী হবে। এসো আরো ভাবি । বোকা ছেলে এমন করে কেউ বুঝি ভাবে? ভাবতে হয় গালে হাত দিয়ে।

টগর সত্যি সত্যি গালে হাত দিল। রানু হেসে ফেলল। চমৎকার একটি ছবি। ছেলে গালে হাত দিয়ে ভাবছে বাবার জন্যে কি নেয়া যায়? এর মধ্যে কোথায় যেন মন খারাপ করার মত একটা ব্যাপার আছে।

রানু বলল,

: আমার জন্যে মন খারাপ লাগবে না?

: লাগবে।

: তুমি কাঁদবে না আমার জন্যে?

: হুঁ। কাঁদব।

: তা হলে একটু কাঁদ আমি দেখি।

টগর ফিক করে হেসে ফেলল। ছোট্ট ছোট্ট হাতে জড়িয়ে ধরল মাকে। রানু একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন সে এই শিশুটিকে দেখবে না। আর সে ফিরে আসবে না মার কাছে।

রানু ভেবেছিল ঘর থেকেই সে তাদের বিদেয় দেবে । কি মনে করে সে

ওদের ট্রেনে উঠিয়ে দিতে গেল। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে অপলা বলল, তুমি একা একা ও বাড়িতে থাকতে পারবে না আপা। তুমি খালার কাছে চলে যাও। খালার সঙ্গে থাক। রানু গম্ভীর স্বরে বলল, আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। তুই টগরকে চোখে চোখে রাখবি। পানিতে যেন না নামে।

: কোন ভয় নেই আপা।

: পৌঁছেই টেলিগ্রাম করবি।

: টেলিগ্রাম পৌঁছবার আগে তো আমরাই চলে আসব।

: তবু করবি।

: ঠিক আছে করব।

রানু হঠাৎ লক্ষ্য করল টগর কাঁদছে। অপলা বিরক্ত হয়ে বলল, এই কাঁদছিস কেন? টগর জবাব দিল না। শাড়ির আঁচলে সে মুখ ঢেকে রেখেছে। বারবার তার ছোট্ট শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। অপলা বলল, মার জন্যে খারাপ লাগছে?

: হুঁ।

: তা হলে যাবার দরকার নেই। তুই থেকে যা।

: উঁহু। আমি যাব।

টগরের কান্না আরো বেড়ে গেল। গার্ড হুইসেল দিয়েছে। গাড়ি চলতে শুরু করবে অপলা বিব্রত মুখে বলল, 'আপা, তুমি ও উঠে এসো না।

প্লীজ।'

রানু জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে রইল। এবং এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিল। তার নিজের চোখেও কি পানি আসছে।? আসছে বোধ হয়। সব কেমন ঝাপসা লাগছে। রানু সান গ্লাস চোখে দিল; জল–ভরা চোখ কাউকে দেখাতে ইচ্ছা করে না। ট্রেন চলে যাবার পরও সে কিছুটা সময় ঘুরে বেড়াল স্টেশনে। সিলেট মেল এসে থেমেছে। ব্যস্ত হয়ে যাত্রীরা নামছে। কত বিচিত্র ধরনের মানুষ আছে এই পৃথিবীতে। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য জনের কোন মিল নেই। ছোট একটি বাচ্চা গর্বিত ভঙ্গিতে গট গট করে হাঁটছে। তার মা হাত ধরতে চাচ্ছে। সে কিছুতেই হাত ধরতে দেবে না। কি গম্ভীর শিশুটির চলার ভঙ্গি। টগরের মত হয়েছে বোধ হয়। রানুর চোখ আবার ভিজে উঠছে। মন দুর্বল হয়ে গেছে। ভাল কথা নয়।

রানুর মামা ইসমাইল সাহেব, রানুকে দেখে খুবই অবাক হলেন। দীর্ঘ দিন পর সে বাড়িতে এলো। ইসমাইল সাহেব বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে ছিলেন। তিনি উঠে বসতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। এখন প্রায় অথর্ব অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। নিজে নিজে কিছুই প্রায় করতে পারেন না।

: কেমন আছ মামা?

: ভাল আছি। বেশ ভাল। তুই কি মনে করে?

: দেখতে এলাম। বাসায় কেউ নেই নাকি? ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

: বিয়ে বাড়িতে গেছে। চলে আসবে। সন্ধ্যার আগেই চলে আসবে। তুই বোস।

রানু বসল। ইসমাইল সাহেব হাত বাড়িয়ে রানুকে কাছে টানলেন। হালকা গলায় বললেন, এখনো রাগ পুষে রেখেছিস?

: না মামা কারো উপর আমার রাগ টাগ নেই।

: এদিকে তো আসিস না

: ইচ্ছে করেই আসি না।

: কেন?

তোমার কথা না শুনে বিয়ে করেছিলাম। খুবই রাগ করেছিলে তুমি। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলে, মনে আছে।?

ইসমাইল সাহেব কিছু বললেন না। রানু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সেই বিয়ের আজ এই অবস্থা । লজ্জাতেই আসি না।

: আজ কি মনে করে এলি?

: কিছু করার ছিল না। কোথাও যাবার ছিল না–তাই এসেছি।

: টগরকে কার কাছে রেখে এসেছিস?

: ও তার বাবার কাছে গেছে। গ্রামের বাড়িতে। ওর বাবা কিছুদিন ধরে গ্রামের বাড়িতে আছেন।

: জানি।

: কিভাবে জানলে?

: কোন পত্রিকায় যেন দেখলাম–কথাসাহিত্যিকের নির্বাসন।

রানু চুপ করে গেল। ইসমাইল সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, গ্রাম নিয়ে কিছু লিখবেন বোধ হয়?

: জানি না। লিখলে লিখবে। লেখালেখির ওপর আমার কোন ভক্তি নেই। উৎসাহ–ও নেই। ঐ প্রসঙ্গ থাক মামা। অন্য কিছু নিয়ে আলাপ কর। তোমার শরীর এখন কেমন?

: ভাল না। সময় বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে।

: আফসোস হয়?

: না, দায়িত্ব পালন করেছি। মেয়েগুলির বিয়ে দিয়েছি। ছেলেটা চাকরি করে। আফসোস থাকবে কেন? কোন আফসোস নাই।

: মামা, চা খাব।

: নিজে বানিয়ে খেতে হবে। কাজের ছেলেটা কোথায় যেন গেছে।

: তুমি খাবে?

: চা–সিগারেট আমার জন্যে নিষিদ্ধ তবে তোর খাতিরে খাব এক কাপ।

রানু চা বানাতে গেল। সে প্রায় বার বছর এই বাড়িতে কাটিয়েছে কিন্তু তবু সব কেমন অচেনা লাগছে। পুরানো আসবাব প্রায় কিছুই নেই। ঝক ঝক করছে চারদিক। তার সময় এরকম ছিল না। এলোমেলো থাকতো সব কিছু । এখন ঘর সাজায় কে? এ বাড়িতে কোন মেয়ে নেই। মামা তার ছেলের বিয়ে দেন নি। নাকি দিয়েছেন কিন্তু তাকে জানান নি? বোধ হয় তাই। মামার সঙ্গে তার এখন আর সম্পর্ক নেই। রানু সবার কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে।

: মামা তোমার চা। চিনি দেইনি। চিনি নিশ্চয়ই খাও না?

: না, খাই না।

ইসমাইল সাহেব নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। চায়ে চুমুক দেবার ভঙ্গি, বসে থাকার ভঙ্গি সব কিছুতেই গভীর ক্লান্তির ছোঁয়া। সত্যি সত্যি কি তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছে? যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

রানুর বড় মায়া লাগল। ইসমাইল সাহেব বললেন, আজ রাতটা আমার এখানে থেকে যা। বুলুর বিয়ে দিয়েছি, ওর বৌকে দেখবি।

: বুলুর বিয়ের কথা আমাকে তো কিছু বল নি।

: বলার মত বিয়ে নয়। বলার মত হলে বলতাম।

ইসমাইল সাহেব ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে মাথা রাখলেন।

: তোমার শরীর এত খারাপ তবু সবাই তোমাকে একা ফেলে চলে গেল?

: ওরা যেতে চায়নি আমি জোর করে পাঠিয়েছি। সব সময় সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত , এটা সহ্য হয় না।

রানু খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, মামা আমি টগরকে নিয়ে যখন আলাদা হয়ে গেলাম তুমি কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করলে না কেন এরকম করলাম?

ইসমাইল সাহেব চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন কিছু বললেন না।

: আমি আশা করেছিলাম তুমি অন্তত জানতে চাইবে। আমার সব কথা শুনবে এবং শেষ পর্যন্ত বলবে, যা করেছিস ভালই করেছিস।

ইসমাইল সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, যা করেছিস ভালই করেছিস।

: তুমি কিছু না জেনেই বলেছ। মামা মন দিয়ে শোন, মনিকা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে টগরের বাবার খুব ভাব ছিল। মেয়েটি দারুণ রূপবতী এবং চমৎকার মেয়ে। মামা তুমি কি আমার কথা শুনছ?

ইসমাইল সাহেব জবাব দিলেন না। রানু দেখল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সন্ধ্যা মিলিয়েছে। গাছে গাছে পাখ–পাখালি ডাকছে। আকাশে মেঘ। আজও বোধ হয় ঝড়বৃষ্টি হবে। রানু ব্যাকুল হয়ে কাঁদিতে লাগল।

৩০

অপলারা পৌঁছল সন্ধ্যা মিলবার পর।

ট্রেন থেকে নেমেই সে একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। আকাশ মেঘে কালো হয়ে আছে, ঘন ঘন বিজলী চমকাচ্ছে। অল্প কিছু লোক নেমেছে ট্রেন থেকে, তারা মুহূর্তের মধ্যেই উধাও। ফাঁকা স্টেশন। চারদিক নিশুতি রাতের মত নীরব। অপলা টগরের হাত ধরে বলল, ভয় লাগছে টগর?

: না। কিসের শব্দ হচ্ছে খালা?

: কি জানি , ঝিঁ ঝিঁ পোকা বোধ হয়। তোর ভয় লাগছে নাতো?

: না।

: ভয়ের কিছু নেই। তোদের দাদার বাড়ি এখানে সবাই চিনে। বললেই হবে, মোক্তার বাড়ি। স্টেশন থেকে কোয়ার্টার মাইল।

: কোয়ার্টার মাইল কি?

: কোয়ার্টার মাইল হচ্ছে খুব কাছে। তোর ভয় লাগছে নাতো?

: না।

: বৃষ্টি নামার আগে আগেই পৌঁছে যাব। আর না হয় বৃষ্টিতে অল্প ভিজব কি বলিস মজাই হবে।

www.BDeBooks.Com

টগর উত্তর দিল না। তার মোটেই ভয় লাগছে না। বেশ মজাই লাগছে। বৃষ্টি নামলে আরো মজা হয় । শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকটা শুনতে কেমন কেমন লাগছে । এই পোকাগুলি মানুষকে কামড়ায় কিনা কে জানে। এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছে , কিন্তু সে জানে জিজ্ঞেস করলে ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। অপলা বলবে, না না কামড়ায় না। টগর লক্ষ্য করল খালামনি কেমন অসহায় খালামনি ভঙ্গিতে স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বোধ হয় কাউকে জিজ্ঞেস করতে চায় কোনদিকে যেতে হবে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারছে না।

: খালামনি চল।

: দাঁড়া একটু, এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? ঐ লোকটা আসছে ওকে জিজ্ঞেস করব। ও বোধ হয় স্টেশন মাষ্টার।

: কি ভাবে বুঝলে?

অপলা উত্তর দিল না। লোকটির দিকে এগিয়ে গেল।

স্টেশন মাষ্টার অবাক হয়ে বললেন, কোথায় যাবেন? মোক্তার বাড়ি? ফয়সল সাহেবের বাড়ি? সেতো অনেকটা দূর।

: কত দুর?

: মাইল খানেকটা তো হবেই । গ্রামের মাইল শহরের মাইলের মত না, হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যাবে তবু মাইল শেষ হবে না। পুরুষ মানুষ কেউ নেই আপনাদের সাথে?

: জ্বি না।

: মোক্তার সাহেবের বাড়িতে তো কেউ থাকে না, সেখানে কার কাছে যাবেন?

অপলার বুক ধক করে উঠল। ট্রেনে উঠার পর থেকে এ রকম একটা আশঙ্কা তার হচ্ছিল—গিয়ে দেখবে বাড়ি তালাবন্ধ। দুলাভাই চলে গেছেন ঢাকা কিংবা অন্য কোথাও। বাড়ি দেখাশোনার জন্যে যারা ছিল তারাও নেই। মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে কিংবা অন্য কোন গ্রামে যাত্রা দেখতে গেছে। ঢাকা ফিরে আসার কোন ট্রেন নেই তারা রাত কাটাচ্ছে স্টেশনে। এমন সময় দুষ্ট কিছু লোকজন তাদের ঘিরে ধরল। তাদের মধ্যে একটি লোক খুব লম্বা। তার সরু সরু হাত লোমে ভর্তি। সে খপ করে অপলার হাত ধরে ফেলল...

দুশ্চিন্তাগুলি এত স্পষ্ট হয় কেন কে জানে? ট্রেনে ওঠার পর থেকে তার আশপাশের সবাইকেই অপলার দুষ্ট লোক বলে মনে হচ্ছিল। একজন টগরকে বাদাম কিনে দিল, অপলার সঙ্গে খুব খাতির জমানোর চেষ্টা করল। অপলার দৃঢ় ধারণা হল, লোকটার কোন একটা মতলব আছে। সেই ধারণা ঠিক হয় নি, লোকটি ময়মনসিংহ স্টেশনে নেমে গেছে এবং নেমে যাবার আগে অপলাকে বলেছে—যদি দেখেন পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়েছে তা হলে স্টেশন মাষ্টারকে বলবেন পৌঁছে দিতে। অন্য কাউকে বলবেন না। আজকাল গ্রামে ও টাউট শ্রেণীর একদল মানুষ তৈরি হয়েছে।

স্টেশন মাষ্টার যথেষ্ট করলেন। একজন কুলী জোগাড় করলেন। হারিকেন এবং ছাতার ব্যবস্থা করলেন। এবং বার বার বললেন, মেয়ে মানুষের এতটা সাহস থাকা উচিত না। ছোট একটা বাচ্চাকে নিয়ে একা একা রওনা হওয়া । কি

সর্বনাশের কথা। দিনকালও ভাল না। যখন তখন ঝড়টর হচ্ছে।

পথে নেমে টগরের খুব আনন্দ হল। কত অদ্ভুত সব দৃশ্য চারদিকে। এবং সবই অচেনা। কতরকম শব্দ উঠছে—আর সারাক্ষণই কেমন মজার একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একটা বাঁশ ঝাড়ের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

: ঐ সব কি জোনাকি খালামনি?

: হ্যাঁ।

: ওরা কি করছে?

: খেলা করছে বোধ হয়।

: এখানে এত জোনাকি কিন্তু শহরে জোনাকি নেই কেন?

: জানি না কেন। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করবে, চল টগর দাঁড়িয়ে থাকবে না। দেরী হচ্ছে বৃষ্টি নামবে।

: বেশীক্ষণ দাঁড়াব না। অল্প একটু দাঁড়াব।

: বৃষ্টি নামবে তো।

: নামুক।

টগর কিছুক্ষণ পরপরই দাঁড়িয়ে পড়ছে। তাকে আর নাড়ানো যাচ্ছে নাক। অপলা তাকে কোলে তুলতে চেষ্টা করল সে কোলে উঠবে না। সমস্তটা পথ হেঁটে হেঁটে যাবে।

: কিসের শব্দ হচ্ছে খালামনি?

: ঘন্টা। ঘন্টার শব্দ হচ্ছে।

: ঘন্টার শব্দ হচ্ছে কেন?

: হিন্দুরা পুজা করছে। ওরা ঘন্টা বাজিয়ে পূজা করে।

: ওরা ঘন্টা বাজিয়ে পুজা করে কেন?

: জানি না কেন । ওদেরকে জিজ্ঞেস কর।

টগর ভেবে পেল না এত সুন্দর সব দৃশ্য , এত সুন্দর সব শব্দ কিন্তু খালামনির ভাল লাগছে না কেন। একটা জায়গায় দেখা গেল লক্ষ লক্ষ ব্যাং ডাকছে। প্রথমে একটা ব্যাং মোটা গলায় কয়েকবার ডাকে তার পরপর অন্য ব্যাংগুলি লাফালাফি করে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ চুপ করে যায়। এ রকম করে কেন ওরা?

: খালামনি!

: না আর একটি কথাও না। তুমি আমার কোলে আস টগর। এখনো অনেক দূর।

: ব্যাঙরা সবাই একসঙ্গে কথা বলে কেন?

: জানি না কেন। চুপ করে থাক তো এখনা বৃষ্টি হলে কি অবস্থা হয় দেখবি।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামল। প্রথমে ছোট ছোট ফোটা তারপরই মুষল বর্ষণ। সেই সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস । ছাতা মেলতেই সেটা উল্টে গেল। টগর বলল, ছাতা উল্টে গেল কেন খালামনি?

: এবার কিন্তু চড় খাবি টগর।

সঙ্গের কুলি জিজ্ঞেস করল আশেপাশের কোন বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াবে কি না। অপলা রাজি হল না। তারা বাড়িতে পৌছল কাকভেজা হয়ে। অপলার শাড়ি

কাদায় মাখামাখি । সে দুবার কাদায় পা পিছলে পড়েছে। স্যান্ডেলের ফিতা গিয়েছে খুলে। রাগে দুঃখে তার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু টগরের আনন্দের সীমা নেই। তার পাঁচ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে এত আনন্দের ভ্রমণ সে এর আগে আর করে নি। এবং কে জানে ভবিষ্যতে-ও হয়তো আর করবে না। তীব্র ও তীক্ষ্ণ আনন্দের মুহূর্ত একজন মানুষের জীবনে বার বার আসে না।

ওসমান সাহেব বাড়িতেই ছিলেন। হৈ চৈ শুনে হারিকেন হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। দেখতে কেমন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী লাগছে। তিনি শিশুদের গলায় চেঁচালেন, আরে কারা এসেছে। কাউকেই তো চিনতে পারছি না। এই ছোট ছেলেটা কে ? চেনা চেনা লাগছে কেন? টগর ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি, তাকে কোলে তুলতেই সে মুখ লুকালো তার বুকে। তার কেন জানি বড় লজ্জা লাগছে। কাউকে এখন আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা করছে না। অপলা বলল, দুলাভাই, আপনার জামাকাপড় তো সব কাদায় মাখামাখি করে দিল।

: দিক। তুমি কেমন আছ অপলা?

: ভাল আছি। আপনি দাঁড়ি-গোঁফ রেখে এমন রবীন্দ্রনাথ সেজেছেন কেন?

: ব্লেড পাওয়া যায় না। ব্লেডের অভাবে এই কান্ড।

: আপনাকে দাঁড়ি গোঁফে কিন্তু ভালই লাগছে।

ওসমান শব্দ করে হেসে উঠলেন। ভরাট গলায় হাসি।

টগর ও হাসতে শুরু করল। যেন এই রসিকতাটা বুঝতে পেরেছে। ওসমান সাহেব বললেন, আজ তোমরা আসবে এটা কিন্তু আমি জানতাম।

: বাজে কথা বলবেন না দুলাভাই।

: বাজে কথা না। তোমাদের জন্য রান্না করতে বলেছি। ফুলির মাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

: জানতেন তাহলে ষ্টেশনে থাকলেন না কেন?

: সেটা অবৈজ্ঞানিক কান্ড হত। অবৈজ্ঞানিক কিছু তো আমি করতে পারি না। মনের কোন খেয়ালকে খানিকটা প্রশ্রয় দেয়া যায় বেশি প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

: কি করে বুঝলেন আজ আমরা আসব?

: তা জানি না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল। টেলিপ্যাথি বোধ হয়। দুজন আসবে সেটা বুঝি নি। আমার মনে হচ্ছিল তোমরা তিনজনই আসবে।

অপলা থেমে থেমে বলল, আপাও আসতো ছুটি পায় নি তাই। বলেই অপলার মনে হল-দুলাভাই যেন অন্য এক রকম ভঙ্গিতে হাসলেন। শিশুদের মিথ্যা কথা প্রশ্রয় দেবার মত ভঙ্গিতে হাসা। মিথ্যাটি না বললেই হত।

: দুলাভাই , আমরা আসায় আপনি কি খুশি হয়েছেন?

: হ্যাঁ।

: আপনার নির্জন তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম তাই না?

: তপস্যা-টপস্যা কিছু না। মহাপুরুষরা তপস্যা করেন। আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। যাও, গোসল কর কাপড় বদলাও । চা করতে বলেছি। ফুলির মা বাথরুমে পানি তুলে দেবে।

: আপনাদের নাকি পাকা ঘাট দেয়া চমৎকার পুকুর আছে। বৃষ্টির মধ্যে সেই

পুকুরে সাঁতার কাটতে নাকি দারুণ মজা।

: কার কাছে শুনলে?

: আপার কাছে। আপা বলে দিয়েছে।।

ওসমান সাহেব একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। অপলা সুন্দর একটি স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে। বিয়ের পর পর রানুকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন। শ্রাবণ মাসের এক দুপুরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সেই বৃষ্টিতে দুজনে পুকুরে নেমেছিলেন। রানু কিছুতেই নামতে চাচ্ছিল না। তিনি প্রায় জোর করে তাকে রাজি করিয়েছিলেন।তার পর সে আর উঠে আসতে চায় না। যত বার তিনি বলেন, রানু চল, উঠা যাক। রানু ততবারই বলে, আর একটু , আর একটু।

সুখের উপকরণ চারদিকে ছড়ানো থাকে। আমরা প্রায় সময়ই তা বুঝতে পারি না। হঠাৎ এক সময় তার দেখা পাই এবং অভিভূত হয়ে পড়ি।

অপলা পুকুরে গোসল করতে যাবে বলে ঠিক করল। ফুলির মা আপত্তি করবার চেষ্টা করছে। ভর সন্ধ্যায় খোলা চুলে পুকুরে নামা ঠিক না। কিন্তু তার আপত্তি গ্রাহ্য হয় নি । টগরও তার খালামনির সঙ্গে পুকুরে নামবে। সেও নাকি সাঁতার কাটবে।

ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ওসমান সাহেব ছাতা মাথায় দিয়ে একটি হারিকেন হাতে পুকুর ঘাটে এসেছেন। জলে নেমেছে টগর এবং অপলা। ফুলি পানিতে পা ডুবিয়ে পুকুর ঘাটে বসে আছে। ওসমান সাহেব বললেন, বেশিদূর যেও না অপলা।

: আমাকে নিয়ে ভয় নেই দুলাভাই। আমি চমৎকার সাঁতার জানি। আপনি টগরকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যান। ওর ঠান্ডা লাগবে।

: তুমি না উঠলে ও উঠবে না।

: আমি এখানে অনেকক্ষণ থাকব। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত উঠবে না।

ওসমান সাহেব মৃদু হাসলেন। কিছু বললেন না। বিশেষ ঘটনা কি মানুষের জীবনে বারবার ফিরে আসে? ঠিক অপলার মত গলায় রানুও তো একদিন এই কথাই বলেছিল। সেদিন তিনি অবশ্যি রানুর পাশে ছিলেন।

আজ ছাতা মাথায় একটি কড়ই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকৃতি কি একই ঘটনা বিভিন্ন রকমভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত করে? এ রকম একটি ঘটনা কি আবার তাঁর জীবনে ঘটবে? অসম্ভব নয়। একদিন হয়তো টগরের ভালবাসার একটি মেয়ে এ রকম বৃষ্টির রাতে পুকুরে নামবে এবং অবিকল রানুর মত গলায় বলবে-বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমি উঠব না, তিনি দূর থেকে শুনে ফেলবেন।

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে ডাকলেন, অপলা গ্রামে বসে বসে একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করলাম।

: কি সেটা?

: গাছের যৌবন বার বার ফিরে আসে কিন্তু মানুষের যৌবন মাত্র একবার।

কথা শেষ হওয়া মাত্র জোর বৃষ্টি শুরু হল। টগর মহানন্দে হাততালি দিল।

৩১

অপলা ভেবে রেখেছিল সে দুদিন থাকবে, শুক্র ও শনি। খুব বেশি হলে তিন দিন। সোমবার ড. মাইতির ক্লাস। ঐ ক্লাসটি ধরতেই হবে। এ্যবসেন্ট করলে তিনি

www.BDeBooks.Com

নামের পাশে দাগ দিয়ে রাখেন এবং পরের দিন এমন সব প্রশ্ন করেন যার উত্তর কারোরই জানা থাকে না। প্রশ্নতেই শেষ নয় শান্ত মুখে এমন সব বলেন যা শুনলে ক্লাস ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। যেমন রীতাকে একদিন বললেন, ডাক্তার যে তোমাকে হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। তোমার হাবভাব ডাক্তারের মত নয়, বিরহী প্রেমিকের মত। বুঝতে পারছ? এখন তুমি আমাকে বল, তোমার ডান হাতের কব্জির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাড়টির কি নাম। উঁচু গলায় বল যেন সবাই শুনতে পায়।

রীতা কোনমতে বলল, আমি জানি না স্যার । বলেই সে বসে পড়ল এবং খুব ঘামতে লাগল। মাইতি স্যার বললেন, তোমাকে কিন্তু এখনো আমি বসতে বলি নি। কেউ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বসে পড়লে আমার খারাপ লাগে। কাজেই তোমাকে আমি এখন এমন প্রশ্ন করব যার উত্তর তোমার জানা আছে বলে আমার ধারণা । বল, প্রেম এবং ভালবাসার মধ্যে পার্থক্য কি?

ক্লাসের সবাই হো হো করে হাসতে লাগল। এই হচ্ছে মাইতি স্যার। তাঁর ক্লাস মিস করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অপলা রোববার ভোরে বেশ সহজভাবেই বলল, আজ ঢাকা না গেলে কেমন হয় রে টগর? টগর গম্ভীর হয়ে বলল,

: ভাল হয়।

: কিন্তু মাইতি স্যার যে আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। সবার সামনে কাঁদিয়ে ছাড়বে। চিনিস তো না তাঁকে।

: তা হলে চল যাই।

: শরীরটা ভাল লাগছে না। কেমন যেন জ্বর জ্বর লাগছে, দেখ তো গায়ে হাত দিয়ে।

অপলার গা নদীর জলের মত শীতল কিন্তু টগর উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, উফ্ খুব জ্বর তো।

: যা, স্যুটকেস খুলে কাপড় বের করে ফেল। আগামী সোমবারের আগে ঢাকা গিয়ে পৌঁছলেই হবে। তোর আবার মন খারাপ লাগছে না তো?

: না।

: মার জন্যে কান্না আসছে না?

: না।

: একটু ও না?

টগর তার জবাবে হেসে ফেলল। এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। সম্ভবত মনে করল, হাসাটা ঠিক নয়। মার জন্যে কিছুটা হলেও মন খারাপ করা দরকার । কিন্তু তার সত্যি সত্যি মার কথা মোটেও মনে পড়ছে না। বরং মার কাছে ফিরে যেতে হবে ভেবেই খারাপ লাগছিল।

বাবা তার সঙ্গে খুব কথা-টতা বলে না। তবু তাকেই কেন জানি বেশি ভাল লাগে। এর কারণ কি সে প্রায়ই ভাবে। পরশু রাতে অপলাকে জিজ্ঞেস করল। অনেক ইতস্তত করে বলল-খালামনি, বাবা বেশি ভাল , না মা?

: দুজনই ভাল।

মন রাখা কথা। টগর বিশ্বাস করে নি। দুজন লোক সমান সমান ভাল হতে পারে না। একজন একটু বেশি ভাল হলে অন্য জন একটু কম ভাল হবে। তাই

নিয়ম। অপলা হাই তুলে বলল,কে বেশি ভাল, কে কম ভাল এসব দিয়ে কি করবি?

: কিছু করব না।

: কিছু না করলে ঘুমো । নাকি বাবার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছে করে?

: না না। মনে হচ্ছে করে, আয় রেখে আসি।

অপলা সত্যি সত্যি তাকে রেখে আসতে গেল। টগর লক্ষ্য করেছে অপলা খালামনি যা বলে সঙ্গে সঙ্গে তা করে। অন্য কোন মেয়ে হলে, আয় রেখে আসি বলেও রেখে আসার কোন রকম লক্ষণ দেখাতো না। এবং এক সময় বড় বড় হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু অপলা খালামনি সে রকম নয়। সে যা বলবে তাই করবে। এজন্যেই তাকে এত ভাল লাগে। গত পরশু কালবৈশাখী ঝড় হল। ভীষণ ঝড়। হঠাৎ অপলা খালামনি বলল,চল টগর আম কুড়াতে যাই। কালবৈশাখীতে আম কুড়াতে হয়। টগরের ইচ্ছা করছিল, আবার ভয় ভয়ও করছিল। কি অন্ধকার চারদিক! আবার কেমন শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে। বাবা বললেন, মাথার উপর গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়বে। যেও না অপলা। খালামনি বলল, আমার উপর গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়লে কারো কোন ক্ষতি হবে না। বলেই সে নেমে গেল উঠোনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুলিও গেল।

তারা ছুটাছুটি করে আম এনে ঝুড়ি ভর্তি করছে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। বাবা বললেন, টগর তোমার যেতে ইচ্ছা করছে?

: হুঁ।

: আমার মনে হয় এ রকম ক্ষেত্রে যাওয়াই উচিত। ভয়কে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না। তা ছাড়া কালবৈশাখীর ঝড়ে বাচ্চাদের উপর কখনো ডাল ভেঙ্গে পড়ে না। নিয়ম নেই।

: কার নিয়ম?

: প্রকৃতির নিয়ম।

বাবা খুব হাসতে লাগলেন। বড়দের সব কথা সব সময় বোঝা যায় না। টগর অবশ্যি খুব বুঝতে চেষ্টা করে। বড়দের কথা শুনতে তার খুব ভাল লাগে।

রোজ রাতে তারা সবাই বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তবু সে জেগে থাকতে চেষ্টা করে। কত রকম কথা বলে বাবা আর খালামনি। বেশির ভাগ কথারই সে অর্থ বুঝতে পারে না। তবু শুনতে ভাল লাগে।

: অপলা টগরকে আমার বিছানায় শুইয়ে দেবার কোন দরকার নেই। তুমি একা একা ভয় পাবে; ও থাকুক তোমার সঙ্গে।

: আমার এত ভয়টয় নেই।

: বল কি! এ বাড়িতে কিন্তু ভূত আছে। সাদা চাদর গায়ে দিয়ে অশরীরী কে একজন বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। ফুলির মা তোমাকে সেই গল্প বলেনি?

: বলেছে।

: ভূত বিশ্বাস কর না?

: করব না কেন, করি?

: সে কি, আমার তো ধারণা ছিল ডাক্তাররা ভূত বিশ্বাস করে না।

: কোন কোন ডাক্তার আবার করেও। তা ছাড়া আমি তো এখনো ডাক্তার

হই নি।

: ডাক্তাররাই যদি ভূতে বিশ্বাস করে তাহলে আমরা সাধারণ মানুষেরা যাব কোথায়?

: আপনি বুঝি সাধারণ মানুষ?

: তোমার কি ধারণা আমি অসাধারণ?

: লেখকরা সাধারণ মানুষ নন।

: আমি লেখক তোমাকে কে বলল? এক সময় ছিলাম, এখন না। ঐ সব পূর্ব জন্মের কথা । এখন আর মনে করতে চাই না।

: আপনাকে আবার লেখালেখি শুরু করতে হবে।

: আর হবে না।

: হতেই হবে। আপনাকে দিয়ে নতুন একটি লেখা শুরু করিয়ে তার পর যাব। তার আগে যাব না।

: আর যদি শুরু করতে না পারি তা হলে কি থেকে যাবে?

: হ্যাঁ।

টগর লক্ষ্য করল হ্যাঁ বলার পর পরই খালামনি খুব গম্ভীর হয়ে পড়ল। তার পর হঠাৎ উঠে চলে গেল। বড়দের কথাবার্তার মত তাদের আচার আচরণ ও দুর্বোধ্য। খালামনি যে ভাবে উঠে চলে গেছে তাতে মনে হয় সে খুব রাগ করেছে। কেন সে শুধু শুধু রাগ করবে? বাবা কি রাগ করার মত কিছু বলেছে? কিছুই বলে নি।

রাতে ঘুমুবার সময় টগর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, খালামনি–তুমি বাবা উপর রাগ করেছ? অপলা অবাক হয়ে বলল, রাগ করব কেন? আমি কারো সঙ্গে রাগটাগ করতে পারি না।

: বাবাও কারো সঙ্গে রাগ করো না।

: উনি মহাপুরুষ কি না তাই।

: মহাপুরুষর কি খালামনি?

: জানি না কি; ঘুমো। নাকি বাবার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করছে?

: তোমার সঙ্গেই ঘুমুতে ইচ্ছা করছে।

টগর অপলার গলা জড়িয়ে ধরল। অপলা বিরক্ত স্বরে বলল, গরমের মধ্যে এরকম জাপটে ধরে আছিস কেন? একটু দূরে যা। টগর দূরে সরে গেল।

: রাগ করলি নাকি টগর?

: না।

: তুই তোর বাবার মত হবি বড় হলে। কারো জন্যে কোন টান থাকবে না। পাথরের মত মানুষ।

: বাবা পাথরের মত?

: হ্যাঁ শক্ত পাথর।

: আর মা কিসের মত?

: সেও পাথরের মত। তোমাদের সবাই পাথর।

অপলা খুব হাসতে লাগল। টগর অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, হাসতে হাসতে খালামনির চোখে পানি এসে গেছে। সে শাড়ির আঁচল চোখ মুছছে আর হাসছে। হাসির দমকায় খাট কাঁপছে। ও ঘর থেকে বাবা এসে বললেন, কি হচ্ছে এখানে? টগর বলল, খালামনি শুধু হাসছে।

: শুধু শুধু কেউ এ রকম হাসে?

অপলা গম্ভীর হয়ে বলল, আমি হাসি। কোন কারণ ছাড়াই আমি হাসি এবং কাঁদি। আপনি ঘুমুতে যান। ইচ্ছা করলে আপনি, আপনার পুত্রকে ও নিতে পারেন।

: বসি কিছুক্ষণ তোমার কাছে। হাসির গল্পটি বল। আমারো হাসতে ইচ্ছা করছে।

: আমার আর করছে না। ঘুম পাচ্ছে।

বাবা উঠে চলে গেলেন। টগর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। তার কেবলি মনে হতে লাগল খালামনি এখানে এসে বদলে গেছে। তার ধারণা বাবা ও সেটা জানেন। এবং তিনিও তার মতই জেগে জেগে খালামনির ব্যাপারটা ভাবেন। তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, কেন খালামনি এ রকম করছে? পরশু দিনের আগের দিন বিকেলে খালামনি বলল ,আজ নদীর পারে যাব। একটা নৌকা ভাড়া করে খুব ঘুরব। দুলাভাই তৈরী হয়ে নিন। ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাব। দৃশ্য দেখতে দেখতে চা খাব। বাবা বললেন,নদী তো অনেকখানি দূর। চার পাঁচ মাইল হবে।

: হলে হবে। আপনি তৈরী হন। খাতা–কলম সঙ্গে নিন। হঠাৎ কোন ভাব এসে গেলে লিখে ফেলবেন।

: ঝড় বৃষ্টি হতে পারে।

: হলে হবে।

খালামনি ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা করল। কি একটা খাবার তৈরী করল। তারপর হঠাৎ মত বদলাল। গম্ভীর হয়ে বলল, দুলাভাইকে নিয়ে কোন কাজ নেই। আমি আর তুই যাব।

: বাবা কাপড় আনছে তো।

: পরেছে পরুক। কাপড় পরে বসে থাকুক। চল আমরা রওনা দিয়ে দিই। সন্ধ্যার আগে ফিরতে হবে। হাতে সময় নেই।

টগর মৃদু স্বরে বলল, বাবাকে নিয়ে যাই? অপলা বিরক্ত হয়ে বলল,তুই তা হলে থাক তোর বাবার সঙ্গে। আমি চললাম। অপলা সত্যি সত্যি একা একা রওনা হয়ে গেল। বাবা পেছন থেকে ডাকল, এ্যাই অপলা, এ্যাই। খালামনি ফিরেও তাকাল না। ফ্লাস্ক দোলাতে দোলাতে হন হন করে ছুটতে লাগল। বাবা ফুলির আম্মাকে বলে দিলেন সঙ্গে যেতে। তার পর হাসি মুখে টগরকে বললেন, তোর খালার কি হয়েছে রে?

: জানি না কি হয়েছে।

: রাগ নাকি ?

: হুঁ।

: কার উপর রাগ?

: তোমার উপর ।

: আমার উপর রাগ, তো তোকে কেন নেয় নি?

www.BDeBooks.Com

: আমার উপরও রাগ।
: বলিস কি। পৃথিবীর সবার উপরই সে রাগ করেছে নাকি?
: হুঁ।

বাবা খুব হাসতে লাগলেন। এতে হাসির কি আছে? বড়রা অকারণে কেন হাসে? এবং কেন মাঝে মাঝে ছোটদের মত পৃথিবীর সবার সঙ্গে রাগ করে? এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। হয়তো বড় হলেই উত্তর জানা যাবে। কিংবা কে জানে হয়ত জানা যাবে না।

তিন দিনের জায়গায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল। অপলার ঢাকা ফিরে যাবার কোন লক্ষণ নেই। রানু দুটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। দুটিতেই লেখা, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। অপলার মধ্যে ফিরে যাবার কোন লক্ষণ নেই। ওসমান সাহেব বললেন, পড়াশোনা বন্ধ করে এখানে পড়ে আছ। যাওয়া উচিত না।

: হ্যাঁ উচিত?
: কবে যাবে? এখানকার স্কুলের একজন টিচার তোমাদের সঙ্গে যাবেন। তাঁকে বলে রেখেছি। কাল রওনা দিলে কেমন হয়।
: আপনি যাচ্ছেন না?
: আমি আরো কয়েকদিন থাকব।
: তা হলে আমিও থাকব। টগরকে কারো সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।
: ঠিক বলছ তুমি!
: ঠিকই বলছি।

এক রাতে ঘুম ভেঙ্গে টগর দেখল খালামনি কাঁদছে। সে ফিস ফিস করে বলল, কি হয়েছে তোমার? অপলা ধরা গলায় বলল, জানি না কি হয়েছে।

৩২

অনেক রাতে ওসমান সাহেব জেগে উঠলেন।

ঘুম ভাঙলেই সময় জানতে ইচ্ছে করে। এ বাড়িতে কোন ঘড়ি ছিল না। এখন ঘড়ি আছে। অপলার ছোট্ট লেডিস ঘড়ি । তাকে ডেকে কি জিজ্ঞেস করবেন কটা বাজে? নাকি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় আঁচ করবার চেষ্টা করবেন। শেষ রাত হলে–দক্ষিণ আকাশে দেখা যাবে বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলী যার উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির নাম জ্যেষ্ঠা। বৃশ্চিকের কাছেই থাকবে ধনু নক্ষত্রমালা। যার ঠিক উপরে মঙ্গল গ্রহ। এদের অবস্থান থেকে সময় বলে দেয়া খুব অসম্ভব নয়। ওসমান সাহেব বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। মিল্কিওয়ে দেখা যাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি উজ্জ্বল একটি তারা । এর নাম কি? শনি, কিন্তু এত কাছাকাছি কি শনির থাকার কথা? আকাশ সম্পর্কে এক সময় প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন গ্রহ–নক্ষত্র দেখা মাত্র চিনতে পারতেন। এখন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহের পাশের উজ্জ্বল বস্তুটি কি?

তিনি শোবার ঘরে ফিরে এলেন। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। টেবিলে পানির গ্লাস ও জগ। পর পর দু গ্লাস পানি খেলেন কিন্তু তৃষ্ণা কমল না। বুক শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। ঘুমুনোর চেষ্টা করা অর্থহীন । ঘুম আসবে না, তিনি একটি দুঃস্বপ্ন দেখে

জেগেছেন দুঃস্বপ্নের রেশ যতক্ষণ পুরোপুরি না কাটবে ততক্ষণ ঘুমুনো যাবে না। ওসমান সাহেব ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন একে দুঃস্বপ্ন ভাবাটা কি হচ্ছে? একজন প্রিয় এবং পরিচিত কাউকে স্বপ্ন দেখাটা দুঃস্বপ্ন হতে পারে না।

স্বপ্নে দেখেছেন মিলিকে। স্বপ্নের চেহারাগুলি কখনো খুব স্পষ্ট হয় না। মিলিকে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ফুলি মেয়েটির মত। হাত পা নাড়ার ভঙ্গি অনেকটা অপলার মত। মিলি যেন খুব ক্লান্ত। এসেছে অনেক দূরের কোন জায়গা থেকে। অল্পক্ষণ থেকেই তাকে চলে যেতে হবে। সে বলল, ভাইয়া তুমি আমাকে চিনতে পারছ, আমি মিলি।

: হ্যাঁ চিনতে পারছি।
: আমি মরে গেছি, তুমি জান তো? বিষ খেয়েছিলাম
: না বিষ–টিস খাস নি। চিকিৎসা হচ্ছে তোর।
: উঁহু তুমি জান না একগাদা ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেললাম।
: তাই না কি?
: হ্যাঁ।
: এখন কেমন আছিস?
: বেশী ভাল না। সারাদিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটাছুটি করতে হয়। বেশীক্ষণ এক জায়গায় থাকা যায় না
: তাই নাকি? জানতাম নাতো। সুখে আছিস , না কষ্টে আছিস?
: সুখেও না কষ্টেও না। এখানে সব অন্য রকম। তোমাকে বোঝাতে পারব না। আত্মাটা আমাদের সঙ্গে থাকে না।
: বলিস কি? কোথায় থাকে?
: তাও জানি না। সারাক্ষণ এমন ছুটাছুটি কি জন্যে? আত্মা খুঁজে বেড়াই।
: আশ্চর্য তো!
: তোমার এখানে খাবার কিছু আছে? খুব খিদে পেয়েছে।

তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে খাবার–দাবার খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মনে হল এটা স্বপ্ন। মিলি করুণ মুখে তাঁর সামনে বসে আছে এটা একটা স্বপ্ন দৃশ্য। কাজেই ব্যস্ত হয়ে খাবার খোঁজা অর্থহীন। অথচ মিলি এমন করুণ ভঙ্গিতে বসে আছে যে খাবার না খুঁজে ও পারা যায় না। তিনি খানিকটা গম ছাড়া কিছুই পেলেন না। তাঁর কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। এই গম দিয়ে তিনি কি করবেন? মিলি কিন্তু তার রোগা হাত বাড়িয়ে মুঠো মুঠো গম নিয়ে মুখে পুরছে। কচ কচ করে চিবাচ্ছে। ওসমান সাহেব জেগে উঠলেন। এ জাতীয় একটি স্বপ্ন দেখার কোন মানে হয় না। কিন্তু অর্থহীন কিছুই তো ঘটে না পৃথিবীতে । এ রকম একটি স্বপ্ন দেখার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ওসমান সাহেব সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মঙ্গল গ্রহ আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আকাশ অসম্ভব পরিষ্কার । মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি এত পরিষ্কারভাবে এর আগে তিনি দেখেন নি। এই ছায়াপথ ধরেই মৃতমানুষেরা পৃথিবীতে নেমে আসে। কোথায় যেন পড়েছিলেন। বিভূতিভূষণের 'দেবযান' –এ না অন্য কোথাও?

তিনি সিগারেট টানতে টানতে স্বপ্নটার কথা ভাবতে লাগলেন। এর একটি

লৌকিক সংখ্যা বের করা উচিত । নয়তো স্বপ্নের রেশ কাটবে না। তাঁকে বাকি রাতটা কেটে জাগাতে হবে। কারণ স্বপ্ন দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ হয়েছে। জেগে উঠে দেখেছেন বালিশ ঘামে ভিজে গেছে। অথচ ভয়ের কিছুই ছিল না স্বপ্নে। অস্বাভাবিকতা যা আছে, তা সব স্বপ্নেই থাকে । তিনি শোবার ঘর থেকে ইজিচেয়ার টেনে আনলেন বারান্দায়। শীতল হাওয়া দিচ্ছে। বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। এরা রোজ ইজি চেয়ারটা বারান্দা থেকে টেনে শোবার ঘরে নিয়ে যায় কেন? ইজি চেয়ারটা ফিট করতে কষ্ট হচ্ছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। খট খট শব্দ হচ্ছে। টগর বা অপলা জেগে উঠতে পারে। তিনি কাউকে জাগাতে চান না। এক সময় দুঃস্বপ্ন দেখলেই রানুকে ডেকে তুলতেন। রানু খুব বিরক্ত হত। মুখ ঝাঁকিয়ে বলত, তুমি একজন বয়স্ক মানুষ না? ভয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছ কেন? চোখে মুখে পানি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়।

: স্বপ্নটা কেন দেখলাম সেটা তোমাকে বলি।

: বলার দরকার কি?

: তুমি না শুনলে বাকী রাতটা আমার ঘুম হবে না।

: এ রকম অদ্ভুত স্বভাব কেন তোমার?

রানু ঘুম চোখে বসে থাকত। ঘন ঘন হাই তুলতো। এবং তিনি অনেক সময় নিয়ে স্বপ্ন দেখার কারণ ব্যাখ্যা করতে শুরু করতেন। এক সময় ব্যাখ্যা শেষ হত। তিনি হৃষ্ট গলায় বলতেন, যুক্তিগুলি তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

: আমার পছন্দ অপছন্দ দিয়ে তো কিছু না। তোমার পছন্দ হলেই হল। তোমার কথা শেষ হয়েছে?

: হুঁ।

: তা হলে ঘুমুতে আস। নাকি তোমার জন্যে বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে?

: না বাতি জ্বালিয়ে রাখবার দরকার নেই।

তিনি রানুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে যেতেন। রানু যদি বলত, গরমের সময় এত ঘেঁষাঘেঁষি করে শুতে ভাল লাগছে না। তিনি মৃদুস্বরে বলতেন, ভয়টা পুরোপুরি কাটে নি রানু।

ওসমান সাহেব ইজিচেয়ারে বসে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপলা শোবার ঘর থেকে চেঁচাল—কে কে? অপলা নিশ্চয়ই তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায় নি—ঘুমের ঘোরেই চেঁচিয়েছে। কোন সাড়া-শব্দ না পেলে চুপ করে যাবে। কিন্তু অপলা আবার বলল, কে কে?

: আমি। ঘুমাও অপলা।

: আপনি বারান্দায় কি করছেন?

অপলা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বিড়বিড় করে বলল, যা ভয় পেয়েছি। অনেকক্ষণ ধরে আমি জেগে আছি। শুনলাম ঘরে কি সব যেন টানাটানি করা হচ্ছে। তার পর দরজা খোলা হচ্ছে। আমি ভাবলাম চোর।

ওসমান সাহেব বললেন, ক'টা বাজে অপলা? অপলা অনেকক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। সময় বলতে পারল না। অন্ধকারে ডায়াল দেখা যাচ্ছে না।

বাতি না জ্বালিয়ে বলা যাবে না। আপনার কাছে দিয়াশলাই আছে?

তিনি দিয়াশলাই জ্বালালেন, তিনটা দশ। অথচ মনে হচ্ছে ভোর। অপলা

বলল, আপনি এত রাতে বারান্দায় বসে আছেন কেন?

: একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তার পর আর ঘুম আসছে না।

: কি দুঃস্বপ্ন?

তিনি আগ্রহ করে স্বপ্নের কথা বললেন। অপলা মৃদু স্বরে বলল, খুব অদ্ভুত স্বপ্নটা। তিনি বললেন,

: না, অদ্ভুত না। এরকম স্বপ্ন কেন দেখেছি তা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। অনেক দিন আগে একটা বই পড়েছিলাম—দি ভেইল, সেখানে কিছু মানুষের কথা লেখা হয়েছে—যাদের আত্মা ঈশ্বর জমা রেখেছেন। তারা ব্যাকুল হয়ে স্বর্গ মর্ত্যে তাদের আত্মা খুঁজছে। গল্পটা খুব দাগ কেটেছিল। এই গল্পটিই স্বপ্নে একটু অন্যভাবে এসেছে।

: মিলি আপা বসে বসে গম খাচ্ছেন এটা দেখলেন কেন?

: ও খুব দুঃখী মেয়ে। অভাবী মেয়ে। ওর দুঃখটা স্বপ্নে এই ভঙ্গিতে এসেছে। ওর প্রতি আমার খুব মমতা।

: উনি কেমন আছেন?

: জানি না।

: জানবার চেষ্টাও বোধ হয় করেন নি।

তিনি জবাব দিলেন না। অপলা হাই তুলে বলল, শীত শীত লাগছে। আপনার লাগছে না?

: লাগছে। কাজেই কোথাও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। শীত লাগছে সেই কারণে।

: আপনি পৃথিবীর সব স্বপ্নের জবাব জানেন না কি?

: না, জানি না। তবে জবাব পেতে চেষ্টা করি। অনেকেই সেটা করে না। চৈত্র মাসের রাতে হঠাৎ বাতাস এত ঠাণ্ডা হবে কেন, এই নিয়ে আমি ভাবছিলাম।

ওসমান সাহেব হাসলেন। অপলা হাসল না। কেন জানি সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ল।

: ঘুমুতে যাও অপলা।

: আপনি ঘুমুবেন না?

: না, আমি আরো খানিকক্ষণ বসে থাকব।

: বসে বসে জটিল সব প্রশ্নের উত্তর ভাববেন?

: তা বলতে পার।

তিনি সিগারেট ধরালেন। অপলা মৃদুস্বরে বলল, আপনাকে একটা সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, দেখি আপনি জবাব দিতে পারেন কি না।

: কি প্রশ্ন?

: আমি এখানে এসেছিলাম দু'দিন থাকব ভেবে। কিন্তু আজ নিয়ে আট দিন হল এখানে আছি। ভেবে-টেবে বলুন তো কেন আছি? দয়া করে সত্যি কথাটা বলবেন।

: আমি জানি না অপলা।

: আপনি জানেন। খুব ভালই জানেন।

: ঘুমুতে যাও অপলা।

: না, আমি ঘুমুতে যাব না, আপনাকে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

www.BDeBooks.Com

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, অপলা কাঁদতে শুরু করেছে। নিঃস্বার্থ কান্না নয়। শব্দ করে শিশুদের মত কান্না।

: এসো অপলা ঘরে যাই।

অপলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি কাল ভোরে চলে যাব। যাবার আগে জানতে চাই যে আপনি জানেন, কেন আমি এখানে এতদিন থাকলাম।

: আমি জানি। জানব না কেন? আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান।

: বুদ্ধিমান কিন্তু হৃদয় বলে আপনার কিছু নেই। আপা ঠিকই বলেন।

: ঘুমুতে যাও অপলা।

: আমি যাব না। আপনি যান। আরাম করে ঘুমুন। আমি বসে থাকব এখানে।

: এ বাড়িতে কিন্তু ভূত আছে।

: কেন বাজে কথা বলছেন। কেন আপনি আমাকে একটা ছোট্ট খুকী মনে করেন?

: ছোট্ট খুকী মনে করি না।

টগর জেগে উঠেছে। সে ভয় পাওয়া গলায় ডাকল, খালামনি, খালামনি। অপলা ভেতরে চলে গেল। ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন অপলা বেশ সহজ ভঙ্গিতেই টগরকে বাথরুম করাতে নিয়ে গেল। ছোটখাট কথাবার্তা ও বলতে লাগল। যেন একটু আগে কিছুই হয় নি।

তিনি নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর কেন জানি মনে হতে লাগল টগরকে ঘুম পারিয়ে অপলা আবার আসবে এ ঘরে। তিনি তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু অপলা এলো না।

৩৩

ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ভোর ন'টায়। আটটা থেকেই মতিয়ুর বলছে, কোনরকম পাগলামি করবে না। যা জিজ্ঞেস করবে জবাব দেবে। ঠ্রীলি কথা বলবে। বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলবে না। সবচেয়ে বড় কথা পাগলামি করবে না।

মিলি করুণ স্বরে বলল, আমি পাগল মানুষ কিছু পাগলামি তো করবই। সেটা উনি চিকিৎসা করে ভাল করবেন। সেই জন্যেই এত দূর আসা।

মতিয়ুর গম্ভীর হয়ে গেল। মিলি বলল, জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে, কেমন বিদেশ বিদেশ ভাব।

: এটা বিদেশ, বিদেশ বিদেশ ভাব থাকবে না? তোমার কি ধারণা এটা ঢাকা?

: সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এটা ঢাকা। আমি লবীতে গিয়ে ভাইয়ার নাম্বারে একটা টেলিফোন করে ফেললাম। রিং হচ্ছে কেউ ধরছে না। তখন রিসিপশনের মেয়েটা হিন্দীতে বলল, আপনি কোন নাম্বার চান?

মতিয়ুর বিরক্ত হয়ে বলল, কেন মিথ্যা কথা বলছ? তুমিই ঘরেই ছিলে, কোথাও যাও নি। মিলি হেসে ফেলল।

: হাসছ কেন?

: মিথ্যা কথাটা কেমন করে ধরা পড়ে গেল তাই হাসছি। মজা লাগছে খুব।

মিলি সাজগোজ করতে লাগল। ফুলদানীতে হোটেল থেকে ফুল দিয়ে গেছে, সেই ফুল সে খোঁপায় গুঁজতে গুঁজতে বলল, সুন্দর হয়ে যাওয়া দরকার। নয়ত ডাক্তার ভাববেন বাংলাদেশের মেয়েগুলি দেখতে পচা। তাই না?

মতিয়ুর জবাব দিল না। রাগী চোখে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তার দেবশর্মা বিশাল ব্যক্তি। বিশাল ব্যক্তিদের সাধারণত কোমল একটি মুখ থাকে। ইনার তাও নেই। প্রকাণ্ড একটা গোঁফের আড়ালে সব কোমলতা ঢাকা পড়েছে। চশমার কাঁচ এত মোটা যে চোখ দেখা যায় না। মিলি সহজভাবে বলল, কেমন আছেন ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার দেবশর্মা কোমল গলায় বললেন, ভাল আছি।

: ও আমাকে বলেছিল আপনি বাঙালি কিন্তু আপনাকে দেখে আমার বিশ্বাস হয় নি। এখন কথা শুনে বিশ্বাস হচ্ছে।

: চট করে কোন কিছু বিশ্বাস করা ঠিক না। অনেক বিদেশীরা চমৎকার বাংলা বলেন। তাছাড়া আমি নিজেও কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি না। আমার মা ইউ পি-র মেয়ে।

মিলি হাসতে হাসতে বলল, আমি যা শুনি সব বিশ্বাস করে ফেলি। পাগল মানুষ তো।

: পাগল নাকি আপনি?

: হ্যাঁ। আমি এই জন্যই তো আপনার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছি। আপনি আমাকে ভাল করে দিন

: আপনি কবে থেকে পাগল হয়েছেন?

: খুব ছোটবেলা থেকে।

: সময়টা বলুন। খুব ছোট, মানে কত ছোট?

: ক্লাস সিক্স থেকে।

: বুঝলেন কি করে?

: তা বলতে পারব না। আমরা দু'ভাই বোনই ছিলাম পাগল। আমার বড় ভাইকে আপনি চিনবেন না। খুব নাম করা লেখক। আপনারা তো আর আমাদের লেখকদের বই পড়েন না, কাজেই তাঁর নাম জানবেন না। আমাদের দেশে সবাই তাঁকে চেনে।

: তাই নাকি?

: জ্বি আমাকে নিয়েও একটা বই লিখেছে নাম হল 'চৈত্রের দুপুর'। এটা পড়ে কাঁদতে কাঁদতে আপনার চোখে ঘা হয়ে যাবে।

ডাক্তার দেবশর্মা হেসে ফেললেন। মিলি আহত স্বরে বলল, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না তাই না?

: হ্যাঁ করছি।

: তা হলে হাসছেন কেন?

: বিশ্বাস অবিশ্বাসের সঙ্গে হাসির কোন সম্পর্ক নেই। আপনি এত সুন্দর করে কথা বলছেন যে শুনেই আমার হাসি আসছে। ভাল কথা 'চৈত্রের দুপুর' বইটি আমি পড়তে চাই। আপনার সম্পর্কে জানবার জন্যে। চোখে ঘা করবার

জন্যে নয়। চা দিতে বলি?

: বলুন।

ডাক্তার চা দিতে বললেন। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। মিলির ভদ্রলোককে বেশ লাগল।

: মিলি!

: বলুন।

: আপনার কি কি সমস্যা বলুন তো?

: আমার তো কোন সমস্যা নেই। আমার ভাইয়ের অনেক রকম সমস্যা।

: বলুন তার সমস্যার কথাই বলুন।

: ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমার ভাই এবং ভাবী আলাদা আলাদা থাকে।

: ছাড়াছাড়ি কেন হল?

: ভাইয়ের একটা দোষ হচ্ছে সে সব সময় সত্যি কথা বলবে। এই জন্যেই ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

: সত্যি কথা বলার এত সমস্যা তাতো জানতাম না।

: সমস্যা তো হবেই। রানু ভাবী একদিন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তোমার অনেক উপন্যাসে মনিকার নাম আছে। মনিকার প্রতি তোমার কোন দুর্বলতা আছে? ভাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, আছে। অনেকদিন আছে। একজন মানুষের অনেকের প্রতিই দুর্বলতা থাকতে পারে তাতে কিছু যায় আসে না।

: মনিকা কে?

: মনিকা হচ্ছে একটি খুব বাজে ধরনের মেয়ে।

: খুব সুন্দর বুঝি?

: জানি না, আমার সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি।

: তা হলে কি করে বললেন, বাজে ধরনের মেয়ে?

মিলি হাসতে হাসতে বলল, আপনি ঠিক ভাইয়ার মত তর্ক করেন।

: আপনার ভাই খুব তর্ক করতে পারে বুঝি?

: খুব পারে। কেউ তাকে তর্কে হারাতে পারবে না।

: ভাইকে খুব পছন্দ করেন?

: হ্যাঁ।

: খুব পছন্দ?

: হ্যাঁ খুব।

: সবচেয়ে অপছন্দ করেন কাকে।

: কাউকে না।

: আপনার স্বামীর কোন ব্যাপারটা আপনার সবচেয়ে খারাপ লাগে? মিলি চুপ করে রইল। দেবশর্মা হাসতে হাসতে বললেন, প্রতিটি মানুষেরই কিছু কিছু খারাপ দিক আছে। আপনার স্বামীর ও নিশ্চয়ই আছে। আছে না?

: হ্যাঁ আছে।

: সেই সম্পর্কে বলুন।

: সেই সম্পর্কে আমি বলতে পারব না। আমি কাউকে বলি না। আপনাকেও বলব না। আপনি ডাক্তার হন যাই হন।

ডাক্তার দেবশর্মা হাসিখুশি মেয়েটির গম্ভীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মেয়েটির সমস্যাটি ঠিক ধরতে পারছেন না।

হোটেলে ফিরে মিলি অনেকক্ষণ ঘুমুল। ঘুম ভাঙল বিকেলে। মতিয়ুর বেরুচ্ছে। মিলি বলল, আমি একা একা থাকব?

: হুঁ বিশ্রাম কর।

: বিশ্রাম লাগবে না, আমি ও যাব তোমার সাথে।

: তোমার যেতে হবে না। তুমি থাক।

: একা একা আমার ভয় লাগবে না?

: ভয়ের কি আছে। চারদিক লোকজন।

মিলি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। হোটেলের লবীতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ লোক চলাচল দেখল। তারপর রুমে ফিরে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল রানুকে। চিঠি শেষ হবার পর বালিশে মাথা রেখে অনেক্ষণ কাঁদল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। সে নেমে গেল নিচে। লবী ফাঁকা ফাঁকা। রিসিপসনে এখন একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলায় একটি মেয়ে থাকে। গুজরাটি মেয়ে। তার সঙ্গে বেশ খাতির হয়েছে মিলির। মেয়েটি মাথা নেড়ে নেড়ে সুন্দর গল্প করে। ইংরেজী কথাবার্তা। মিলি তার বেশীর ভাগই বঝতে পারে না তবু খুব মাথা নাড়ে, যেন সব বুঝতে পারছে। ঐ মেয়েটি থাকলে বেশ হত। গল্প করা যেত। মিলি আবার উপরে উঠে এল। ঘর অন্ধকার। ঢুকতে ভয় লাগছে। সুইচ টিপলেই বাতি জ্বলবে। কিন্তু বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা করছে না। মিলি খাটে বসে রইল চুপচাপ। ঘর অন্ধকার থাকলেই তার বাচ্চাটির কথা মনে পড়ে। এখন যেমন মনে হচ্ছে।

যেন সে খাটে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। দু'বার সে ডাকল—মা মা বলে। তারপর উঠে বসল। একা একা খাট থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেল নিচে। চিৎকার করে সে কাঁদছে কিন্তু কেউ শুনতে পারছে না। কারণ সবাই এখন একতলার ঘরে বসে ভিসি আর দেখছে। ভিসিআরে খুব একটা ধুমধাড়াক্কা ছবি হচ্ছে। সবাই ছবি দেখছে। কেউ তার কান্না শুনতে পাচ্ছে না।

মিলি ছটফট করতে লাগল। মাঝে মাঝে তার এমন কষ্ট হয়। ইচ্ছা করে কৌটা খুলে ঘুমের ওষুধগুলি বের করতে। না, সে খাবে না। শুধু দেখবে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকতেও কেন জানি ভাল লাগে। মিলি স্যুটকেস খুলল। দরজার কাছে শব্দ হল। মতিয়ুর ফিরে এসেছে নাকি? মিলি উৎকর্ণ হয়ে রইল। না, মতিয়ুর না। মিলি বোতল বের করল। সব মিলিয়ে ছাপ্পান্নটি ট্যাবলেট আছে। একটি বেশীও না কমও না। গুনে রাখা ট্যাবলেট। এখন সে আবার গুনবে। গুনতে গুনতে সে কাঁদবে। নিজের কথা ভেবে কাঁদবে। তাঁর মেয়েটির কথা ভেবে কাঁদবে, রানু ভাবী এবং ভাইয়ার কথা ভেবে কাঁদবে। তারপর আবার বোতলটি লুকিয়ে রাখবে স্যুটকেসে।

মতিয়ুরের ফিরতে অনেক দেরী হল। সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। অচেনা শহরে একা একা অনেকক্ষণ ঘুরতে হয়েছে।। সে এসে দেখল মিলি দরজা খোলা রেখে ঘুমুচ্ছে? কি সব কান্ড মিলির। অচেনা অজানা একটা হোটেলে দরজা

www.BDeBooks.Com

খোলা রেখে কেউ ঘুমায়? অন্য কিছু হোক না হোক জিনিসপত্র তো নিয়ে যেতে পারত। একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে নেমে গেলে কে ধরতে পারত?

রাত এগারোটায় মতিয়ুর প্রথম বুঝতে পারল মিলি এক গাদা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। মতিয়ুরের কিছু করার ছিল না। কারোরই কিছু করার ছিল না। তবু হোটেলের লোকজন প্রচুর ছুটাছুটি করল। হাসপাতালের ডাক্তাররা রাত তিনটা পর্যন্ত চেষ্টা করলেন। কিছুই কাজে লাগল না। রাত তিনটায় মিলি খোলা চোখে চারদিক তাকাল। হাত বাড়িয়ে কাউকে খুঁজতে চেষ্টা করল। বিড় বিড় করে কি যেন বলল। কাকে সে খুঁজল, কি সে বলল তা কেউ জানল না। কোন দিন জানাবেও না।

৩৪

প্রিয় রানু ভাবী,

এর আগে তোমাকে দু'টি চিঠি দিয়েছি। শুধু তোমাকে না যাদের যাদের চিনতাম সবাইকেই দিয়েছি। একটা কোলকাতা থেকে, একটা এখান থেকে। কেউ জবাব দেয় নি। কি করে দেবে, আমি তো কোন ঠিকানা দেই নি।

এখন বাজছে সাড়ে পাঁচটা। চারদিক অন্ধকার। আমি ঘরে এখনো বাতি জ্বালাইনি। অন্ধকারে লিখছি। অন্ধকারে চিঠি লিখতে বেশ লাগে তাই না ভাবী?

আজ সকালে ডাক্তার দেবশর্মার কাছে গিয়েছিলাম। বিশাল পর্বতের মত এক ভদ্রলোক। রাগী রাগী চেহারা। ভদ্রলোককে দেখে প্রথমে যা ভয় পেয়েছিলাম। পরে দেখি ভয়ের কিছু নেই। বেশ হাসিখুশী মানুষ। চা খাওয়ালেন। মজার ব্যাপার কি জান ভাবী? চায়ের সঙ্গে বিস্কিট ছিল, ভদ্রলোক চায়ে বিস্কিট ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছিলেন। এত বড় একজন ডাক্তার এরকমভাবে বিস্কিট খায়? আমার যা হাসি লাগছিল। একটা বিস্কিট ভেঙে চায়ের কাপে পড়ে গেল। তিনি আবার একটা চামুচ দিয়ে সেই বিস্কিট তুলতে গিয়ে নিজের সার্টে ফেলে দিলেন। একটু হলেই আমি হেসে ফেলতাম। ভাগ্যিস হাসি চেপে রাখতে পেরেছি। না পারলে কি একটা লজ্জার কান্ড হত বল দেখি।

ভাবী , আমি এখন আমার রুমে একা। ও বেড়াতে গেছে। আমাকে সঙ্গে নেয় নি। পাগল মানুষকে নিয়ে কোন ঝামেলা হয় সেই ভয়ে। আমারো যেতে ইচ্ছে করছিল না। শহরটা যা নোংরা। তবে হোটেলটা খুব সুন্দর। সিনেমার যে রকম হোটেল থাকে সে রকম। রিসিপশনে একটা মেয়ে থাকে, ওর নামটা এখন মনে পড়ছে না। এই মেয়েটা ভাল। আমার মত বক বক করে, তবে মেয়েটার একটা খুব বাজে স্বভাব আছে। সেটা চিঠিতে লেখা যাবে না। যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে তখন বলব। আমার বলতে মনে না থাকলে তুমি মনে করিয়ে দিও।

পরশু রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। সাদা উইলি শিফনটা পরে তুমি যেন কোথায় যাচ্ছ। বিয়ের পর পর তুমি যেমন সুন্দর ছিলে তোমাকে ঠিক সে রকম সুন্দর লাগছিল। অবশ্যি স্বপ্নে সব মেয়েকেই সুন্দর লাগে। আর পুরুষদের লাগে বিচ্ছিরি। আমি স্বপ্নে যে ক'টা পুরুষকে দেখেছি তাদের সবাই খুব বিচ্ছিরি। অনেক আজে বাজে কথা লিখে ফেলেছি। তাই না ভাবী? অবশ্যি ভাইয়ার ধারণা

আমি খুব সুন্দর চিঠি লিখি। যা মনে আসে তাই লিখে ফেলি বলেই নাকি আমার চিঠিগুলি সুন্দর হয়। ভাইয়া কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। ওমা, তোমার কাছে ভাইয়ার কথা কেন বলছি? আমার চেয়ে তুমি তো তাকে অনেক ভাল জান।

আচ্ছা ভাবী, তোমার কি মনে আছে বিয়ের পর তুমি যখন প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে তখন আমি কেমন রেগে গেলাম তোমার উপর, কথায় কথায় ঝগড়া করতাম। তবু অবাক হয়ে শুনলাম তুমি একদিন ভাইয়াকে বলছ, মিলি বেচারীর অনেক সমস্যা। বাবা তাকে দেখলেই কেন জানি রেগে যান,এমন সব কথাবার্তা বলেন যে সহ্য করা মুশকিল। আমার এত ভাল লাগল তোমার কথা শুনে। তার পর তোমার সঙ্গে ভাব হল। মনে আছে প্রায়ই তোমাকে বলতাম, ভাবী আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুব। তুমি বালিশ নিয়ে আমার ঘরে ঘুমুতে আসতে।

বেশ কিছুদিন থেকে আমার আবার তোমার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভাইয়ার সঙ্গে তোমার যখন মিটমাট হয়ে যাবে তখন আমি তোমাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকব। তোমাকে ঠিক ছোটবেলার মত বলব, ভাবী ভয় লাগছে আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুব। তখন তুমি যদি বল, উঁহুঁ আমি পাগল সঙ্গে নিয়ে ঘুমুব না তা হলে কিন্তু ভাবী আমি খুব রাগ করব। পাগলরা রাগ করলে কি অবস্থা হয় তুমি তো জান না। খুব খারাপ অবস্থা হয়।

চিঠি এই পর্যন্তই । রানু চিঠি শেষ করে শীতল চোখে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল মতিয়ুরের দিকে। মতিয়ুর শুকনো মুখে একটা সোফায় বসে আছে। অসম্ভব রোগা লাগছে তাকে। যেন খুব বড় একটা অসুখ করেছে। রানু বলল, মিলির ভাইকে খবর দিয়েছেন?

: ঢাকায় পৌঁছে খবর দিয়েছি। টেলিগ্রাম করেছি।

মিলি তাকিয়ে রইল মতিয়ুরের দিকে। মতিয়ুর বলল, ভাবী আমি যাই? রানু কিছু বলল না। মাথা নিচু করে বসে থাকা এই লোকটিকে সে এই মুহূর্তে আর সহ্যই করতে পারছে না।

: ভাবী, আমি তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করি নি।

: ত্রুটি করেছ এমন কথা কেউ বলছে না।

: কারোর বলার দরকার নেই ভাবী। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে কোথাও মস্ত বড় একটা গন্ডগোল করেছি।

রানুকে অবাক করে দিয়ে মতিয়ুর রহমান হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। শোকের এমন তীব্র প্রকাশ বহুদিন দেখা হয় নি। এই লোকটিকে সান্ত্বনাসূচক কিছু কথাবার্তা বলা উচিত কিন্তু বলতে ইচ্ছা করছে না। কাজের মেয়েটি ছুটে এসেছে। অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছে।

রানু বলল, বাসায় যাও মতিয়ুর।মতিউর ভাঙা গলায় বলল, বাসায় গিয়ে আমি কি করব? বাসায় আমার কে আছে?

কি অদ্ভুত কথা–বাসায় কে আছে? রানু বিরসমুখে তাকিয়ে আছে। কান্নাকাটি, চিৎকার কিছুই তার মনে দাগ কাটছে না। সবটাই মনে হচ্ছে বানানো. মেকি। লোকটির টাকা–পয়সা হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই সে পুতুল

পুতুল ধরনের একটি মেয়ে বিয়ে করবে। গয়নায় তার শরীর ঢেকে দেবে। সেই মেয়েটি পর পর কয়েকটি বাচ্চা দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যাবে, গালের হাড় বড় হয়ে যাবে, দাঁতগুলি হয়ে যাবে উঁচু। পৃথিবীর প্রতি অপরিসীম বিরক্তি নিয়ে এই মেয়েটি দুপুর বেলা নিউ মার্কেটে শাড়ির প্যাকেট নিয়ে হাটঁবে।

কে মনে রাখবে মিলির কথা? কেউ না? তার মেয়েটিও না। সবাই চেষ্টা করবে মিলিকে দ্রুত ভুলে যেতে। ভুলে যাওয়াই ভাল। পাগল মাকে মনে রাখার কোন দরকার নেই। কেউ কাউকে মনে রাখে না।

৩৫

ঘরে একটু আগে হারিকেন দিয়ে গেছে। বাইরে এখনো আলো আছে। কিন্তু ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। ওসমান সাহেব বসে আছেন চেয়ারে। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছেন। যেন বাইরের পৃথিবীর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্ধকারের দিকে। আজ তাঁর জীবনের একটি বিশেষ দিন। রানু এসেছে। দুপুর বেলা হঠাৎ দেখলেন একটা ছোট্ট ব্যাগ হাতে নিয়ে সে খানিকটা সঙ্কোচিত ভঙ্গিতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃদু স্বরে ডাকছে, অপলা অপলা। অথচ তার ডাকা উচিত ছিল টগরকে। সে টগরকে ডাকল না কেন? এর মানে কি এই যে সে টগরের জন্যে আসে নি। যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে আজ তাঁর জন্যে একটি বিশেষ দিন। কিন্তু তাঁর আনন্দ হচ্ছে না কেন? বরং কেমন যেন একটা কষ্ট হচ্ছে।

তিনি রানুর জন্যে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন নিজের ঘরে। সে এল না। তিনি নিজেও গেলেন না তার কাছে যেতে। ইচ্ছে করল না।

এখন সন্ধ্যা। বারান্দায় টগরের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। সে তার অনন্দ কিছুতেই সামলাতে পারছে না। রানু কথা বলছে অপলার সঙ্গে। রানুর গলা তিনি শুনতে পাচ্ছেন না কিন্তু অপলার কথা শুনা যাচ্ছে।

: তুমি খুব চিন্তা করেছ আমাদের জন্য তাই না আপা? পরশু দিন আমরা চলে যেতাম । সব ঠিকঠাক তার পর হঠাৎ টগরের গা গরম হল। পুকুরে খুব ঝাপাঝাপি করেছে তো সেই থেকে ঠান্ডা লেগে জ্বর।

রানু কিছু বলল, তার উত্তরে। তার পর পরই তিনি অপলার হাসির শব্দ শুনলেন। সেই হাসিও চট করে থেমে গেল।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলে কাগজ-কলম সাজানো। একটি পেনসিল পর্যন্ত আছে। হারিকেন জ্বলছে। আধো আলো আধো ছায়া পরিবেশ। দীর্ঘ দিন পর টেবিলটি তাঁকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করল। কেন জানি মনে হচ্ছে অরণ্যের গল্পটি তিনি এখন লিখতে পারবেন। অরণ্য এগিয়ে আসছে। গ্রাস করছে শহরকে। আতঙ্কগ্রস্ত শহরের মানুষ নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। কাগজ কলম নিয়ে বসার আগে রানুর সঙ্গে দেখা করা উচিত। কিন্তু কেন যেন ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছা করছে না।

দীর্ঘ দিন পর আবার তিনি লিখতে বসলেন। আগের মত কলম আটকে গেল না। কিন্তু যে গল্প লেখা হচ্ছে তা অরণ্যের গল্প নয়। শহরের গল্প। শহর গ্রাস করছে অরণ্যকে। তিনি দ্রুত গতিতে লিখছেন–

"সন্ধ্যার পর থেকে নীলুর কেমন যেন লাগতে লাগল। এক ধরনের অস্বস্তি, হঠাৎ ঘুম ভাঙলে যে রকম লাগে সে রকম । সমস্ত শরীর ঝিম ধরে আছে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির বারান্দাটা সুন্দর। কল্যাণপুরের দিকে শহর তেমন বাড়তে শুরু করে নি। গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। বারান্দায় দাঁড়ালে ঝিলের মত খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে। গত শীতের আগের শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস নেমেছিল। কি অদ্ভুত দৃশ্য! এ বৎসর নামবে কি না কে জানে । বোধ হয় না। শহর এগিয়ে আসছে। পাখিরা শহর পছন্দ করে না।"

অনেক রাতে রানু এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন রানুকে চিনতে পারছেন না। এ যেন অচেনা কেউ। রানু বলল, কেমন আছ?

: ভাল। তুমি ভাল আছ রানু?

: হ্যাঁ। কি করছ! লিখছ?

তিনি মাথা নাড়লেন। রানু বলল, লেখা এগুচ্ছে?

: হ্যাঁ।

: অনেক দিন পর লিখতে বসলে তাই না?

: হ্যাঁ, অনেক দিন পর। ভেতরে এসে বস রানু।

সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত: করে ভেতরে এসে দাঁড়াল। বসল খাটে । কেমন কোমল দেখাচ্ছে রানুর মুখ। কেমনা দুঃখী দুঃখী চেহারা। তাকে আজ এমন দেখাচ্ছে কেন?

: মিলির একটি চিঠি আমার কাছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তুমি পড়বে?

: হ্যাঁ পড়ব।

রানু চিঠিটা এগিয়ে দিল। চিঠি পড়তে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে এসেছে। তিনি কিছু পড়তে পারলেন না। রানু মৃদু স্বরে বলল, মিলির খবরটা পেয়ে তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তোমাদের দুই ভাই বোনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে। খুব বড় রকমের মিল। অনেক ভেবেছি বের করতে পারি নি। তুমি চিঠিটা আমার কাছে দাও আমি পড়ে শুনাচ্ছি। তুমি পড়তে পারছ না।

রানু চিঠি পড়তে শুরু করল। তিনি তাকিয়ে আছেন রানুর দিকে। চশমার ঝাপসা কাচের ভেতর দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে খুব কাছের মানুষও অস্পষ্ট হয়ে যায়।

টগর পা ঝুলিয়া খাটে বসে আছে। তার মা চলে এসেছে এটি তার এখনো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তার বারবার মনে হচ্ছে তার মা বোধ হয় আসে নি। এই যে মা চলে গেল পাশের ঘরে, সত্যি কি গেল? হয়ত সে ঘরে উঁকি দিলে মাকে সে দেখবে না। দেখা যাবে করুণ মুখ করে বাবা বসে আছে।

টগর খাট থেকে নামল। তাকাল অপলার দিকে। অপলা শীতল গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ?

: ঐ ঘরে।

: ঐ ঘরে এখন যেও না।

www.BDeBooks.Com

: কেন যাব না?

: একটু পরে যাও। আস আমরা দু'জন গল্প করি।

শিশুরা অনেক জিনিস চট করে বুঝে ফেলে। টগর ও হয়তো বা-কিছু বুঝল। আবার উঠে বসল খাটে। পা দুলাতে দুলাতে ভয়ে ভয়ে বলল, মা কি এখন থেকে বাবার সঙ্গে থাকবে? অপলা গাঢ় স্বরে বলল, হ্যাঁ থাকবে।

টগর ছোট্ট করে হাসল। ছেলেমানুষি হাসি। দেখতে এত ভাল লাগে।

: খালামনি ।

: বল।

: সত্যি থাকবে?

: হ্যাঁ থাকবে।

: তুমি কি করে জান?

: আমি জানি।

টগর আর কিছু বলল না। পা দুলাতে লাগল। তার মনে হল খালামনি কাঁদছে। খালামনি এখন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু টগর বুঝতে পারছে।

: তুমি কাঁদছ কেন খালামনি?

: কাঁদছি না তো।

কিন্তু খালামনি কাঁদছে। তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বড়দের কত অদ্ভুত দুঃখ-কষ্ট থাকে। টগরের নিজেরও খুব কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু ছেলেদের কাঁদতে নেই। সে প্রাণপণে নিজের কান্না সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। অপলা ধরা গলায় বলল, টগর তুমি শান্ত হয়ে বসে থাকবে এখানে, বাবার ঘরে যাবে না। কেমন?

: আচ্ছা।

: আমি একটু নিচে যাব। একা একা হাঁটব।

: কেন?

অপলা চোখ মুছে শান্ত গলায় বলল, বড়দের মাঝে মাঝে একা একা থাকতে ইচ্ছে করে।

রাত অনেক হয়েছে। ওসমান সাহেব মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছেন। টগর ঘুমিয়ে পড়েছে। রানু রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কি অপূর্ব জোছনার রাত উঠোনে একা একা দাঁড়িয়ে আছে অপলা। কি দেখছে সে? রানু একবার ভাবল নিচে নেমে যাবে, অপলার হাত ধরে বলবে, কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে? কিন্তু সে তা করল না। তাকিয়ে রইল মাঠের দিকে। রানু ডাকল, অপলা! অপলা ফিরে তাকাল। চাঁদের আলোয় ভেজা কি সুন্দর একটি মুখ। তাঁকে ঘিরে জোছনা কেমন থর থর করে কাঁপছে। অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছে রানুর। সে আবার ডাকল, অপলা, অপলা!

BDeBooks.Com

: কিছু বলে গেছে?

: বলছে কাইল আবার আসব।

: এসেছিল কখন?

: দুপুরের পরে, সইন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল। কাইল সইন্ধ্যার সময় আপনারে থাকতে কইছে।

মিলি ওসমান সাহেবের ছোট বোন। তার স্বামী সিভিল সাপ্লাইয়ে কাজ করে এবং বেশ ভালই মাইনে পায়। ঢাকা শহরে তাদের একটি বাড়ি আছে যার দোতলাটা ভাড়া দেয়া হয়। কিন্তু মিলির মাঝে মাঝে টাকার দরকার পড়ে। ওসমান সাহেব সেই দরকারটা মেটান। আবার হয়তো এরকম কোন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

: আকবরের মা।

: জ্বি।

: চা দাও তো। লেবু চা।

আকবরের মা অপ্রসন্ন মুখে চা বানাতে গেলো। ওসমান সাহেব বাথ রুমে ঢুকলেন। রানুর অভাবটা বোঝা যাচ্ছে মেঝেতে সাবান গলে পড়ে আছে। বেসিনটা নোংরা। আয়নায় সাবানের ফেনা পড়ে জালের মত নকশা তৈরী হয়েছে। আকবরের মা এবং তার ছেলের কোন দিকেই কোন নজর নেই। অবিশ্যি বাজার করা হচ্ছে। রোজ দু' বেলা রান্না হচ্ছে। এই বা কম কি।

গোসল সেরে বেরুতে তাঁর অনেক সময় লাগলো। টেবিলে ঢেকে রাখা চা ততক্ষণে জুড়িয়ে পানি হয়ে গেছে। ওসমান সাহেব মুখ বিকৃত না করে সেই ঠাণ্ডা চা খেলেন। ঠিক এই মুহূর্তে কোন লেখালেখি করতে ইচ্ছা হচ্ছে না তবু বসলেন লিখতে। অনেক দিন ধরে একটা লেখা ঘুরছে মাথায়। সারাক্ষণই ভোতা একটা যন্ত্রণা দিচ্ছে লেখাটা। দশ/বার পৃষ্ঠা লিখে ফেলতে পারলে যন্ত্রণা একটু কমবে। এক বছর হয়ে গেল যন্ত্রণাটা পুষছেন।

কিছু কিছু লেখা বড় কষ্ট দেয়।এই কষ্ট দেয়া গল্পটির জন্ম গত বর্ষায়। ময়মনসিংহ থেকে বাসে করে ঢাকায় আসছেন। ঝাঁকুনিতে চমৎকার ঘুম এসে গেলো। ঘুম ভাঙলো ভাওয়ালের জঙ্গলে। সন্ধ্যা হব হব করছে। বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে। বাস চলার শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। সেই শব্দও এক সময় থেমে গেলো। কারবুরেটরে গোলমাল। ড্রাইভার রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে খুটখাট শুরু করেছে। যাত্রীরা সব নেমে গেছে বাস ছেড়ে। ওসমান সাহেব জানালা দিয়ে মুখ বের করে বসে আছেন। বিশাল অরণ্যে বৃষ্টির মত চাঁদের আলো ঝড়ছে। শুনশান নীরবতা। মাথায় ঠিক তখন গল্পটা এলো। তিনি কল্পনা করলেন এই আরণ্য ক্রমেই বড় হচ্ছে। একটির পর একটি শহর এবং নগর গ্রাস করতে শুরু করেছে। ছোট্ট একটি শহর শুধু বাকী। অল্প কিছু লোক থাকে সেই শহরে। প্রতি রাতেই তারা শুনতে পায় অরণ্য এগিয়ে আসছে।

গল্পটি অনেকবার লিখতে চেষ্টা করেছেন। লিখতে পারেন নি। সমস্ত ব্যাপারটা মাথায় সাজানো আছে কিন্তু কলমে আসছে না। একটি লাইনও নয়। তিনি রাতের পর রাত কাগজ কলম নিয়ে বসে কাটিয়েছেন। দু' বার এ নিয়ে রানুর সঙ্গে ঝগড়া হল। রানু বললো—এই গল্পটিই যে লিখতে হবে এমন তো কোন

কথা নেই অন্য গল্প লেখ। তিনি গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন—এটা শেষ না করে অন্য কোন লেখায় আমি হাত দেব না।

যদি এটা লিখতে না পার তা হলে আর অন্য কিছু লিখবে না?

: না।

: তুমি বড় অহঙ্কারী।

: এখানে অহঙ্কারের কি দেখলে?

: অনেক কিছুই দেখলাম। অক্ষমতা স্বীকার না করাটাও অহংকার।

ওসমান সাহেব চুপ করে রইলেন। রানু মশারী ফেলতে ফেলতে বললো, কোন মানুষই তার প্রতিভার বাইরে যেতে পারে না।

প্রকারন্তরে বলা, তাঁর তেমন কোন প্রতিভা নেই। থাকলে অরণ্যের সেই গল্প লিখে ফেলতে পারতেন। পুরুষদের আহত করার কৌশল মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে এবং তা ব্যবহারও করে চমৎকারভাবে। কেউ তার প্রতিভার বাইরে যেতে পারেনা। বইয়ের ভাষায় কয়েকটা কথা বলে রানু ঘুমুতে গেলো। ঘুমিয়েও পড়লো কিছুক্ষণের মধ্যে।ওসমান সাহেব রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে রইলেন। খাতার পাতায় শুধু কয়েক বার লেখা হল—অরণ্য এ পর্যন্তই। টগর যখন জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করেছে তখনো তিনি ঘুমুতে যান নি। রানু টগরকে নিয়ে বাথরুম করালো। মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ালো এবং খুব সহজভাবে বললো—শোবার সময় ফ্যানটা এক ঘর কমিয়ে দিওতো। যেন কিছুই হয়নি।

ওসমান সাহেব ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। বাইরে ভালই বৃষ্টি হচ্ছে। তার থিওরী সত্যি করবার জন্যেই বোধহয় আজ সারা রাত বৃষ্টি পড়বে।

: আপনার টেলিফোন।

তিনি চমকে তাকালেন। আকবরের মা নিঃশব্দে চলাফেরা করে। মাঝে মধ্যেই তাকে চমকে দেয়। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন—

: কার টেলিফোন?

: মিলা আফার।

তার চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। আকবরের মাকে বললেই সে হাতের কাছে রিসিভার এনে দেবে। কিন্তু শোবার ঘরে টেলিফোন রাখা তাঁর পছন্দ নয়। টেলিফোন আসা মানেই হচ্ছে অপরিচিত একজন লোকের ঘরে ঢুকে পড়া। একজন অপরিচিত মানুষ রাত দুপুরে শোবার ঘরে ঢুকুক এটা তার পছন্দ নয়। কিন্তু মিলি অপরিচিত কেউ নয়।

: টেলিফোন এই ঘরে আনুম?

: না আমি যাচ্ছি।

ওসমান সাহেব টেলিফোনে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারেন না। মিলি ঠিক তার উল্টো, ঘন্টা খানিকের আগে টেলিফোন ছাড়তে চায় না।

: হ্যালো ভাইয়া, কি করছ? লিখছিলে নাকি?

: না।

: তোমার অপেক্ষায় থেকে সারাটা দুপুর, সারাটা বিকাল এবং সারাটা সন্ধ্যা নষ্ট হল। আমি যে গিয়েছিলাম তোমাকে বলে নি?

: বলেছে।

www.BDeBooks.Com